মন্ত্রদীক্ষা

(সামাজিক উপন্যাস)

শ্রীসূর্য্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল

প্রণীত

কলিকাতা

১৪এ রামতনু বসুর লেন হইতে

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৩৩০

মূল্য ২৲

উৎসর্গ

—:*:—

আমার সোদর-প্রতিম যশস্বী লেখক

শ্রীমান্ বৃন্দাবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের করে

প্রীতি স্নেহ ও আশীর্ব্বাদের চিহ্ন স্বরূপ

এই

মন্ত্রদীক্ষা উপন্যাসখানি

অর্পিত হইল

শ্রীসূর্য্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিবেদন

মন্ত্রদীক্ষা উপন্যাসখানি যখন ধারাবাহিক ভাবে মাসিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল, তখন আমার অনেক হিতৈষী বন্ধু উৎসাহ দিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এই উপন্যাসখানি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি। [illegible] "উদ্‌যাপনের" ন্যায় এই পুস্তকখানি সাধারণের নিকট আদৃত হইলে সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

মহালয়া
২৯।১ নং বনমালী
সরকারের ষ্ট্রীট,
কুমারটুলি, কলিকাতা।

শ্রীসূর্য্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

উপহার

মন্ত্রদীক্ষা
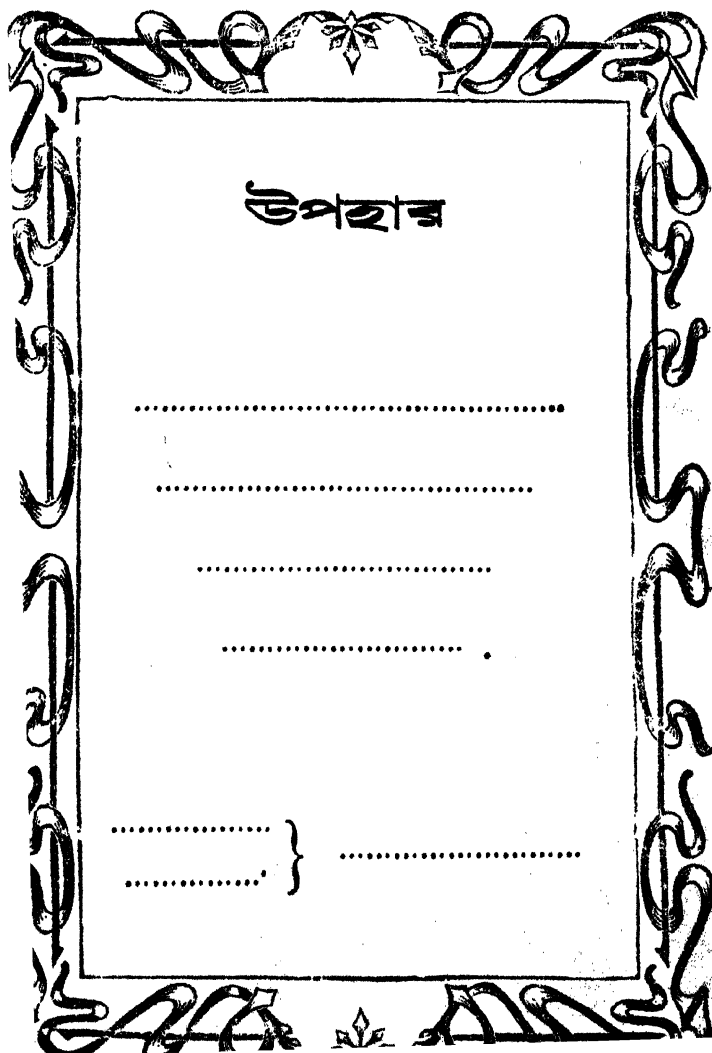
উপক্রমণিকা

রসময় মুখুজ্যে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা করিয়া বিস্তর অর্থের অধিপতি হন। তাঁহার আদি বাড়ী খুলনায়। কলিকাতায় কলুটোলায় সুবিস্তৃত বসতবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া নিজ কর্ম্ম উপলক্ষে বৎসরের অধিক সময় এই মহানগরীতেই কাটাইতেন। অবকাশমত মধ্যে মধ্যে নিজ পৈতৃক ভবনেও যাইতেন। খুলনা জেলায় ও কলিকাতায় তিনি অনেক সম্পত্তি নিজ উপার্জ্জন হইতে ক্রয় করিয়াছিলেন। এ ছাড়া কোম্পানির কাগজ, সেয়ার প্রভৃতিতে অনেক টাকা খাটিত। সমস্ত বিষয় সম্পত্তির আয় বাৎসরিক ৫০০০০ টাকার ন্যূন হইবে না। যৌবনের প্রথম অবস্থাতেই—যখন তাঁহার ঠিক উন্নতির মুখ—সেই সময় তিনি তাঁহার প্রথমা স্ত্রী মেনকা দেবীকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয়বার সৌদামিনী দেবীকে বিবাহ করেন। প্রথমা পত্নী যে কি অপরাধে পরিত্যক্তা হন, তাহার সবিশেষ কারণ রসময় নিজেই বলিতে পারেন।

মেনকা দেবীর পিত্রালয় বর্দ্ধমান জেলার নবগ্রামে। তাঁহার পিতার অবস্থা ভাল ছিল না। রসময়ের পিতা কুলের মুকুট

স্বভাব কুলীন। পালটি ঘর না পাওয়ায় দূর পল্লীবাসিনী হীনাবস্থাপন্না মেনকা দেবীর সহিত রসময়ের পিতা নিজ পুত্রের বিবাহ দেন। মেনকাদেবী গরীবের কন্যা হইলেও তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা ও আচার আদর্শ সমস্তই হিন্দুরমণীর অনুরূপ ছিল। তাঁহার সদ্‌গুণে ও হৃদয়ের উচ্চতায় শ্বশুরবাটীর সকলেই এমন কি দাস দাসী পর্য্যন্ত তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। প্রকৃত কথা বলিতে কি, মেনকা দেবী রসময়ের গৃহে পদার্পণ করার পর হইতেই রসময়ের আর্থিক অবস্থা বাড়িতে থাকে। সেই জন্য রসময়ের পিতা নিজ পুত্রবধূকে উদ্দেশপূর্ব্বক কহিতেন—'মা লক্ষ্মী আমার ঘরে এসে অবতীর্ণ হয়েছেন।' এইরূপ গুণান্বিতা ও সুলক্ষণা স্ত্রীকে রসময় যে অকারণে পরিত্যাগ করিলেন একথা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। তবে এ সম্বন্ধে কিম্বদন্তী যেরূপ আছে তাহার কতকটা আভাস আমরা পাঠককে দিতেছি।

নিজ ব্যবসায় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রসময়ের কতিপয় অসৎসঙ্গী জুটে। তাহাদের সংসর্গে পড়িয়া রসময় চরিত্রহীন হইয়া পড়েন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সকল রকম ব্যবসায়ীদের মধ্যে আইন ব্যবসায়ীরা অনেকেই অল্পবিস্তর চরিত্রহীন—বিশেষ যাঁহারা অল্প সময়ের মধ্যে বেশ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সেইরূপ অল্প সময়ের মধ্যে চরিত্রও হারাইয়াছেন। এ রকমটা যে কেন হয় তাহা বলিতে পারি না। বোধ হয় ইঁহাদের উপর ভগবানের কোনরূপ অভিসম্পাৎ আছে।

যাহাই হউক আইনজ্ঞ রসময় কর্ম্মক্ষেত্রে কৃতী ও যশস্বী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজ নৈতিক চরিত্র হারাইয়াছিলেন। প্রত্যহই তিনি সন্ধ্যার পর নিজ কার্য্য সমাপনান্তে অসৎ বন্ধুদিগের সহিত মিলিত হইয়া কুস্থানে কুৎসিত আমোদ প্রমোদে মত্ত হইতেন ও তথায় প্রায়ই নিশা দ্বিপ্রহর অতিবাহিত করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। এজন্য অনেক সময়ে নিজ স্ত্রীর সহিত বাদানুবাদ ও কলহ হইত। স্বামী অসৎসঙ্গে পড়িয়া উচ্ছন্ন যাইলে কোন্ রমণী নীরব থাকিতে পারে? কিন্তু পবিত্রচেতা সরলা মেনকাদেবী তখন বুঝিতেন না যে, জোয়ারের স্রোত পরিবর্ত্তন করা বরং সহজ; কিন্তু পদস্খলিত পুরুষের মতি গতি ফিরান একরূপ অসাধ্য। যাহাহউক, স্বামীর তিরস্কার ও লাঞ্ছনা সত্ত্বেও তাঁহাকে সৎপথে আনিবার জন্য মেনকাদেবী যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাহাতে বিশেষ সুফল ফলিল না। যখন হৃদয়ের অভিমান অত্যধিক জাগিয়া উঠিত, তখন নীরবে নিজ নিভৃত কক্ষে বসিয়া তিনি অশ্রুজল পরিত্যাগ করিতেন—আর স্বামীর মতি গতি ফিরাইয়া দিবার জন্য ভগবানের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেন। রসময় নিজ স্ত্রীর হৃদয়ের অব্যক্ত যন্ত্রণার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিতেন না—তাঁহার এ সব লক্ষ্য করিবার অবকাশ কোথায়? তিনি কামিনী কাঞ্চনের পশ্চাতে উন্মাদের মত ছুটিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার কামিনী বা কাঞ্চনের অভাব ছিল না বটে; তবে প্রাপ্ত কামিনী কাঞ্চনে সকল পুরুষের মন ভুলে না,

তাই তারা অপ্রাপ্তের পশ্চাতে পশ্চাতে পাগলের মত ছুটিতে থাকে। যাহাহউক পুত্রের এ অবস্থা চক্ষে দেখিবার দুরদৃষ্ট তাহার পিতামাতার হয় নাই; তাঁহারা পূর্ব্বেই সংসার ত্যাগ করিয়া ছিলেন, কেবল সংসারানভিজ্ঞা স্বল্পবয়স্কা মেনকা দেবীই রসময়ের গৃহে কর্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া প্রচুর অর্থের সঙ্গে প্রচুর দুঃখ ভোগ করিতেছিলেন। বাহ্যিক ভাব দেখিলে অনেকেই মেনকা দেবীকে সুখী বলিয়া মনে করিত বটে; কিন্তু দিবারাত্র কি যে গুরুভার তাঁহাকে পেষণ করিত, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন কে বুঝিবে?

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। রসময়ের প্রকৃতি কিন্তু কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হইল না। এই সময় রসময়ের পুরোহিত-পুত্র দিগম্বর ভট্টাচার্য্য প্রায় প্রত্যহই কুলদেবতার পূজার জন্য রসময়ের কলুটোলার বাটীতে গতিবিধি করিত। দিগম্বর পূজাপদ্ধতি কতদূর জানিত সে বিষয়ে অনেকেরই যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তবে দিগম্বরের একটা জিনিষ গর্ব্ব করিবার ছিল— সেটা তাহার সুন্দর রূপ। এই "মাকাল" ফলটি যৌবনে পদার্পণ করিবার পরই পাড়ার গুটিকতক বখাটে ছেলের সঙ্গে মিশিয়া বহু প্রকার নেশার বশীভূত হইয়া পড়িল। অনেক সময়ে পয়সা যোগাড় করিতে না পারিয়া অর্থাগমের অতি সহজ উপায়— চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হইল না। একদিন শুনা গেল যে, রসময়ের কুলদেবতা শালগ্রাম শিলার স্বর্ণ-উপবীত ঠাকুর ঘর হইতে চুরি গিয়াছে। বহু অনুসন্ধান ও ভয় দেখাইবার পর দিগম্বর

চোর বলিয়া ধরা পড়িল বটে ; কিন্তু মেনকাদেবীর দয়াদাক্ষিণ্যের বলে দিগম্বর সে যাত্রা রক্ষা পাইল, তবে রসময়ের গৃহ হইতে তাহার পৌরহিত্যটুকু দূর হইয়া গেল। দিগম্বরের বৃদ্ধ জরাজীর্ণ পিতা অগত্যা রসময়ের মত অত বড় একটা যজমানকে পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া যষ্ঠির উপর ভর দিয়া দিনকতক কায়ক্লেশে পূজারীর কার্য্য করিলেন ; কিন্তু ভগবান বোধ হয় তাঁহার উপর ততটা সুপ্রসন্ন ছিলেন না, এ কারণ বৃদ্ধকে আর অধিক দিন এই পৌরহিত্য করিতে হইল না। বৃদ্ধ বিশেষ পীড়িত হইয়া একদিন মেনকা দেবীকে উদ্দেশপূর্ব্বক কহিলেন—"মা ! তুমি না দেখিলে তোমার এই বুড়ো ছেলে সপরিবারে মারা যায়। তোমাদের মত একঘর যজমান গেলে আমরা না খেতে পেয়ে মারা যাবো ; আমি বড়ই অপটু হ'য়েছি, আর চল্‌তে ফিরতে পারি না ; তোমাকে কি আর বেশী বল্‌বো মা ; দয়া করে ঐ অপগণ্ড ছেলেটাকে পূজা কর্‌তে অনুমতি দাও, মা ! আমি একটু সামলে উঠি, আবার নিজেই আস্‌বো ; যে কটা দিন না পারি, সে কটা দিন এক রকমে চালিয়ে নিতে হবে মা ! কি কর্‌বো বল ! আমার বড় পোড়া কপাল ; তা না হ'লে ঐ একটা ছেলে—কোথা সুবোধ শিষ্ট হ'য়ে আমার এই বুড়ো বয়সের সহায় হবে, তা নয়, আমায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মার্‌ছে। আমার ত মরণ হয় না মা ! তা হলে ত বাঁচি"—এই বলিয়া বৃদ্ধ বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিল। দয়াবতী মেনকাদেবী বৃদ্ধের কাতরতায়

অভিভূত হইয়া গেলেন। স্বামীর আদেশ ভুলিয়া গিয়া তাঁহার মত না লইয়াই বৃদ্ধের আবেদন মঞ্জুর করিলেন; এবং দিগম্বরকে পুনরায় পূজা করিতে অনুমতি দিলেন। দিগম্বর আবার পূজারীর কাজে ব্রতী হইল।

স্বামী রসময় এ বিষয়ে বড় একটা খবর রাখিলেন না; কিন্তু ঘটনাচক্রে তিনি দুই একবার দিগম্বরকে তাঁহার বাটীতে গতিবিধি করিতে দেখিলেন। ভৃত্যদের নিকট হইতে সংবাদ পাইলেন যে কর্ত্রীর অনুমতি অনুসারে দিগম্বর পুনরায় তাঁহার গৃহে প্রবেশের অনুমতি পাইয়াছে। এই সংবাদে তিনি স্ত্রীকে কিছু বলিলেন না বটে; কিন্তু মনে মনে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইলেন।

এই ভাবে দিনকতক কাটিয়া গেল। একদিন রাত্রি প্রায় ১টা—এমন সময়ে কলুটোলার রাজপথে "চোর" "চোর" "পাকৃড়ো" "পাহারাওলা" "চোর" এইরূপ চীৎকার ধ্বনিতে সুষুপ্ত পল্লীবাসী-দের শান্তি ভঙ্গ হইল। তখনও রসময় বাড়ী ফিরেন নাই। চোরের পশ্চাতে এক এক করিয়া প্রায় পাঁচ সাত জন লোক ছুটিতে লাগিল। কেহ লাঠি লইয়া, কেহ ইষ্টক, কেহ প্রস্তর—যে যাহা সম্মুখে পাইল তাহা লইয়া ছুটিতে লাগিল। চোর বেগতিক দেখিয়া দৌড়িতে দৌড়িতে নিকটস্থ একটি ভদ্রলোকের বাটির সদর ফটক সংলগ্ন অনুচ্চ প্রাচীর একলম্ফে উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক সম্মুখের সিঁড়ি দিয়া সরাসর দ্বিতলে উঠিয়া গেল। তাহার পর সেই দ্বিতলের ছাদ হইতে একটি লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক পার্শ্বের বাটীর এক তালার ছাদে লাফাইয়া পড়িল। এই পার্শ্বের বাটীটিই রসময়ের। চোরের

গতিবিধি আক্রমণকারীরা পথ হইতে দেখিয়াছিল—তাহাদের মধ্যে কেহই মালিকের অনুমতি না লইয়া অপরের বাটীর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক চোরের অনুসন্ধান করিতে সাহস করিল না। যখন তাহারা দেখিল যে চোর রসময়ের বাটীতে লাফাইয়া পড়িল, তখন তাহারা তাঁহার ভৃত্যদের জাগাইয়া দিবার জন্য সদরের নিকট আসিয়া চীৎকার ও হাঁক ডাক করিতে লাগিল। অনতিবিলম্বে রসময়ের চাকর, নফর, সহিস কোচ্‌ম্যান প্রভৃতি সকলেই শয্যাত্যাগ পূর্ব্বক চোরের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। চোর যে স্থানে লাফাইয়া পড়িল সে স্থানটা ফাঁকা ছাদ—তাহার পরই রসময়ের শয়ন-কক্ষ। তখন মেনকাদেবী সেই কক্ষে একাকিনী শয়ন করিয়া বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা অনুভব করিতেছিলেন। বাহিরে কোলাহল শুনিয়া তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া গৃহমধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু গৃহের দরজা খুলিতে সাহস করিলেন না। বিশেষ—যখন কোলাহল শুনিয়া তিনি বুঝিলেন যে তাঁহারই গৃহের পার্শ্বে মুক্ত ছাদে চোর লাফাইয়া পড়িয়াছে, তখন তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। এমন সময় তাঁহার গৃহকপাটে একটি সজোরে আঘাত পড়িল ও একজন আগন্তুক ভয়বিহ্বল ও কম্পিত কণ্ঠে কহিল—"মা! মা! রক্ষা কর; আজ তোমার ভিটায় ব্রাহ্মণ হত্যা হল মা। মা, এবার বাঁচাও; আর কখন তোমার এ হতভাগা পুত্রের অনুরোধ রাখ্‌তে হবে না। মা! মা! রক্ষা কর; ঐ মা! তোমার চাকর, সহিস, কোচম্যান উপরে উঠে আসছে। মা! শীঘ্র দোর খুলে দাও; নইলে এইখানে ব্রহ্মহত্যা

হয়।” কণ্ঠস্বর মেনকা দেবীর পরিচিত বলিয়া বোধ হইল; তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

প্র—কে? কে তুমি?

উ—মা! আমি তোমার অধম সন্তান দিগম্বর।

প্র—দিগম্বর? তুমি চোর? তোমার পিছু পিছু লোক তাড়া করেছে? তুমি কি ক'রেছ?

উত্তর—মা! সে সব অনেক কথা; আগে আমায় বাঁচান—আমার প্রাণ রক্ষা করুন।

এই কাতর মাতৃ-সম্বোধনে পুত্রের জননী মেনকাদেবীর হৃদয় স্নেহরসে পূর্ণ হইয়া গেল। আক্রমণকারীদের হস্তে ব্রাহ্মণ পতিত হইলে যে তাহার অস্থি মজ্জা অচিরাৎ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, ইহা বুঝিতে মেনকাদেবীর বাকি রহিল না। পুরোহিত-পুত্র প্রাণভয়ে ছুটিয়া আসিয়া মাতৃসম্ভাষণে সাধ্বীর নিকট আশ্রয় মাগিতেছে এবং ক্ষণবিলম্ব করিলে হয় ত তাঁহার গৃহ প্রাঙ্গণ ব্রাহ্মণের রুধির রাগে রঞ্জিত হইবে,—কল্পনায় এই লোমহর্ষণ ব্যাপার দৃষ্টি করিয়া মেনকাদেবী শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে গৃহ-কপাট খুলিয়া ব্রাহ্মণ পুত্রকে আশ্রয় দান করিলেন। পুরোহিত-পুত্র দিগম্বর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই অর্গল আবদ্ধ করিয়া দিল ও মেনকা দেবীর পদ প্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া বার বার ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল এবং যাহাতে আক্রমণকারীদের হস্ত হইতে অব্যাহতি পায়—সে জন্য কাতর ভাবে অনুনয় করিতে করিতে ব্যাধ বিতাড়িত মৃগশিশুর ন্যায় ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। মেনকা দেবী তখন

তাহাকে পালঙ্কের নিম্নে নিজ দেহ লুকাইতে ইঙ্গিত করিলেন। দিগম্বর অকূলে কূল পাইল।

ঠিক এই সময়ে—ভৃত্যেরা দ্বিতলে আসিয়া চোরের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। গৃহমধ্যে একটা হৈ হৈ ব্যাপার পড়িয়া গেল। কেহ আর সেই রাত্রিতে গৃহ কর্ত্রীর শান্তিভঙ্গ করিতে সাহসী হইল না। সকলেই ভাবিল কর্ত্রী ঠাকুরাণী নিদ্রিতা; তিনি যখন এ বিষয়ে কিছুই জানেন না, তখন মিথ্যা তাঁহাকে জাগরিত করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। বিশেষ চেষ্টা করিয়াও যখন কেহই চোরের সন্ধান পাইল না তখন অগত্যা ভগ্ন মনোরথ হইয়া সকলেই ছাদ হইতে অবতরণ করিয়া স্ব স্ব শয়ন কক্ষে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। এই সময় রসময় তাঁহার নৈশ বিহার সম্পন্ন করিয়া নিজ গৃহাভিমুখে ফিরিতেছিলেন। সদর দরজায় জনতার মুখে চোর লইয়া যাহা ঘটিয়াছে তাহা শুনিলেন। ভৃত্যেরা চোরের সন্ধান করিতে পারে নাই ও চোরকে ধরিতে অক্ষম হইয়াছে শুনিয়া তিনি তাহাদের প্রতি ২।৪টা ছোট খাট গালি দিয়া দ্বিতলে নিজ শয়ন কক্ষাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবেন এমন সময়ে দেখেন যে একজন যুবক তাঁহার স্ত্রীর পালঙ্ক নিম্ন হইতে বহির্গত হইয়া সবেগে প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। দিগম্বর জানিত যে, রসময় যদি ঐ রাত্রে তাহাকে ধরিয়া ফেলিতে পারে তাহা হইলে তাহার আর নিস্তার নাই। এজন্য করুণাময়ী আশ্রয়দাত্রীর স্বামীর নিকট কৃতজ্ঞতা বা সৌজন্যতা দেখাইয়া বিদায় লইবার পরিবর্তে সে বিনা বাক্যব্যয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত

হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। প্রকৃত কথা এই—পলায়নকারী যে কে তাহাও রসময় ভাল বুঝিতে পারিলেন না। এই অভাবনীয় ঘটনায় রসময় একেবারে বিস্মিত হইয়া গেলেন। এইরূপ গভীর রজনীতে তাঁহার যুবতী স্ত্রীর শয়ন কক্ষ হইতে একটি রূপবান পুরুষ তস্করের ন্যায় পলায়ন করিল দেখিয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি নিজ স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন। হৃদয় আবেগে থামাইতে না পারিয়া তিনি নিজ স্ত্রীর দক্ষিণ হস্তটি সবলে ধারণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন।

"এসব কি মেনকা?"

ঘটনাটা এত চটু করিয়া ঘটিয়া গেল যে মেনকা দেবী কিছুক্ষণের জন্য কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া গেলেন। তিনি উত্তর দিবার পূর্ব্বেই রসময় বাবু চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন, "নারী জাতি এতটা হীন, কপট ও অন্তঃসার শূন্য হয় তাহা আগে জানতাম না।"

মেনকা দেবীর পিঠে বিষের চাবুক পড়িল। তিনি বুঝিলেন ঘটনাটা বাস্তবিক বড় বিশ্রী হইয়া দাঁড়াইল। স্বামীর সংশয় দূর করিবার জন্য মেনকা দেবী উত্তর করিলেন—

"ছি! শুধু শুধু অন্যায় অভিযোগ দিও না। ভয়ার্ত্ত পুত্রকে মাতা আশ্রয় দিলে যদি রমণী-হৃদয়ের অন্তঃসার শূন্যতার পরিচয় দেওয়া হয়, তা'হলে এ দাসী সহস্র অপরাধ ক'রেছে স্বীকার করবে।"

তখনও রসময়ের মদিরার নেশা বেশ প্রবল ছিল। উত্তর

শুনিয়া তিনি অধিকতর কুপিত হইলেন। বিদ্রূপ সহকারে পুনরপি বলিলেন—

"আমি ওসব বাজে কথা শুনতে চাই না। ঐ সুপুরুষ রসিক নাগরটি তোমার কে? আমাকে দেখে চোরের মত পালিয়ে গেলেন?" এইরূপ পৈশাচিক ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া মেনকাদেবীর নেত্রদ্বয় অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া উঠিল—তাঁহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল, তিনি কি করিয়া স্বামীকে বুঝাইবেন—ঐ আগন্তুক কে? ও কেনইবা দ্বিপ্রহর নিশায় নিজ শয়ন মন্দিরে তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন? কি উপায় করিলে স্বামীর বিশ্বাস জন্মিবে? আকুল হৃদয়ে তিনি নিদ্রিত পুত্র শিশু রবীন্দ্রকে শয্যা হইতে তুলিয়া লইয়া স্বামীর সমক্ষে অশ্রুসিক্ত লোচনে বলিলেন—

"তুমি আমার সাক্ষাৎ দেবতা; তোমার সম্মুখে এই আমার একমাত্র অন্ধের যষ্টি—আমার স্বামীকুলের দুলাল—আমার সর্ব্বস্ব রবিকে বুকে নিয়ে বলছি—ঐ আগন্তুক আর এই আমার রবি—দুইই এক। কেন তুমি অকারণ নীচ ভাব হৃদয়ে এনে আমার প্রাণে আঘাত দিচ্ছ। ঐ লোকটি আমাদের পুরোহিত-পুত্র দিগম্বর। বড়ই বিপন্ন হ'য়ে—ভয়ে "মা" বলে এসে আমার কাছে আশ্রয় চেয়েছে—তাই আশ্রয় দিয়েছি, এতে যদি কোন দোষ হয়ে থাকে আমাকে ক্ষমা কর।" ইহার অধিক আর কিছু বলিতে পারিলেন না। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল ও গণ্ড বহিয়া নেত্রধারা ছুটিতে লাগিল। তিনি পুত্রকে পালঙ্কের উপর শোয়াইয়া স্বামীর পদপ্রান্তে ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িলেন।

দিগম্বরের নাম শুনিয়া রণময়ের হৃদয়ে রোষ-বহ্নি দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। তাই পুনরায় ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, "তোমারও মুখে ছাই—তোমার দুলালেরও মুখে ছাই। কি নাম ব'ল্লে—দিগম্বর —দিগম্বর—লম্পট, পাষণ্ড দিগম্বর? দিগম্বরের উপর তোমার এত টান কেন? তুমি মনে কর আমি কিছু জানিনা? আমার মানা সত্ত্বেও তুমি আমার অজ্ঞাতে তাকে ঘরে আসতে দাও। গোপনে দেখা কর, আর এখন দেখছি আমার অনুপস্থিতিতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত নিভৃতে তার সঙ্গে প্রেমালাপও হয়। ধিক্ ধিক্! কালামুখী!" এই বলিয়া সজোরে মেনকাদেবীর বক্ষস্থলে পদাঘাত করিলেন। মেনকাদেবী "মাগো" বলিয়া ভূমিতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

যখন তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন হইল তখন দেখেন নরগ্রামে তাঁহার পৈতৃক ভবনে একটি জীর্ণ কুটীরে তিনি শায়িতা; পার্শ্বে একজন ঝি পরিচর্য্যা করিতেছে। ক্রমে তিনি বুঝিলেন যে, বিপন্ন ব্রাহ্মণপুত্রকে আশ্রয় দিয়া তাহার জীবন রক্ষা করিতে গিয়া নিজের কপাল ভাঙ্গিয়াছে। তিনি স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া পুত্রসহ নির্ব্বাসিতা হইয়াছেন। রাজরাণী আজ ভিক্ষারিণী মাসিক ১০৲ টাকা বৃত্তি ভোগিনী হইয়া তাহাকে পুত্রসহ এরূপ দীনভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে—ইহা তাঁহার স্বামীর আদেশ।

পুরোহিত পুত্র দিগম্বর বিশেষ চরিত্রবান্ না হইলেও একেবারে হৃদয়হীন ছিল না। সে যখন শুনিল যে তাহাকে বিপদে আশ্রয় দিয়া একটি সতী সাধ্বী এইরূপ লাঞ্ছিতা হইলেন ও তাহারই কৃত কর্ম্মের জন্য একটি সাধ্বীর এইরূপ ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটিল, তখন

সে নিশ্চিত থাকিতে পারিল না। অনুতাপানলে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল ও মনে মনে নিজেকে সহস্র ধিক্কার দিতে লাগিল। কি উপায়ে ঘটনা-স্রোত ফিরাইয়া মেনকা দেবীর ভাগ্য পরিবর্ত্তন করাইবে তাহার কোন উপায় স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। সাহসে ভর করিয়া রসময়ের নিকট উপস্থিত হইয়া কোন কথা বলিতে পারিল না। সে মনে মনে বুঝিল যে, রসময়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার কার্য্য সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিতে গেলে হিতে বিপরীত ঘটিবে; তিনি আরও কঠোর হইয়া উঠিবেন অথচ নিরপরাধিনী নিরীহা সরলা তাহারই কারণ লাঞ্ছিতা ও নিগৃহীতা হইয়াছে ভাবিয়া সে উন্মত্তের মত হইয়া গেল। মর্ম্ম পীড়িত হইয়া ঘোর নৈরাশ্যের মধ্যে কোন পথ খুঁজিয়া পাইল না। একদিন হঠাৎ শুনা গেল দিগম্বর কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া গিয়াছে।

রসময় ছয়মাসের মধ্যে পুনরায় দার-পরিগ্রহ করিয়া নবপরিণীতা সৌদামিনীকে লইয়া আবার নূতন সংসার পাতিলেন। প্রথমা স্ত্রীর সহিত আর কোন সম্পর্ক রাখিলেন না। প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখে নরগ্রামে মেনকাদেবীর নিকট ১০টি টাকা মণিঅর্ডার যোগে পাঠাইয়া দিয়া তিনি খালাস। এতদ্ব্যতীত তাঁহার প্রতি যে অপর কোন কর্ত্তব্য থাকিতে পারে ইহা রসময় ভাবিতে পারিলেন না, আর তাঁহার ভাবিবার অবকাশ বা কোন আবশ্যকতা ছিল না। ক্ষণেকের মানসিক উত্তেজনায় তিনি অনায়াসে বিবেক ও মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়া শুধু একটা অন্যায় সন্দেহের

বশবর্ত্তী হইয়া একটি নিরপরাধিনীর জীবন শ্মশানে পরিণত করিলেন—তাহার দিকে আর ফিরিয়াও চাহিলেন না, স্ত্রীর প্রতি বিরূপ হইয়া তিনি মাতা ও পুত্র দুইজনকে সমান কঠোর শাস্তি দিলেন।

এই ঘটনার পর কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। তাহার পর এই আখ্যায়িকা আরম্ভ হইল।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বর্দ্ধমান ষ্টেশন হইতে এক সোজা পথ দক্ষিণাভিমুখে বরাবর দামোদর নদের সদর ঘাটে গিয়া পড়িয়াছে। দামোদর পার হইয়া আরও ক্রোশ দুই দক্ষিণে নরগ্রাম অবস্থিত। চতুর্দ্দিকে যোজনব্যাপী হরিত ক্ষেত্ররাজির মধ্যে এক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। দামোদর পার হইয়া এইরূপ দুই তিনটি গ্রাম অতিক্রম করিলে তবে নরগ্রামে পৌঁছিতে হয়। নরগ্রামের প্রান্তভাগে ক্ষুদ্র তটিনী কেতকী। চারিধারে উচ্চ বট, অশ্বত্থ, তাল ও খর্জ্জুর প্রভৃতি বৃক্ষ দুর্গপরিখারূপে দণ্ডায়মান থাকিয়া যেন বহির্জ্জগতের দৃষ্টি হইতে গ্রামটিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। বর্ষার সময় ক্ষুদ্র কেতকী পরিপুষ্ট হইয়া নরগ্রামের উপকূল ভাসাইয়া প্রবাহিত হইয়া থাকে। এই সময় উৎফুল্লপ্রাণ নগ্নপ্রকৃতির অনির্ব্বচনীয় শোভা দেখিতে বড়ই মনোরম। যে দিকে চক্ষু ফিরাও দেখিবে শুধু সবুজবর্ণের ক্ষেত্ররাজি, আর মধ্যে মধ্যে একটি একটি ক্ষুদ্র গ্রাম—যেন নীল সাগর বেষ্টিত দ্বীপপুঞ্জের ন্যায় শোভা পাইতেছে। আর রজত কান্তি কেতকী নরগ্রামকে মেখলা পরিবেষ্টিত করিয়া গ্রাম্যবধূর সাজে সাজাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। শীত ও গ্রীষ্ম কালে এই ক্ষুদ্রকায় তটিনী শুকাইয়া যায়।

এখানে অনেকগুলি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অনান্য জাতি বাস করেন। গ্রামটি এক বর্দ্ধিষ্ণু গণ্ডগ্রাম। নরগ্রামে নকুলেশ্বর শিব নামে

বড়ই জাগ্রত দেবতা। ভক্তিভরে মানত করিলে দেবতা নাকি সুপ্রসন্ন হইয়া ভক্তের মনস্কামনা পূর্ণ করেন। বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন হইতে শিবের গাজন আরম্ভ হয়, এবং সারা গ্রামে গাজনের উৎসব পড়িয়া যায়। এই গাজন উৎসব এই পল্লীবাসী কেন—নিকটস্থ তিন চারি ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রামবাসীদের—একটা বাৎসরিক বিপুল আনন্দোসব। সকলেই এই পুণ্য উৎসবে যোগদান করেন। দূর প্রবাসস্থিত গ্রামবাসিগণ এই উৎসবে আহূত হন। যদি কোন কার্য্য গতিকে কেহ না আসিতে পারেন তবে তাঁহার আর মনস্তাপের সীমা থাকে না। এক পক্ষকাল গাজনের সন্ন্যাসীরা সংযম ও ব্রতপালনপূর্ব্বক "উর্দ্ধসেবায়" এই উৎসব সম্পন্ন করেন। এই দিনে সন্ন্যাসীরা উর্দ্ধপদে ও নত মস্তকে দলে দলে শিবমন্দির সমীপে আনীত হয়। ইহার নামই উর্দ্ধসেবা "হর হর বম বম "শব্দে চতুর্দ্দিকে মুখরিত হয়। শিবতলা লোকে লোকারণ্য হয়। গাজনের কার্য্যকলাপ শেষ হইতে দিবাভাগ প্রায় শেষ হইয়া যায়। তাহার পর আরতি শেষ হইলে যাত্রা, সখের থিয়েটার প্রভৃতি আমোদে গ্রামবাসীরা মাতিয়া থাকেন। সহরের তুলনায় পল্লীটি গরিব। এই জন্য সখের দলের যাত্রা ও থিয়েটার লইয়া ইঁহারা যে উৎসাহ ও উদ্যম প্রকাশ করেন এইরূপ কুত্রাপি দেখা যায় না। দুই তিন দিন এইরূপে আমোদ প্রমোদের পর এই উৎসবের অবসান হয়।

কেশব বাড়ুয্যে এই গ্রামের একজন বেশ সঙ্গতিপন্ন

লোক। বর্দ্ধমানের রাজকাছারীতে কর্ম্ম করিয়া ও বর্দ্ধমানাধিপতির অনুগ্রহে তিনি ২৫০। ৩০০ বিঘা লাখরাজ জমীর মালিক। কোম্পানীর কাগজ, তেজারতীতে বেশ আয় আছে। এ ছাড়া বরাকরে জমীদারীর মধ্যে কতক অংশে সম্প্রতি কয়লার খনি বাহির হওয়াতে তাঁহার বিশেষ লাভের সূচনা হইয়াছে।

কেশব বাবুর বয়স আন্দাজ ৬০ বৎসর। লোকটী নিষ্ঠাবান হিন্দু। হিন্দুর উপযোগী সমস্ত ক্রিয়াকলাপই করিতেন; কিন্তু তাঁহার কৃপণ অপবাদটী দিতে লোকে ছাড়িত না। পরিবার মধ্যে একটী মাত্র ভগ্নী মোক্ষদা ও একটিমাত্র পৌত্রী —জ্যোতির্ম্ময়ী। জ্যোতির্ম্ময়ী কপালদোষে শৈশবাবস্থাতেই নিজ পিতামাতার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। তাঁহার পিতামহ এই একমাত্র পৌত্রীর মুখ চাহিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। পৌত্রীটির বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর। এখনও বিবাহ হয় নাই। বিবাহ না হইবার দুই তিনটি কারণ ছিল। প্রথম কারণ এই যে—কেশব বাবু কুলীন ব্রাহ্মণ —তাঁহার পাল্‌টি ঘর পাওয়া সহজসাধ্য ছিল না। দ্বিতীয় কারণ এই যে—পৌত্রীটির বিবাহ দিলে তাঁহার একমাত্র নয়নমণিকে চক্ষের অন্তরাল করিয়া শশুরালয়ে বসবাস করিতে দিতে হইবে। এই কল্পনাই তাঁহাকে অধিক পীড়া দিত। তাঁহার মনে মনে সঙ্কল্প ছিল, যদি ভাল সচ্চরিত্র অপেক্ষাকৃত গরিবের ঘরের ছেলে পান, তবে তাঁহাকে

ঘরজামাই ভাবে নিজের কাছে রাখিবেন। সেইরূপ পাত্র উপস্থিত না পাওয়ায় অগত্যা বিবাহ স্থগিত আছে। আর তৃতীয় ও প্রধান কারণ এই যে—পৌত্রীটির কোষ্ঠী গণনার দ্বারা তিনি জানিয়াছিলেন যে, বালিকাকে পঞ্চদশ বর্ষের পূর্ব্বে পাত্রস্থ করিলে তাহার বৈধব্য ঘটিবে—অন্ততঃ এইরূপ তাঁহার গুরুদেবের গণনা ও সেই কারণ তাঁহারও সেইরূপ বিশ্বাস। কেশব সকল বিপদ সহিতে প্রস্তুত; কিন্তু জীবন থাকিতে জ্যোতির্ম্ময়ীর বৈধব্য দেখিতে প্রস্তুত নহেন—তাহার চেয়ে তাঁহার পৌত্রী চিরকুমারী থাকুক সেও শতগুণে শ্রেয়। তিনি একজন গ্রামের সঙ্গতিপন্ন লোক, এজন্ত বয়স্থা জ্যোতির্ম্ময়ীর বিবাহ দিবার কোন উদ্যোগ না করার জন্ত যদিও ইঙ্গিত ইসাড়াতে পাড়ার দুই চারিজন দুই একটা কথা বলিত, কিন্তু প্রকাশ্যে এ কথার কেহ আন্দোলন করিতে সাহসী হইত না। যাহাহউক আমাদের জ্যোতির্ম্ময়ী এখনও কুমারী। জ্যোতির্ম্ময়ীর সখী সুহাসিনী তাহার বাল্য-বন্ধু। নিকটস্থ পলাশপুরে শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য্যের সহিত সুহাসিনীর বিবাহ হইয়াছে। গ্রামে গাজন উপলক্ষে সুহাসিনী পিত্রালয়ে আসিয়াছে। বাল্যকাল হইতেই দুইজনে বড় ভাব। এখন বহুদিন পরে সে গ্রামে আসিয়াছে; এজন্ত তাহাদের পুরাতন সখ্যভাবটী চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাই দুই বন্ধু প্রায়ই একত্রে সমস্ত দিন মুখোমুখী বসিয়া গল্পগুজবে দিন অতিবাহিত করে। সুহাসিনীর দাম্পত্য-জীবনের কথা জ্যোতির্ম্ময়ী শুনিতে বড়

ভালবাসে। সুহাসিনীর স্বামী কি রকম ব্যবহার করে—সুহাসিনী প্রথম মিলনে স্বামীর সহিত কিরূপ কথাবার্ত্তা কহিয়াছে—শ্বশুর শাশুড়ীর কি রকম যত্ন করে—সে কি রকম ব্যবহার করিয়া শ্বশুরবাড়ীর পূজনীয় লোকদের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা দেখায়—ঘর করিতে গেলে নববধূকে কিরূপ ভাবে থাকিতে হয় প্রভৃতি এক একটা প্রসঙ্গ লইয়া উভয়ে আনন্দে দিন কাটাইতে থাকে।

আজ "উর্দ্ধসেবা" শেষ হইয়া যাইবে। তাই দুই বন্ধুতে সমস্ত দিন উপবাস করিয়াছে। সন্ধ্যার আরতীর পর নকুলেশ্বরের পূজা করিয়া আহারাদি করিবে এইরূপ আয়োজন হইয়াছে। শঙ্করের পূজার জন্য জ্যোতির্ম্ময়ী সূর্য্য উঠিবার পূর্ব্বে ধূতুরা পুষ্প, আকন্দ পুষ্প, বিল্বপত্র ও তাহার বাগানের বেল যুঁই তুলিয়া সাজী পরিপূর্ণ করিয়াছে। সন্ধ্যার সময় জ্যোতির্ম্ময়ী নিজের ঘরের দাওয়ায় বসিয়া সাজিটি সম্মুখে রাখিয়াছে। শঙ্কর পূজায় জন্য মালা গাঁথিবার আয়োজনে ব্যস্ত, আয়োজন সমস্ত ঠিক—তবু যেন গাঁথি গাঁথি করিয়া মালা গাঁথিতে হাত সরিতেছে না।—কি যেন একটা অন্যমনস্ক ভাব—কি যেন একটা উৎকণ্ঠা। জ্যোতির্ম্ময়ীর তখনকার অবস্থা দেখিলে মনে হয়, সে যেন কাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। কিছুক্ষণ এইরূপ উদাসভাবে কাটিয়া গেল। রাত্রি অধিক হইতেছে দেখিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী অগত্যা সাজি হইতে ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিতে আরম্ভ করিবে এমন সময় খিড়কীর দরজা খোলার

শব্দ হইল। খিড়কীর নিকটে অন্ধকার ছিল কাজেই দূরের লোক চেনা গেল না। শব্দ হইবামাত্র জ্যোতির্ম্ময়ীর হৃদয়ে একটা আঘাত লাগিল। সে উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—

"কে? রবিদা?"

উত্তর—হুঁ।

জ্যোতি—এই বুঝি তোমার সকাল বেলায় আসা? আমায় কি ব'লে গিছ্‌লে?"

উত্তর—"ব'লে গিছ্‌লাম তোমায় নিয়ে সহমরণে যাবো··· তাই এসেছি—এখন চল, যাই। এই বলিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে রসিকা সুহাসিনী আসিয়া আলোক সমীপে সশরীরে উপস্থিত হইল। সুহাসিনীকে দেখিয়া জ্যোতি-র্ম্ময়ী একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। সুহাসিনী ছাড়িবার পাত্রী নহে। তাই রঙ্গ করিয়া আবার বলিল—

"মুখে আগুন তোমার। 'রবিদা' 'রবিদা' করেই গেলি যে। শেষে আর কারুকে না পেয়ে আমাকে 'রবিদা', ক'রে দিলি? মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে দেখ্‌ছি। আমি সব সাজতে পারি—কিন্তু গাধা পুরুষ মানুষ সাজ্‌তে রাজী নই। এক মুখ গোঁফ দাড়ী, সে বড় বিচ্ছিরি দেখাবে, মাগো!"

জ্যোতিঃ তাহার রকম দেখিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "তবে গোঁফ দাড়ীওয়ালা গাধা পুরুষ মানুষ বিয়ে করলি কি করে?"

ওমা তা করতে হবে বই কি। আমাদের মত গোঁফ

দাড়ী শূন্য বুদ্ধিমান জাতের সঙ্গে যদি আমাদের বিয়ে হ'ত তা হ'লে মহা মুস্কিল হ'ত। তা হ'লে কি তারা গাধার মত অত খেসমত খাটত, না উঠতে বল্লে উঠত, বসতে বল্লে বসত। আগে রবিদার সঙ্গে বিয়ে হ'বে তখন বুঝবি, এখন আর কি বুঝবি বল। তবে একটু কড়া হ'তে হবে ভাই গায়ে পড়ে 'রবিদা' 'রবিদা' করলে চলবে না। তা বলে দিচ্ছি কিন্তু! জ্যোতির্ম্ময়ী বিশেষ লজ্জিত হইয়া উত্তর দিল—"যা, তোর সব বিষয়ে ঠাট্টা। অন্ধকারে ভাল দেখতে পাই নি—একটা কথা ব'লে ফেলেছি, তাই কত কথা শোনাচ্ছে।"

সু—যাক্ ভাই ও সব কথা। এখন কাজের কথাটা কি বল দেখি? রবিদা কি ব'লে গিছলো, বল না?

ঈষৎ কুপিত ভাবে জ্যোতির্ম্ময়ী উত্তর করিল—ব'লে আবার যাবে কি? ব'লেছিল গাজনের উর্দ্ধ:সবার দিন সকাল-বেলায় আসবে।

সু—আর ব'লে গিছ্‌লো—গত বৎসর গাজনের সময় যেমন মালা গেঁথে দিয়েছিল এবারও সকাল সকাল এসে সেই রকম মালা গেথে দেবে—নয়? বল না—লজ্জা কি?

জ্যোতির্ম্ময়ী আরও ক্রুদ্ধভাবে উত্তর করিল—তাই যদি ব'লে থাকে তাতে দোষ হ'য়েছ কি? অন্যায়টা কি হ'য়েছে?

সু—অন্যায় কি? খুব ভাল। আবার একটা নূতন বিদ্যাসুন্দরের পালা হয়ে যাবে। তবে আমারই মুস্কিল ভাই, আমাকেই ত

মালিনীর কাজটা করতে হবে—কাজেই আমার ভয়টাই বেশী। তোমাদের কি বলনা—বিদ্যেসুন্দরের মিল হবে ; কিন্তু আমার কিল আর ফিরবে না। তা যখন রাত্রি ৮টার মধ্যে এলনা তখন আর রাত্রে কি কলিকাতা থেকে সে আসবে? এলে এতক্ষণ আসত। কথায় বলে—

"বৰ্দ্ধমান কাঞ্চীপুর ছয় দিনের পথ,
ছয় দণ্ডে উতরিল অশ্বমনোরথ"

আসব মনে করলে ছয় দণ্ডেই বৰ্দ্ধমানে এসে পড়ত সে।

জ্যোতির্ম্ময়ী একটু ক্ষুব্ধভাবে বলিল, "মুখে আগুন তোমার—কত রঙ্গই জানেন।"

"তা ভাই মুখে আগুন এখন দেবে বই কি, রাজ বাড়ীতে মালা দেওয়াই পাপের ভোগ। যাক, এদিকে যে আরতীর সময় হয়ে আসছে। সুন্দর যখন এলেন না, তখন মালিনীর মালাতেই কাজ সেরে নিতে হবে ত।" বলিয়া সুহাসিনী হাসিতে হাসিতে তাড়াতাড়ি মালা গাঁথিতে নিবিষ্ট হইল। দুইজনে অতি সত্বরই মালাটি গাঁথিয়া লইল। তাহার পর জ্যোতির্ম্ময়ী হাত মুখ ধুইয়া শুদ্ধচিত্তে শুদ্ধ পট্টবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পূজার অন্যান্য উপকরণ লইয়া আসিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে দুই বন্ধুতে নকুলেশ্বরের তলায় উপস্থিত হইল। উভয়েই উপস্থিত হইয়া শিবের পূজা করিল! বহু কষ্টে আনীত গঙ্গাজল দুগ্ধ শঙ্করের শিরে ঢালিল—বিল্বদল পুষ্পচন্দন চড়াইল। তাহার পর

জ্যোতির্ম্ময়ী নিজহস্ত রচিত মালা শিবের গলায় পড়াইয়া দিল। আরতী আরম্ভ হইল। মন্দিরে লোকে লোকারণ্য। বাহিরে দামামা ও ঘণ্টার ধ্বনি হইতে লাগিল। মন্দির মধ্যে অনেক স্ত্রী পুরুষ দণ্ডায়মান থাকিয়া আরতী দেখিতে লাগিলেন। যাঁহারা ভিতরে স্থান পাইলেন না তাঁহারা মন্দিরের দ্বারে ও কতক লোক মন্দিরের চারিধারে ভিড় করিতে লাগিল, প্রজ্জলিত ধূপ ধুনা ও কর্পূরের ধূমে ও গন্ধে মন্দির ধূম্রাবৃত ও আমোদিত। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে আরতী শেষ হইল। কেহ সাষ্টাঙ্গে—কেহ নতজানু হইয়া নকুলেশ্বরকে প্রণাম করিলেন। একটি যুবক নকুলেশ্বরের পদপ্রান্তে প্রণতিপূর্ব্বক যেমন শির উত্তোলন করিবেন এমন সময়ে—জ্যোতির্ম্ময়ীর সুকোমলহস্ত-রচিত শিবগললগ্ন-পুষ্পমাল্যখানি খসিয়া পড়িয়া যুবকের গ্রীবা বেষ্টনপূর্ব্বক তাহার সৌন্দর্য্য দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়া দিল। যুবক সরমপীড়িত হইয়া যেমন দাঁড়াইলেন অমনি পার্শ্বস্থিত বালিকার মধুর ঝঙ্কার তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল—

প্রশ্ন—"রবি দা" ?

উত্তর—"কে ?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কেশব বাবুর শরীরটা তত ভাল নহে—তাই আজ বৈকালে বাহিরে আসেন নাই। অন্দর মহলের দাওয়ায় একখানি গালিচার উপর তাকিয়া ঠেশ দিয়া বসিয়া রৌপ্য-আলবোলায় তামাকু সেবন করিতেছিলেন। আর গ্রামের ২।১ জন বেহারা প্রজা আসিয়া কেন সময়ে খাজনার টাকা দিতে পারে নাই, তাহার কৈফিয়ৎ দিতেছিল; ও যাহাতে বাবু আগামী ধান কাটার সময় পর্য্যন্ত অনুগ্রহ করিয়া অপেক্ষা করেন সেই জন্য অনুনয় বিনয় করিয়া হাতে পায়ে ধরিতেছিল। দয়ার্দ্রচিত্ত কেশব বাবু তাহাদের অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। শেষে প্রতিশ্রুত হইলেন যে যাচিত সময় অবধি তাহাদের প্রতি কোন জোর জবরদস্তি করিবেন না; কিন্তু তাহার পর আর কোন অনুরোধ শুনিবেন না। প্রজারা হৃষ্টচিত্তে বাবুর পদধূলি শিরে লইয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিল।

ক্ষণেক পরে কেশব বাবুর ছোট বিধবা ভগ্নী আসিয়া নিকটে বসিয়া দাদার উপস্থিত শারীরিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার শরীর অনেকটা সুস্থ আছে শুনিয়া মোক্ষদা দেবী কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। তাহার পর বলিলেন—

"দাদা! জ্যোতীর বিবাহের কি ক'চ্ছ? মেয়ে এই আশ্বিনে যে ১৫ বৎসরে পড়বে। আর ত চুপ করে থাকা ভাল নয়।"

ঈষৎ কপাল কুঞ্চিত করিয়া একটু গম্ভীর ভাবে কেশব বাবু উত্তর করিলেন—

"দেখ মোক্ষদা! তুমি জান যে ১৫ উত্তীর্ণ না হ'লে আমি জ্যোতীর বিয়ে দিব না।"

মো। তা জানি। কিন্তু দেখতে দেখতে একটী বৎসর কেটে যাবে। এখন থেকে চেষ্টা না করলে কি পাত্র পাওয়া যাবে? এই বেলা থেকে লোক জন ঘটক না লাগালে কি হবে?

কে। হাঁ তাই ভাবছি। কিন্তু আমাদের পালটি ঘর পাওয়া বড়ই শক্ত।

মো। আচ্ছা দাদা! একটা কথা বলি—জানি না তুমি রাগ করবে কিনা। দেখ, রবি—জ্যোতীকে সত্যই বড় ভাল-বাসে; আর জ্যোতীরও রবি-অন্তপ্রাণ। রবি ত আমাদের পালটি ঘর। ওদের মিলন হইলে বড় সুখের হয়।

একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কেশব বাবু উত্তর করিলেন—

"এ কথাটী আমি অনেকবার ভেবে দেখেছি মোক্ষদা। ওদের মধ্যে যে একটী আন্তরিক সখ্যভাব আছে—তা বে'শ বুঝি। রূপেগুণে রবি উপযুক্ত পাত্র ও আমাদের পালটি ঘরও বটে। কিন্তু দুই কারণে ঐ প্রস্তাব আমাকে পরিত্যাগ করতে হয়েছে। প্রথম কারণ এই যে, তাহার মাতার নামে যে কলঙ্ক রোটেছে, তাতে তার সঙ্গে জ্যোতীর বিয়ে দেওয়া আমার সাজে না। পিতা কর্ত্তৃক বিতাড়িত রবির সঙ্গে কেশব বাঁড়ুয্যের পৌত্রীর বিবাহ দিলে লোকে বলবে কি? তার উপর সে গরীব।

মো। দাদা! তুমি ত অনেকবার বলেছ যে ভাল সুপাত্র পেলে, গরিবের ছেলে হলেও তুমি ঘর জামাই রাখতে পার। বংশে ত ঐ একটী মেয়ে। ঈশ্বরের কৃপায় যা বিষয় আছে তাতে তিন পুরুষ কাউকে খেটে খেতে হবে না। রবি গরিব হলেই বা ক্ষতি কি? আর গরীব না হ'লে ঘর জামায়ে থাকবেই বা কেন?

কে। হাঁ! ভাল পাত্র পেলে ঘর জামাই রাখতে পারি, ও তাই আমার ইচ্ছা বটে। কিন্তু যাকে ঘর জামাই রাখবো তার একটী বংশ মর্য্যাদা চাইত। পয়সা বেশী না থাকে ক্ষতি নাই। কিন্তু যার মা স্বামী কর্ত্তৃক বিতাড়িতা হয়ে মাসিক ১০৲ টাকা বৃত্তি নিয়ে ভ্রাতার অন্নে প্রতিপালিত—এরকম কুলশীল বিশিষ্ট পাত্রকে মনোনীত করার চেয়ে জ্যোতীকে কুমারী রাখা ভাল।"

মো। কিন্তু এর কারণটা ত দেখা উচিত।

কে। "দেখ ভগ্নি! কারণ দেখা দেখির ভার আমার উপর নহে। যে ত্যাগ করেছে সে ভার তার উপর। স্ত্রী যদি কুলটাও হয় আর তার স্বামী যদি সেটা গোপন রেখে স্ত্রীকে নিয়ে সমাজে থাকে, তবে কোন কথা বলা সাজে না—আর স্ত্রী যদি সতী সাধ্বী হয় আর তার স্বামী তাকে কুলটা অপবাদ দিয়ে তাড়িয়ে দেয়, তা হ'লে সমাজ তাকে কি বলে? সমাজ কি তাকে নিতে পারে? ও কথা আর তুলো না। রবির সঙ্গে জ্যোতীর বিয়ে কোন রকমেই হ'তে পারে না।

এই সময় বৃদ্ধ সরকার বিনোদ রায় একখানি টেলিগ্রাম

লইয়া অন্দরে আসিল ও বাবুকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। সরকার মহাশয় বহুকালের লোক। তাঁহার বয়স প্রায় ৬০ বৎসর হইবে। বৃদ্ধ বিনোদের সর্ব্বত্র অবারিত গতি। তিনি আসিবামাত্র জ্যোতীর বিবাহের কথা চাপা পড়িয়া গেল। মোক্ষদা দেবী দাঁড়াইয়া উঠিলেন। সরকারের ব্রস্তভাব দেখিয়া কেশব বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—

"সরকার মশাই, কিখবর? কলিকাতা থেকে মোকদ্দমার কোন সংবাদ এসেছে নাকি?"

বি। আজ্ঞা হাঁ, উকিল রসময় বাবু তার করেছেন যে হাইকোর্টের আপিল মোকদ্দমায় আমাদের হার হয়েছে। নিম্ন আদালতের রায়ই বাহাল রহিল! গভর্ণমেণ্ট পক্ষে জয় হলো, এখন উপায়?

পঠাক! বুঝিয়াছেন যে রবীন্দ্রের পিতা রসময়ই কেশবের উকিল। সরকার মহাশয়ের কথা শুনিয়া কেশব বাবু যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন—তাই ত! কি সর্ব্বনেশে খবরটাই আজ এলো। বরাকরে সনৎপুরটী আমার ভাল জমিদারী। বৎসর সালিয়ানা ১০।১২ হাজার টাকা মুনাফার জমিদারী আজ বেহাত হতে চ'ললো। বিনোদ তোমার কথা শুনে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হল। তাই ত কি করি?

বি। দেখুন—সনৎপুর জমিদারী আমরা বহুদিন ধরে দখল করে আসছি বটে, কিন্তু ঐ সম্বন্ধে স্বত্ব সাব্যস্তের কোন

দলিল পত্রাদি কোন কালেই ছিল না। রূপনগাঁও জমিদারীর সঙ্গে এক লাগাও ও লপ্ত ব'লে আমরা সনৎপুরটিকে আমাদের জমিদারীর মধ্যে টেনে এনে দখল করে আসছি। সে বৎসর গভর্ণমেণ্ট তরফে জরিপ কার্য্যের সময় যখন সরকার বাহাদুর বাদী হয়ে আমাদের স্বত্বের প্রমাণ দেখতে চাইলেন, তখন আমরা দখল ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ দিতে পারি নাই। এই জমিদারীতে কয়লার খনি বেরিয়েছে ব'লেই সরকার তরফ থেকে যত রকমের ওজর আপত্তি উঠলো—তাই না সরকারের সঙ্গে মামলা, আর তার ফলে আজ এই দুঃসংবাদ।

কে। কি সুবিচার যে হলো তা বুঝলেম না। দখলটা কি একটা প্রমাণ নয়? চুলোয় যাক্ গে। আদালত যখন প্রমাণ ব'লে গ্রাহ্য করছে না তখন আর কি বলবো বল? কিন্তু কি উপায়? আমি প্রায় ৩০০০০৲ টাকা খরচ করে খনি কাটিয়ে মাত্র দুই বৎসর কয়লা তুলে কিছু টাকার আমদানী করা, আর তাইতে যত গণ্ডগোল বেধে গেল। এখনও যে আমার ঘরের ২৫০০০৲ টাকা তুলতে বাকি?"

বিষণ্ণভাবে সরকার বিনোদ উত্তর করিল—"আজ্ঞা, তা ত বুঝছি। কিন্তু এখন উপায় কি? হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে বিলাত আপীল করলে হয় না?"

কে। একটু চিন্তিতভাবে কেশব উত্তর দিল—"তা ভিন্ন ত আর গত্যন্তর আছে ব'লে বোধ হয় না। তুমি কাল সকালের জন্য বেহারাদের ব'লে রেখো। আমি কালই

কলিকাতায় রসময় বাবুর নিকটে রওনা হব। তুমিও সঙ্গে যাবে।

বি। যে আজ্ঞে।

কে। বিলাতে আপীল ত করতে চাই। কিন্তু তাতেও টাকা চাই। সেত ছুটি খানি কথা নয়। সে টাকারই বা যোগার হয় কি রকমে? এই সে দিন ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের হাতে দাতব্য হাঁসপাতাল ও গাঁয়ের পাকা রাস্তা করবার জন্য বিশ-হাজার টাকা দিলাম। এই মোকদ্দমাটা দুই কাছারী চালাতেও প্রায় বার হাজার টাকা গেল, খনি কাটাতে কতক-গুলো নগদ টাকা গেল। এখন আরও নগদ টাকা পাই কোথায়?

সরকার বিনোদ এই সমস্যার উপস্থিত কোন মীমাংসা করিতে না পারিয়া বলিল,—

"আজ্ঞে আগে চলুন উকিল বাবুর সঙ্গে দেখা করি তার-পর তিনি যেমন পরামর্শ দেন সেই মত করা যাবে। রসময় বাবুর কাছে গেলে টাকার একটা মীমাংসা হবেই। আর কত টাকা আন্দাজ খরচ হবে তাও কতকটা অনুমান করতে পারা যাবে।"

এইরূপ প্রভু ভৃত্যে বহুক্ষণ ধরিয়া কথোপকথন ও পরামর্শ চলিল ও আইন আদালত সংক্রান্ত কাগজ পত্রাদি বাহির করা ও দেখা শুনার ঘটা পড়িয়া গেল। তাহার পর প্রায় রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় বিনোদকে বিদায় দিয়া কেশব বাবু সান্ধ্যকৃত্য সমাপন করিবার জন্য আসন ত্যাগ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্বামী কর্ত্তৃক বিতাড়িতা হইবার পর মেনকাদেবী সুবিচার পাইবার আশায় বহুবার অনুনয় বিনয় করিয়া পত্র দিয়াছিলেন পরিশেষে তাঁহার ভ্রাতা নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় একবার নিজে রসময়ের নিকট গিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে তাঁহার ভগ্নীর সম্বন্ধে ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য করিবার জন্য অনুনয় করেন। কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হয় নাই। অধিকন্তু রসময় তাহাকে কটু গালি দিয়া ও ভর্ৎসনা করিয়া তাড়াইয়া দেন। মেনকাদেবী ইহার পর গত্যন্তর না দেখিয়া নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া শিশু সন্তান রবির মুখ চাহিয়া মনস্তাপ ও হৃদয়ের দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে করিতে দিন কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহার ভ্রাতা ইহার কিছুদিন পরে হঠাৎ বিসূচিকা রোগে মারা যান। ভ্রাতার মৃত্যুর পর মেনকাদেবী তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ সম্পত্তি ও স্বামীর স্বেচ্ছা প্রেরিত মাসিক দশটি টাকা লইয়া পুত্রের লালন পালন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। নীলমণির মাত্র ১০।১২ বিঘা ধান্য জমি ও কাঠা তিনেক জমির উপর দুইখানি খড়ের ঘর, একটি পাকশালা ও একটি গোয়াল ঘর— এই মাত্র সম্পত্তি ছিল। কায়ক্লেশে কোন রকমে মাতা পুত্রের দিন কটিতে লাগিল। নরগ্রামে একটী মাইনার স্কুল ছিল। রবীন্দ্র পঞ্চম বর্ষে পড়িলে পর শুভ দিনে মাতা, পুত্রের হাতে

খড়ি দিয়া তাহাকে স্কুলে পাঠাইলেন। ক্রমে রবীন্দ্র মাইনার স্কুল হইতে শেষ পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করিল। মাসিক ৫৲ টাকা বৃত্তি লইয়া বর্দ্ধমান রাজ কলেজে ৪র্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইল। তখন কলেজটী ফ্রী কলেজ ছিল। ইহাতে ম্যালেরিয়া, বন্যা ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত বর্দ্ধমান জেলার অনেক গরিব ছাত্রের অধ্যয়নের বিশেষ সুযোগ ছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, উপস্থিত গরিব ছাত্রদের এরূপ সুবর্ণ সুযোগ কি জানি কেন কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। যাহা হউক আমাদের রবীন্দ্র বিনা বেতনে বর্দ্ধমান রাজ কলেজে পড়িবার অনুমতি পাইয়াছিল। যেদিন পুত্র মাতাকে ছাড়িয়া বর্দ্ধমান যাত্রা করে, সে দিন মেনকা দেবীর হৃদয়ে যে কি অব্যক্ত যন্ত্রণা হয় তাহা ভুক্তভোগী না হইলে কে বুঝিবে? প্রকৃতই মেনকাদেবী তাঁহার একমাত্র অঙ্কের মণিকে চক্ষের অন্তরাল করিয়া দিন কতক আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া শয্যাশায়িনী হইয়াছিলেন। মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা বৃত্তি ও তাহার পিতা প্রেরিত দশ টাকা হইতে ৫৲ পাঁচ টাকা লইয়া রবীন্দ্রনাথ বর্দ্ধমানে অধ্যয়ন আরম্ভ করে। রবীন্দ্রনাথ অতিশয় প্রতিভাশালী ছিল। সে নিজের অবস্থার বিষয় যতই ভাবিত ও মাতার নিকট পিতার অত্যাচারের কথা যতই শুনিত ততই স্বাবলম্বন গ্রহণ পূর্ব্বক স্বনাম ধন্য পুরুষ হইবে এরূপ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিত, আর এই প্রতিজ্ঞা লইয়াই সে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। তাহার সুন্দর রূপ ও অমায়িক হৃদয় থাকায় জন্য গ্রামের অনেকেই তাহাকে

প্রীতির নেত্রে দেখিত। বিশেষ কেশব বাঁড়ুয্যে তাহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। তিনি প্রায়ই তাহার সংসারিক অবস্থার বিষয় সংবাদ রাখিতেন ও তাহার দুঃখিনী মাতার দুঃখে মর্ম্ম পীড়িত হইয়া তাহার সম্মান ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যতদূর সম্ভব সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না।

দিন কাহারও জন্ম অপেক্ষা করে না। আরও কয় বৎসর কাটিয়া গেল। যথা সময়ে রবীন্দ্র এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইল। যখন এই সংবাদ নরগ্রামে পৌঁছিল, তখন মেনকাদেবী নকুলেশ্বরের মাথায় বিল্বদল ও পুষ্প দিয়া পূজা করিতেছিলেন। বালক রবীন্দ্র যখন এই শুভ সংবাদটি জননীকে দিবার জন্ম দ্রুত পদ বিক্ষেপে শিব মন্দিরের দিকে জননীর উদ্দেশ্যে যায় তখন মাতা মুদ্রিত নেত্রে শিবের ধ্যান করিতেছিলেন। এই জন্ম রবীন্দ্র মন্দির দ্বারে দেবতাকে প্রণাম করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। পূজা সমাপন হইলে পর পুত্র মন্দির মধ্যে অগ্রসর হইয়া পুনরায় দেবতাকে প্রণাম পূর্ব্বক মাতৃপদধূলি শিরে লইয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিল।

এ সময় পুত্রের তথায় আগমনের কারণ মাতা জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর করিল—"মা! আমি ২০৲ টাকা জলপানি পেয়েছি, এই দেখ।" বলিয়া বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের তালিকাযুক্ত একখানি গেজেটের নকল বাঙ্গালা সংবাদ পত্র মায়ের পদপ্রান্তে ফেলিয়া দিল। মেনকাদেবী শুধু 'বাবা' এই কথাটি উচ্চারণ

করিয়া পুত্রের মস্তকটি নিজের ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া একবার হাত দিলেন আর কিছু বলিতে পারিলেন না। মাতার গণ্ড বহিয়া অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। স্কুলের পাঠ্য ছাড়া রবীন্দ্রনাথের কলা বিদ্যায় বিশেষ অনুরাগ ছিল। অতি অল্প বয়স হইতে চিত্র অঙ্কন কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিয়া ছিল। সে প্রায়ই চিত্র আঁকিয়া নিজের অবসর অতিবাহিত করিতে ভাল বাসিত।

কেশব বাবুর বাটী ও রবীন্দ্রের মাতুলালয় খুব কাছাকাছি। গ্রাম সম্পর্কে রবীন্দ্রের মাতুল নীলমণি, কেশব বাবুকে কাকা বলিয়া ডাকিতেন। সেইসূত্রে রবীন্দ্র তাহাকে দাদা মহাশয় বলিয়া সম্বোধন করিত। এই দুই পরিবারের সহিত চিরকাল সদ্ভাব থাকায় রবীন্দ্রের সহিত জ্যোতীর খুব মেশামিশি ও ভাব হয়। বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ যখন নরগ্রামে থাকিত, তখন সে দিবসের অধিক সময় কেশব বাবুর বাড়ীতে অতিবাহিত করিত। জ্যোতীর্ম্ময়ীর তাহার প্রতি একটা আন্তরিক ভালবাসা ও সদ্ভাব থাকায় রবীন্দ্র তাহাকে ছোট ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ করিত। জ্যোতী যখনই যে আবদারটি করিত রবি তাহা পূর্ণ করিতে না পারিলে প্রকৃতই অন্তরে একটা কষ্ট অনুভব করিত। গ্রীষ্মাবকাসে ও পূজার ছুটিতে প্রায়ই রবীন্দ্র দেশে আসিত। এই সময় তাহারা দুইজনে প্রায়ই একত্রে বসিয়া কত রকম গল্প গুজবে যে সময় কাটাইত তাহার আর বর্ণনা করা যায় না। নরগ্রামে রবীন্দ্রের অনুপস্থিত কালে কি কি উল্লেখযোগ্য ঘটনা

ঘটিয়াছে, তাহাদের গোলাবাড়ী হইতে কে কবে ধান্য চুরি করিয়া, ধরা পড়িয়াছে, ধরাপড়ার পর চোরের কি দণ্ড হইয়াছিল ও জ্যোতী দাদা মহাশয়ের হাতে পায়ে ধরিয়া চোরকে একরকম বিনা সাজায় অব্যাহতি দিয়াছে, প্রজা বেহারীর মেয়ের অসুখের সময় জ্যোতীর্ম্ময়ী কিরূপ ভাবে সাহায্য করিয়াছে ও বর্দ্ধমান হইতে কি কি জিনিষ ও বাগানের ফল মূলাদি দিয়াছে, তাহার দাদা মহাশয়ের শরীর অসুস্থ কালে সে কিরূপ পরিচর্য্যা করিয়াছে, রবি তাহাদের বাগানে যে কলমের গোলাপ ও আমের গাছ পুতিয়াছিল, তাহার কিরূপ ফুল ও ফল হইয়াছিল ও প্রথমে ফুলটি ও ফলটি দিয়া সে কিরূপে নকুলেশ্বরের পূজা করিয়াছিল রবি তাহাকে যে যে পুস্তক পাঠ করিবার জন্য নির্ব্বাচন করিয়া দিয়াগিয়াছিল তাহার কতদূর সে অধ্যয়ন করিয়াছে ও যাহা নিজে বুঝিতে পারে নাই তাহা দাদামহাশয় ও সরকার মহাশয়ের নিকট হইতে কত কষ্টে বুঝিয়া লইয়াছে—এই সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিতে জ্যোতী আনন্দ পাইত; আর রবীন্দ্র বর্দ্ধমানে ছাত্ররূপে থাকা কালীন কিরূপ কষ্ট সহ্য করিয়াছে, তথাকার উল্লেখ যোগ্য কি কি ঘটনা ঘটিয়াছে, তথায় তাহার মনে কি কি ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহার মাতার জন্য, জ্যোতীর্ম্ময়ীর জন্য, গ্রামের জন্য সে কিরূপ মনোকষ্ট পাইয়া থাকে, রবীন্দ্র নূতন ধরণের কি কি চিত্র আঁকিয়াছে, চিত্রের অঙ্কিত বিষয় গুলির আদর্শ কোথা হইতে লইয়াছে প্রভৃতি যাবতীয় ছোট বড় ঘটনা শতমুখে বর্ণনা করিত ও জ্যোতির্ম্ময়ী একাগ্রচিত্তে তাহা শুনিত। কিন্তু

রবীন্দ্রের প্রবাসে থাকা কালীন দুঃখ ভোগের কথা যখনই জ্যোতির্ম্ময়ী শুনিত, তখন তাহার নেত্র প্রান্তে অশ্রু কণা দেখা দিত, কখন কখন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সমবেদনা জানাইত।

এই ভাবে পরস্পরের সখ্যভাব উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। পরে ইহা উভয়ের হৃদয়ে প্রেমে পরিণত হইয়াছিল কিনা তাহা বলা যায় না। কিন্তু যখন উভয়েই কৈশোরের সীমা পার হইয়া যৌবনে পদার্পণ করে, সেই সময় হইতে পল্লীবাসীদের মধ্যে কতকগুলি বদলোক ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া উভয়ের এই আসক্তিকে গভীর প্রেমের লক্ষণ বলিয়া চারিদিকে কুৎসার প্রচার করিতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে অনেকেই একত্রে দলবদ্ধ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতে লাগিল ও কেহ সমস্ত কথা শুনিয়া উত্তর দিল—"শেষটা কেশব বাড়ুয্যের নাতনীর একটা আসল কুলীন পুত্রের সঙ্গে বিয়ে হবে দেখছি—কালে কত কি দেখতে হবে"—কেহ আবার বলিল—'আর দেখা যায় না। সমাজ একেবারে যেতে বসেছে—এর একটা প্রতীকার চাই'—কেহ বলিল—"সমাজের মাথা কেশব বাঁড়ুয্যে—তার নাতনীকে নিয়ে এরকম কেলেঙ্কারী? এতে হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুর কর্ম্ম কাণ্ড সমস্তই লোপ পেতে চললো।" গ্রামের যাঁহারা মোড়ল তাহাদের মরসুম পড়িয়া গেল। গাছতলায় চণ্ডীমণ্ডপে চারিদিকে ইহার আলোচনা চলিতে লাগিল। অবশেষে ইঁহারা সকলেই এক জোটে প্রতিজ্ঞা করিল যে, যেমন করিয়া হউক কেশব বাঁড়ুয্যেকে এক ঘ'রে

করিতে হইবেই, তা না হ'লে জা'ত জন্ম সমস্তই নষ্ট হইতে চলিল। মূল কথা এই ঘটনায় ইহাদের অলস-কর্ম্মহীন-জীবনে বেশ একটি সজীবতা জাগিয়া উঠিল। ক্রমে কথাটী পথে ঘাটে, দোকানে ও মেয়ে মহলে শাখা প্রশাখা সমন্বিত হইয়া প্রচারিত হইতে লাগিল। যাহাহোক অনেকেই মুখে খুব আস্ফালন করিল বটে; কিন্তু সাহসে ভর করিয়া এই প্রতিজ্ঞাটি কার্য্যে পরিণত করিতে সকলেই ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। জনরবের বাতাসে এই সংবাদ রবীন্দ্রের নিকট পৌঁছিতে অধিক বিলম্ব হইল না। রবীন্দ্র এইরূপ একটী অলীক অভিযোগের বিষয় শুনিয়া মরমে মরিয়া গেল। ইহার পর জ্যোতীর্ম্ময়ীর সঙ্গে এমন কি দেখা শুনা করিতে রবীন্দ্র কেমন দ্বিধা বোধ করিতে লাগিল। যদিও জ্যোতীর্ম্ময়ীর আকিঞ্চনে মাঝে মাঝে তাহাকে আসিতে হইত বটে; কিন্তু রবীন্দ্র মনে মনে শপথ করিয়াছিল যে, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত নরগ্রামে আসিবে না এইরূপে মর্ম্মপীড়িত হইয়া রবীন্দ্র বর্দ্ধমানে এফ, এ, পড়িবার জন্য যাত্রা করে, এবং দুই বৎসরের মধ্যে মাত্র দুইবার নরগ্রামে আসিয়া ২।৩ দিন মাতার নিকট থাকিয়া চলিয়া যায়। মাতা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অধ্যয়নের ক্ষতি হইবে এই ভাবের কৈফিয়ৎ দিয়া চলিয়া যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

৺তারকেশ্বর ধাম হিন্দু মাত্রেরই জানা আছে। তথাকার পাণ্ডা ঠাকুরদের ও বাসাওয়ালাদের আজ একটী মহোৎসব। আজ খুলনার এক জমিদার পুত্র বন্ধুবান্ধব সহ এখানে আসিয়া "বেলপুকুরের" সম্মুখে একখানি বাসাবাড়ীতে খুব জমাট ফুর্ত্তি চালাইতেছে। মন্দিরার সহিত তবলার চাঁটি—তৎসঙ্গে নারীকণ্ঠের সুমধুর সঙ্গীতের তান ও শ্রোতাদের উচ্চকণ্ঠে "বাহবা" "বাহবা" "কেয়াবাৎ" ধ্বনিতে ব্যোমভোলানাথের গাঁজার নেশা কাটিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। গত রাত্র হইতে 'হররা' চলিতেছে। বাসাওয়ালাদের ও তথাকার পাণ্ডাঠাকুরদের বহুদিন এরকম সুযোগ ঘটে নাই। ইহারা সকলেই উদ্‌গ্রীব চিত্তে এই মজিলিসের তাঁবেদারি করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। প্রাতঃকালে 'প্রভাতী' ও "ভৈরবী" র অবতারণার পর রমণীদের মধ্যে একজন বলিলেন—'চল এখন এইখানেই বন্ধ করা যাক'। তৎক্ষণাৎ সাঙ্গোপাঙ্গগণ চিৎকার করিয়া উঠিলেন—"হাঁ হাঁ ঠিক। বেলা ১১টা বাজতে চল্‌লো। এখন বন্ধ না কর্‌লে আবার সময়ে গাড়ী ধর্‌তে পারা যাবে না।" সভা ভঙ্গ হইল। সমুপস্থিত জনমণ্ডলীর একটু দূরেই অথচ সেই দাওয়ার একপার্শ্বে একটি ব্রাহ্মণঠাকুর উৎকণ্ঠিতভাবে উপবেশন করিয়াছিলেন। সভা ভঙ্গ হইল দেখিয়া তিনি আগ্রহ সহকারে বাবুর সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আজ্ঞে! মাঠাকুরাণীর জন্য ও আপনার জন্য কি রকম পূজার আয়োজন করবো? হুকুম হোক হুজুর!"

রমণী মণ্ডলীর মধ্যে একজন বলিলেন,—

"দেখ বামুণঠাকুর! আমাদের পূজার ভাল বন্দোবস্ত করে দিতে হবে। আর যাতে বাবুর মানের উপযুক্ত পূজা হয় সেই রকম ব্যবস্থা করতে হবে। টাকার জন্য ভাবনা নাই।"

বা। আমিও তাই বলছি মা! তা গদিতে কত দিবেন? বাবুর বন্ধুবর্গের মধ্যে একজন কিছু 'বে-একতার' হইয়াছিল। তাহার নেশার মাত্রা কিছু অধিক হওয়ায় সে অসংযত বস্ত্রে চিৎপাৎ হইয়া মাদুরের উপর শুইয়াপড়িয়াছিল। চক্ষু দুইটী মুদ্রিত ছিল বটে; কিন্তু জ্ঞান একেবারে লোপ পায় নাই। বামুণঠাকুরের কথা শুনিয়া এই লোকটী বলিল—

"কি বাবা! গদিতে আবার কি দিতে হয়? কিসের গদি বাপ ধন?"

বা। আজ্ঞে মশায়! বাবার গদি? গদিতে কিছু না দিলে বাবার দর্শন হয় না, হুজুর!

মাতাল। ও বাবা! তাহলে দেখছি তোমাদের এখানে বাবাকে দেখ্‌তে গেলে ১নং ঘুস গদিতে দিতে হবে?

বা। আজ্ঞে।

মা। তারপর?

বা। আজ্ঞে! বাবার দরজায় কিছু দিতে হয়।

মা। বেশ বলছ বাপ! তাহ'লে ২য় নং ঘুস দরজায় দিতে হয়। তারপর? ব'লে যাও বাপ বলে যাও।

বা। আজ্ঞে—তারপর বাবার মাথায় কিছু দিতে হয়।

মা। তাত হবেই! তারপর? তারপর? চটপট বল বাবা! ভোলানাথের চেলাবর্গ নন্দী ভৃঙ্গি দালালবর্গ তোমাদের ত আর গদি নাই—তোমাদের মাদুর চাটাইয়ে কিছু দিতে হবে না।

বা। আজ্ঞে সেত আছেই। আপনাদের মত বাবুরা যখন এসেছেন তখন সে কথা আর মুখে বলতে হবে কেন হুজুর! আমরা কি আর লোক চিনি না, বাবু!

এই সময় রমণীবর্গ মধ্যস্থ কর্ত্রী স্বরূপিণী বিজলী সুন্দরী বলিয়া উঠিল—

"ঠাকুর পো—আর মাতলামী করতে হবে না। এখন ওঠ, বাবার পূজায় যাই চল।"

মাতাল। না বৌ দি! বাবার দর্শন আমার দ্বারা হবে না

বিজলী। কি মাতলামী কর?

মা। না বৌ দি! মাতলামী নয় সত্যি বলছি।

বি। তাহলে সত্য সত্যই তুমি যাবে না?

মা। না কখনই না।

ইহা শুনিয়া জমিদার পুত্র আর অপেক্ষা করিতে সম্মত না হইয়া কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ ভাবে বলিলেন—

"না যায় তবে ও থাক্। পাষণ্ড ওটা প'ড়ে থাক্; এতদূর এসে যদি বাবার পূজা না করে তবে এই খানেই মরুক।"

মাতালের এইবার রাগ হইল। সে কায়ক্লেশে কোন প্রকারে একবার মাদুরের উপর উঠিয়া বসিয়া কাপড়ের কসি গুঁজিতে গুঁজিতে বলিল—

"পাষণ্ড বল্লে কেন? বলি পাষণ্ড বল্লে কেন? দাদা, আমি পাষাণ্ড—না তোমার বাবা তারকেশ্বর পাষণ্ড? দাদা এই যে এত খরচা পত্র করে এতদূর থেকে এখানে এসে প্রায় ২৪ ঘণ্টা কাল বাবার দরজার কাছে এসে গড়াগড়ি দিচ্ছি, বাবা কি তা বুঝলেন? যদি বুঝতেন তাহলে এতক্ষণের মধ্যে অন্তত একবারও এসে জিজ্ঞাসা করতেন— "কি হে নদের চাঁদ! কেমন আছ? বাড়ীর কুশল ত? কোন কষ্ট হচ্ছে না ত! তা কি করেছেন? তাই বলি অমন ঘুম খোর একচোকো দেবতাকে আমি দর্শন করিতে চাই না। যাও দাদা—যাও, ভেগে পড়। আমি ইতি মধ্যে একটু খোঁয়াড়ি কাটাবার ব্যবস্থা করি।"

"তুমি উচ্ছন্ন যাও।" এই বলিয়া জমিদার পুত্র তাহার নব প্রণয়িনী বিজলী সুন্দরীকে সঙ্গে লইয়া মন্দিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

মন্দিরের সম্মুখে অনেকেই বাবাকে দর্শন ও পূজা করিবার মানসে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ঠিক মন্দিরের দরজার সম্মুখে একটী প্রৌঢ়া রমণী 'হত্যা' দিতেছেন ও কিশোর

বয়স্ক পুত্র মাতার মানৎ কার্য্যে সহায়তা করিবার নিমিত্ত সন্নিকটে দাঁড়াইয়া আছে। এমন সময়ে একটা হৈ হৈ শব্দ পড়িয়া গেল। ব্যাপার কি? ব্যাপার কিছুই নহে খুলনার জমিদার পুত্র ও তাহার প্রণয়িনী মন্দির মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক নির্জ্জনে পূজা অর্চনা করিবেন। অতএব বাহিরের জনসাধারণের পক্ষে অর্দ্ধ ঘণ্টার জন্য মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ। দেবতাকে কিয়ৎক্ষণের জন্ম একাধিপত্য অধিকারের মূল্য স্বরূপ জমিদার পুত্র পাণ্ডাদের হস্তে ১০০ টাকা দিয়াছেন। আজ হিন্দুর একটা পর্ব্বদিন বলিয়া মূল্যটা কিছু বাজার দর অপেক্ষা চড়িয়া গিয়াছে। যাহা হ'ক এই ব্যাপারে প্রৌঢ়ার ধর্ম্মকার্য্য কিছুক্ষণ স্থগিত রহিল ও তাহার পুত্র মাতাকে একপার্শ্বে সরাইয়া আনিয়া নিকটে উপবিষ্ট হইয়া বাবুদের কার্য্য কলাপ ও গতিবিধি অবলোকন করিতে লাগিল।

সর্ব্বসাধারণের সহিত বাবুর দলবলের পূজা শেষ হইলে পর জমিদার পুত্র ও তাহার প্রণয়িনী পুরোহিত সমভিব্যাহারে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমে যথাদিষ্ট পূজা শেষ করিলেন। পরে মুহূর্ত্ত কালের জন্ম পুরোহিত ঠাকুর বাহিরে আসিলেন। ভিতরে রহিলেন শুধু বাবু ও বিবি।

বাবুকে বিবি দেবতার মস্তক স্পর্শ করাইয়া বলিলেন "ক্ষিতীশ। মনে আছে কি বলে আমায় এপথে এনেছ?"

বাবু। মনে আছে।

বি। আজ বাবার মাথায় হাত দিয়ে শপথ করে বল যে সে কথার কখন অমর্য্যাদা করবে না। মনে রেখো তোমার

জন্য আমি ধর্ম্ম কর্ম্ম স্নেহ মমতা সমাজ-বন্ধন সমস্ত ছেড়ে এসেছি।"

বাবু। আমায় অবিশ্বাস করো না।

বি। না তুমি শপথ কর।

বা। আমি দেবতা স্পর্শ ক'রে শপথ করছি যে—প্রথম সুযোগেই অর্থাৎ যে দিনই বাবা আমায় শুভদিন দিবেন সেই দিনই তোমাকে বিবাহ করবো।

বি। ঠিক বলছো?

বা। ঠিক বলছি।

বি। মিথ্যা হবে না?

বা। না কথনও মিথ্যা হবে না।

বি। জীবনে ভুলবে না।

বা। না কথনও না।

অতঃপর পূজা সাঙ্গ হইল। জনসাধারণের পুনরায় মন্দির মধ্যে প্রবেশাধিকার মিলিল। প্রৌঢ়া নিজ পূজা শেষ করিতে না করিতে তাঁহার পাণ্ডার মুখে শুনিলেন যে, ঐ আগন্তুক যুবক খুলনার জমিদার রসময় মুখুয্যের পুত্র ক্ষিতীশচন্দ্র মুখুয্যে শুনিয়াই তাঁহার মস্তিষ্ক ঘুরিয়া গেল। তাই আবার জিজ্ঞাসা করিলেন— "কি বল্লে ঠাকুর! কার ছেলে ঠাকুর? কোথাকার জমিদার বাবা?"

ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন—"খুলনার জমিদার রসময় মুখুয্যের

ছেলে—মা! খুব বড় লোক, ভারী উঁচু মেজাজ, মা! এখানে আরও দু'একবার এসে খুব খরচ পত্র করে গেছেন।"

"আমার স্বামী কুলের বংশধর? হা শঙ্কর!" অর্দ্ধস্ফুট স্বরে এই বলিয়া রমণী মূর্চ্ছিতা হইয়া মন্দির সম্মুখে পড়িয়া গেলেন।

তাঁহার পুত্র রবীন্দ্র মাতাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া স্বল্প সুশ্রূষায় চেতনা সম্পাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

মা! উপবাসে কি কষ্ট হয়েছে? অমন মাথা ঘুরে পড়ে গেলে কেন মা?

মাতা নীরব।

সুদূর অতীতের স্মৃতি আসিয়া তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। অতীতের ঘটনা পরম্পরার ঘাত-প্রতিঘাতে আত্মহারা হইয়া তিনি নির্ব্বাক্ রহিলেন—কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। শুধু দুই নেত্র প্রান্ত হইতে অজস্র অশ্রুধারা গণ্ড বহিয়া ছুটিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আরও কিছু কাল কাটিয়া গেল। কেশব বাবু নিজের জমিদারীর কতকটা অংশ রসময় বাবুর নিকট বন্ধক দিয়া প্রায় বিশ সহস্র মুদ্রা কর্জ্জ করিয়া হাইকোর্টের মামলার রায়ের বিরুদ্ধে বিলাতে আপিল করিলেন।

এদিকে রবীন্দ্রনাথ যথাক্রমে বর্দ্ধমান রাজ-কলেজ হইতে এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় বি, এ, পাঠ করিতে গেল। এফ, এ, পরীক্ষায় ২৫৲ টাকা বৃত্তি পাইল; এবং কলিকাতায় একজন কারবারী ধনী মাড়োয়ারী সন্তানকে সন্ধ্যার পর ঘণ্টা দুই পড়াইয়া মাসিক ৩০ টাকা উপার্জ্জন করিত। এই অর্থের দ্বারা, বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তির দ্বারা ও তাহার পিতৃদত্ত মাসিক আয়ে কলিকাতার ঘোড়াবাগানে এক মেসে থাকিয়া রবীন্দ্র ডফ্ কলেজে বি, এ, পরীক্ষার জন্য অধ্যয়ন সুরু করিল। নিজের ন্যায্য খরচ বাদে যাহা উদ্বৃত্ত রাখিতে পারিত তাহা তিনি দুঃখিনী জননীর নিকট পাঠাইয়া দিত। উপস্থিত ইহাতে তাঁহাদের মাতা পুত্রের দুই স্থানের ব্যয় কতকটা স্বচ্ছল ভাবে সংকুলান হইয়া যাইত।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে লিখিত ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিবার পর রবীন্দ্রের জননীর প্রাণে একটা ভীষণ আঘাত লাগে ও সেই সঙ্গে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে আরম্ভ করে। সপত্নীপুত্র ক্ষিতীশচন্দ্রকে

দেখিয়া তাঁহার মনে যে কোনরূপ ঈর্ষ্যার ভাব উদয় হইয়াছিল বা নীচ সংকীর্ণতা আসিয়া তাঁহার অন্তর্দ্দাহ বা মর্ম্মপীড়া উপস্থিত করিয়াছিল এরূপ যেন কেহ মনে না করেন। তাঁহার মনকষ্টের প্রধান কারণ, তাঁহার স্বামী কুলের ভাবী উত্তরাধিকারী ক্ষিতীশচন্দ্রের ঘোর চরিত্রহীনতা। তিনি বুঝিয়া ছিলেন যে, তাঁহার অবর্ত্তমানে এইরূপ সন্তানের হস্তে স্বামীর অতুল বিষয় বিভব ও তাঁহার যশ কুলমর্য্যাদা সমস্তই অতি অল্প সময়ের মধ্যে লোপ পাইবে। ক্ষিতীশচন্দ্র যে সংসারের ভাবী অধিকারী, সেই সংসারের পত্তন যে মেনকা দেবীর নিজহাতের। তাহার ভিত্তি তিনিই যে স্থাপিত করিয়াছেন—তাঁহারই পুণ্যে, তাহারই যত্নে,—তাঁহারই মিতব্যয়িতায়, তাঁহারই নৈপুণ্যে ও কার্য্য কুশলতায়—এবং তাঁহারই শিক্ষায় যে সেটি এতবড় হইয়াছে। সে সংসার যে তাঁহার হাতে গড়া—বড় সাধের—বড় আদরের জিনিষ। তিনি সেই সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন বটে; সেই সংসার হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন বটে, কিন্তু সেই সংসার যে এখনও তাঁহার অস্থি ও মজ্জার সহিত মিশিয়া রহিয়াছে—সেটা যে তাঁহার স্বামীর। তিনি যে তাঁহার সেই আদরের যতনের ধনটিকে স্বামীর হাতে তুলিয়া দিয়া আসিয়াছেন।

কল্পনার নেত্রে যখন তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার স্বামীর অবর্ত্তমানে সপত্নীপুত্রহস্তে সে সংসারের কি অধোগতি ও পরিণাম হইবে, তখনই তিনি শিহরিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। সাধ্বীর প্রাণে বড়ই বিষম চোট লাগিল। প্রতিকার করিবার কোন

উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না। অথচ মর্ম্মপীড়ায় পীড়িত হইয়া তাঁহার মনোভঙ্গ উপস্থিত হইল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দেহ ভঙ্গের সূত্রপাত আরম্ভ হইল। যুবক রবীন্দ্র মাতার অসুস্থতার কারণ ভাল বুঝিলেন না ও তাঁহার বুঝিবার উপায়ও ছিল না। যে ব্যাধি অতি সন্তর্পনে আস্তে আস্তে মানবদেহকে অধিকার করে, এবং যাহার প্রথম আক্রমণ রোগী ভাল বুঝিতে পারে না, সে ব্যাধি বড়ই ভয়ঙ্কর ও সাংঘাতিক। সে রোগ যখন ধরা পড়ে তখন ভিষক মাত্রেই বদন সঙ্কুচিত করিয়া কর্ত্তব্যের অনুরোধে ২।৪টি ঔষধের ব্যবস্থা করেন বটে, কিন্তু মনে মনে বুঝেন যে, ব্যারাম শিবের অসাধ্য। মেনকাদেবী অচিরে ক্ষয় জ্বরে আক্রান্ত হইলেন।

রসময় মুখুয্যে যখন অবিচার করিয়া নিজ প্রথমাপত্নীকে পরিত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার যৌবন সুলভ উদ্দামভাব ছিল। ধীর ও স্থিরভাবে তখনও তিনি কার্য্য করিতে শিখেন নাই। সংসর্গদোষে তিনি প্রায়ই তাঁহার অবসর কাল কুৎসিৎ আমোদ প্রমোদে রত থাকিতেন বলিয়া এতবড় একটা জীবনের গুরুতর ঘটনা তুচ্ছ ও তাচ্ছিল্য ভাবে প্রথমে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পর দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিয়া গৃহলক্ষ্মীর অভাবটীও পূরণ করিয়াছিলেন বলিয়া মেনকা দেবীকে একেবারেই মনের অন্তরাল করিতে পারিয়াছিলেন। যদিও কখন কখন চকিৎ বিজলী আলোকের মত মেনকাদেবীর গুণরাশি তাঁহার স্মৃতিপটে আসিয়া উপস্থিত হইত, তিনি মানসিক বলে ও আত্মগরিমার প্রভাবে

তাহাকে তৎক্ষণাৎ সরাইয়া দিতেন। স্বাবলম্বনে যাহারা জগতে কৃতী হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই অল্প বিস্তর তমোভাবাপন্ন ও অহঙ্কারী হইতে দেখা যায়। রসময়ের চরিত্রে এই ভাব বেশ পরিস্ফুট ছিল। এজন্য তিনি বুঝিতেন, যে কারণেই হউক যাহা একবার করিয়া ফেলিয়াছে তাহা আর ফিরান চলে না। তাহাতে নিজেকে অমর্য্যাদা করা হয় ও নিজের অস্থির মতিত্বের পরিচয় দিয়া লোক সমক্ষে দুর্ব্বলচিত্ত ও কাপুরুষ সাজিতে হয়, এবং জন সমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। সংসার অনভিজ্ঞ রসময় বুঝিতেন না যে, ন্যায় ও সত্যের প্রভাব মানবের উপর কতটা। ন্যায় ও সত্য ভগবানেরই নামান্তর মাত্র। বলবান পাশব শক্তির বলে সকলকে দমন করিতে পারে কিন্তু ন্যায় ও সত্যকে কখনও দমন করিতে পারে না এবং এ পর্য্যন্ত কেহ পারে নাই। বল প্রয়োগে কিছুদিন চাপা থাকিলেও ন্যায় ও সত্য একদিন না একদিন আত্মপ্রকাশ করিয়া তাহাদের নিজের প্রাপ্য চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ সমেত সমস্ত আদায় করিয়া লইবেই। ক্ষুদ্র মানবের সাধ্য নহে যে, সে দাবী তখন সে অগ্রাহ্য করে। এজন্য যখন রসময়ের পরিপক্ক বুদ্ধি আসিল, যখন রক্তের তেজ কতকটা কমিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে পৈশাচিক আমোদ প্রমোদের মোহিনীশক্তির প্রভাব কমিয়া আসিল, তখন সেই অনাদৃতা মেনকাদেবীর মূর্ত্তি তাঁহার চক্ষের উপর ভাসিয়া উঠিয়া, তাঁহাকে তাঁহার কৃতকর্ম্মের নিষ্ঠুরতার বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল। সে পুণ্যতেজে উদ্ভাসিত মূর্ত্তি-খানি যেন সম্ভোগ চায় না—বিলাস চায় না—আসঙ্গলিপ্সা লইয়া

আসে না—লইয়া আসে বিচারের প্রার্থনা। সে স্থায় বিচার চায়। যে তাহার জীবনকে এমন মরুভূমি করিয়া দিয়াছে—যে তাহার সতীত্বের শুভ্র শতদলে এমন কলঙ্ককালিমা লেপিয়া দিয়াছে—যে তাহার পুত্রের মাথা এমনভাবে হেঁট করিয়া দিয়াছে, সে সেই নিষ্ঠুরতর বিচার চায়! সে দেবতার কাছে বিচার চায় না—ভগবানের কাছে বিচার প্রার্থনা করে না—সে বিচার প্রার্থনা করে তাহার স্বামীর কাছে—যে তাহার অবস্থা এরূপ করিয়াছে—যে সতীসাধ্বীকে অকারণে নিজের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া চির নির্ব্বাসিত করিয়াছে, তাহারই নিকটে সে বিচার চায়।

সুসময়ের প্রাণে অনুতাপ আসিল—এতদিন আতসবাজীর মত যতই বেগে ফুল কাটিতে কাটিতে তিনি উর্দ্ধদিকে উঠিতেছিলেন ততই বেগে পুড়িতেছিলেন। সে পোড়ার দাহন এতদিন অনুভব করিতে পারেন নাই—এতদিন পরে সে দাহনের যন্ত্রণা বেশ বুঝিতে পারিলেন। তাহার উপর মেনকাদেবীর মূর্ত্তি খানি যখন শয়নে স্বপনে জাগরণে দেখিতে লাগিলেন—যখন দেখিতে লাগিলেন সে মূর্ত্তি বিচারের প্রত্যাশায় যখন তখন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া অঙ্গুলিসঙ্কেতে বলে 'প্রভু—স্বামী দেবতা—তুমিই এর বিচার কর—তুমিই এর বিচার কর'—তখন সুসময়ের দাহন দ্বিগুণ হইল। তিনি কি বিচার করিবেন? তিনি যে অপরাধে অপরাধী সে অপরাধের বিচার ত পার্থিব বিচারালয়ে হয় না—সে বিচার স্বর্গ থেকে নেমে আসে। বাস্তবিক তাহাই

হইল—স্বর্গ থেকে দেবতার কাছে হইতেই সে বিচার নামিয়া আসিল, রসময়ের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল—বহুমূত্র রোগ আসিয়া দেখা দিল।

"বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা" হইলে যাহা হয়—এ ক্ষেত্রে তাহার কোনরূপ ব্যতিক্রম হইল না। দ্বিতীয়া স্ত্রীর আদেশ ও অনুরোধ মত একখানি উইল প্রস্তুত করিয়া রসময় পশ্চিমে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্ত যাত্রা করিলেন। পুত্র ক্ষিতীশের "মরসুম" পড়িল, এ যে তাহার "শাপে বর"।—উইলের স্থূলমর্ম্ম এই যে, রসময়ের অবর্ত্তমানে সমস্ত বিষয় ক্ষিতীশ পাইবে এবং প্রথমাপত্নীর গর্ভের সন্তান রবীন্দ্রনাথ ভাল লেখা পড়া শিখিতেছে, এই কারণে তাঁহার পুস্তকাগারের যাবতীয় পুস্তক রবীন্দ্র পাইবে। এই উইলের পর সৌদামিনী ও ক্ষিতীশচন্দ্র এই অশান্তিময় সংসারে কতকটা শান্তি পাইলেন। পাইবারই ত কথা—বিষয়টা ত কম নহে। ভগ্নস্বাস্থ্য বুড়ো রসময়ের কখন কি হয় তা'ত বলাও যায় না। তার উপর মস্ত কুলকাঁটা রবীন্দ্র এখনও জীবিত—কোথাকার জল কোথায় মরে, তা কে জানে—কি বলেন, পাঠক?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রসময় বাবু প্রবাস যাওয়াতে ক্ষিতিশচন্দ্রের প্রতাপ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। দলে দলে বন্ধু বান্ধব আসিয়া তাহার সহিত মিলিতে লাগিল। ক্ষিতীশচন্দ্র প্রত্যহ সন্ধ্যার পর সদলে কলিকাতার বাটী হইতে বাহির হইয়া পৈশাচিক আমোদ প্রমোদে মত্ত হইত। কোন দিন বা রাত্রি প্রায় প্রভাত করিয়া বাড়ী ফিরিতে লাগিল। কোন দিন প্রকাশ্য রাজপথে নিজের ফিটন্ চড়িয়া, কোন দিন বা মোটরে চড়িয়া সুন্দরী যুবতী বারনারী সহ গড়ের মাঠে, রেড্ রোডে, থিয়েটারে ও বায়স্কোপে যাইতে লাগিল। প্রথম প্রথম তাঁহার জননীর নিকট ভিন্ন ভিন্ন ছুতা দেখাইয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিল। এখন সে একজন কলিকাতার নামজাদা "কাপ্তেন বাবু" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদি তাহার মাতা আবশ্যকীয় অর্থ যোগাইতে অসম্মতা হইতেন তাহা হইলে সে উত্তমর্ণদিগের নিকট হইতে অধিক সুদে হাণ্ডনোট লিখিয়া কর্জ্জ করিত। কলিকাতা মহানগরীর মহিমা বিস্তর। এখানে এক শ্রেণীর জীব আছেন যাঁহারা "কাপ্তেন ধরা" কাজ করেন। অর্থাৎ খুব বিষয়ী লোকের স্বল্প বয়স্ক পুত্রদের "বখামী", করিবার অর্থের অভাব পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহারা বিশেষ দয়াবান হইয়া হাজার টাকার হাণ্ডনোট লিখিয়া লইয়া, কখন ৫০০৲ কখন বা গরজ

বুঝিয়া ২৫০৲ টাকা দিয়া অকালপক্ক যুবকদের মস্তক চর্ব্বনের সুব্যবস্থা করেন ও অধঃপতনের পথটা বেশ প্রশস্ত করিয়া দেন। আর যদি সেই যুবক তাহার পিতার একমাত্র উত্তরাধিকারী হয় তবে এই ব্যবসায়ীদের "মরসুম" পড়িয়া যায়। তাঁহারা দলে দলে আসিয়া সেই যুবকদের তোষামোদী জুড়িয়া দিয়া বিশেষ আত্মীয়তা করেন। কেহ বা এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল যুবকের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া,—'দাদাবাবু'—'ভাইয়া' 'দোস্ত' প্রভৃতি প্রিয় সম্বোধনে সন্তুষ্ট করিয়া উপরোক্ত প্রণালীতে অর্থাগমের সুব্যবস্থা করিয়া লন। ইহাতে ঐরূপ "বকধার্ম্মিকদের" দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ হয় না। বরং নিভৃতে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে তাহারা বলেন যে, এটা তাহাদের একটা ব্যবসার অঙ্গ। বলিহারি ব্যবসা! বলিহারি অর্থের লালসা! উপস্থিত এই প্রকৃতির লোকেরাই ক্ষিতীশের বন্ধু।

রসময় উইল সম্পাদন করিয়াছেন ও ক্ষিতীশচন্দ্র যে তাঁহার অতুল বিষয়ের ভাবী উত্তরাধিকারী হইয়াছে একথা ক্ষিতীশের বন্ধু মহলে ও বারাঙ্গনা মহলে সত্বরই প্রচারিত হইয়া গেল। ক্ষিতীশচন্দ্রের এই সব মহলে আজ খাতির কি? তিনি তাঁহার কোন প্রকার মনোগতভাব প্রকাশ করিতে না করিতে এইসব সুহৃৎগণ তৎক্ষণাৎ তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে লাগিল। এক কথায়—ক্ষিতীশচন্দ্র এখন একজন পুরাদস্তুর 'কাপ্তেন বাবু' হইয়া দাঁড়াইল।

একদিন বিশেষ টাকার অনাটন হওয়ায় ও দুই একজন উত্তমর্ণের টাকার তাগাদায় উৎপীড়িত হওয়ায় ক্ষিতীশচন্দ্র

সান্ধ্যভ্রমণে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে পিতার কর্ম্মচারী কালীবাবুকে তলব করিলেন। কালিবাবু আসিয়া হাজির হইলে তাহাকে নিকটে পাইয়া ক্ষিতীশচন্দ্র বিশেষ আনন্দিত হইল। তিনি হর্ষোৎফুল্ল হইয়া কহিলেন—

কালিবাবু! একটা বিশেষ কাজে আপনাকে ডেকেছি।

কা—বলুন আপনার কি কাজ।

ক্ষি—এতদিন ত কাজ কচ্ছেন—বাবা কত বেতন দেন?

কা—আজ্ঞে ৪০৲ টাকা মাসে।

ক্ষি—মোটে ৪০৲ টাকা? ওত এক দিনের মোটার খরচ। ওতে আর কি হবে।

কা—আজ্ঞে ঐতেই ত এতদিন সংসার চালিয়ে আসছি। এখন ত আমার গঙ্গামুখো পা হয়েছে। ঐতেই যদি বাকি ক'টা দিন কেটে যায় তবে আর অন্য আশা রাখি না।

ক্ষি—না, না, আশা রাখবেন বই কি? আশা রাখবেন না কেন? টাকার কত দরকার।

কা—আজ্ঞে, টাকার দরকার নাই কার? তা দিচ্ছে কে বলুন?

ক্ষি—টাকা নেবেন?

কা—সৎপথের অর্জ্জন হ'লে নিতে আপত্তি নাই?

ক্ষি—আমি আপনাকে টাকা দিব—নেবেন?

কা—কি রকম বলুন। সব শুনে তবে বলতে পারি।

ক্ষি—আপনি জানেন—বাবার সাংঘাতিক পীড়া উপস্থিত; তিনি আর বেশীদিন বাঁচবেন না!

পিতার সম্বন্ধে এই ভাবের কথার অবতারণা শুনিয়া প্রভুভক্ত কালীচরণ কতকটা স্তম্ভিত হইয়া গেল। কোন উত্তর না করিয়া স্থিরভাবে সব শুনিতে লাগিল।

ক্ষিতীশ পুনরায় বলিতে লাগিল—"তিনি একখানি উইল করেছেন, জানেন ত?"

কা—আজ্ঞে জানি বই কি।

ক্ষি—আমিই তাঁর সমস্ত বিষয়ের মালিক। তাঁর প্রথম পক্ষের ছেলে কিছুই পাবে না। উইলের এই মর্ম্ম, তাত জানেন?

কা—আজ্ঞে এই রকমই ত শুনেছি।

ক্ষি—যে বিষয় দুদিন পরে আমি পাব; সেই বিষয়ের কতক অংশ আপনি আমায় আমার ইচ্ছামত এখন দিয়ে সাহায্য করুন। আর আমিও আপনার মাহিনার উপর যাতে কিছু উপরি হয় তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

এই কথাগুলি শুনিয়া ধর্ম্মপরায়ণ প্রভুভক্ত কালীচরণ আন্তরিক কষ্ট পাইল। ক্ষণেক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

ক্ষিতীশের পক্ষে এরূপ চিন্তা অসহ্য বোধ হইল। কাজেই একটু উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল—আপনার মত কি কালী বাবু?"

কা—আজ্ঞে, আপনার কথাগুলি আমি ভাল বুঝতে পারছি না।

সহজ ও সরল উত্তর না পাইয়া ক্ষিতীশচন্দ্র একটু বিরক্ত হইয়া উত্তর দিল—"তুমি এই সোজা কথাটী বুঝতে পারলে না? তুমি কি ক্যাসিয়ারী কর হে?"

কা—আজ্ঞে, বৃদ্ধ হয়েছি; সব সময়ে সব কথা ভাল বুঝতে পারি না। ওটা বাবু বয়সের দোষ। আপনাদের মত স্কুল ও কলেজে পড়া বুদ্ধি কোথা পাব?

ক্ষিতীশচন্দ্র এই বিদ্রূপের ভাবার্থ গ্রহণ করিতে পারিল না। তাই আবার বলিল—"সোজা কথা এই যে—আমি কতকগুলা ধার করে খরচ করেছি। সেইগুলি তুমি লুকিয়ে আমায় দিয়ে দাও। আর বাবা যে কয় দিন বেঁচে আছেন সেই কয়দিন আমার যা দরকার তা আমায় দিতে থাক। এতে অবশ্য তোমার লাভ ভিন্ন লোকসান নাই, আমি তাই থেকে তোমাকে সিকি বখরা দিব। তুমি হিসাবের খাতায় আমার নামে কোন খরচ দেখাবে না। তবে তোমার আমার মধ্যে একটা হিসাব রাখবার জন্ম একটা গুপ্ত খাতা থাকবে, যে দিন যেমন টাকা ল'ব তাতে সঠিক লিখে দেবো। তারপর আমার সুদিন উপস্থিত হ'লে আমি যখন বিষয় বুঝে ল'ব তখন ঐ টাকা গুলি বাদ দিয়ে তহবিলের হিসাব বুঝিয়ে দিবে। ব্যস্! সব মিটে যাবে। এখন যদি বাবা কিছু জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে কোন কথা জানাবে না—এই কথা আর কি; এখন বুঝলে?"

কালীচরণ প্রভুপুত্রের শিক্ষাদীক্ষায় মনে মনে শত ধিক্কার দিতে লাগিল; এবং তাহার পরিণাম ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিল। উপস্থিত মনোগত ভাব গোপন করিয়া কালীচরণ মৃদু ও বিনীত-ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—

আপনার কত টাকা কর্জ্জ হয়েছে ও উপস্থিত কত টাকা চাই জানতে পারি কি?"

একটু সাহস পাইয়া ক্ষিতীশ বলিল—

তুমি জানতে পারবে না? তাহলে কাজ হবে কি করে? তোমায় আমায় এক প্রাণ হয়ে চলতে হবে। দেখ, আমি কাবু-লিওয়ালার কাছে ২০০০৲ টাকা ধার নিয়ে ৫০০০৲ টাকার হ্যাণ্ড নোট লিখে দিয়েছি। এখন বেটা সেই টাকার ডিক্রী করেছে। কাজেই টাকাটার বিশেষ দরকার; না হ'লে আমাকে বিশেষ অপমানিত হ'তে হবে। বাবা যাতে না জানতে পারেন এমন ভাবে যদি কাজ হাসিল্ করতে পার তাহলে আমি তোমার কাছে চিরঋণী হয়ে থাকবো; আর এখনি তোমাকে ১০০০৲ টাকা দিয়া দিব। এছাড়া আমি ২।১ জন মাড়োয়ারী বন্ধুদের দোকান থেকে শাল বেনারসী প্রায় আড়াই হাজার তিনহাজার টাকার ধারে কিনেছি।

কা—বলেন কি? এতটাকা এর মধ্যে ঋণ করেছেন?

ক্ষি—হাঁ কালী বাবু! যা ক'রে ফেলেছি তার ত আর চারা নাই। তুমি আমার উপস্থিত বাঁচাও। পরে দেখবে এর কৃতজ্ঞতা কেমন ক'রে দেখাই। বাবার অবর্ত্তমানে তোমাকে

আর খেটে খেতে হবে না। এখন বল, আমার কথা রাখবে কি না?

কা—আজ্ঞে বাবু! দোহাই আপনার—মতিগতি ফিরান। ঐ যত সব বদ সঙ্গ গুলি ছেড়ে দিন। এ রকম করলে বিষয় কতদিন থাকবে?

ক্ষি—আচ্ছা তুমি ভবিষ্যতে যা বলবে তাই করবো! উপস্থিত আমায় বাঁচাও।"

কা—আচ্ছা বাবু, কার টাকা কাকে দিতে ব'লেন? আপনি ন্যায় সঙ্গত যা বলবেন এ অধম তা তৎক্ষণাৎ রক্ষা করবে। আপনার অভাব ব'লে আমাকে অধর্ম্ম করতে উপদেশ দিবেন না। উৎকোচ দিয়া পাপে লিপ্ত করাবেন না!

ক্ষি—তুমি কি বলছ? অধর্ম্মটা কিসে হবে শুনি?

নির্ভীক চিত্তে কালীচরণ উত্তর করল—"সহস্রবার অধর্ম্ম। যাঁর টাকার চৌকিদারী করছি তাঁর বিনা অনুমতিতে আমি এক পয়সা কাহাকেও দিতে পারি না।

দিতে পার না?

আজ্ঞে না হুজুর তা পারি না।

কুপিত হইয়া ক্ষিতীশচন্দ্র উত্তর করিল—

এতই তেজ তোমার? তুমি অম্লান বদনে বললে—দিতে পার না? কার সঙ্গে কথা কচ্ছ তা জান? কার টাকা জান? দুদিন পরে কে এর মালিক হবে তা জান?

কা—আজ্ঞে জানি বৈকি। আমি আপনাদের দাসানুদাস।

আমি প্রভু পুত্রকে তেজ দেখাতে আসি নাই। যতদিন রসময় বাবু জীবিত, ততদিন টাকা তাঁর। আমি তাঁর কোষাধ্যক্ষ—নিমকের চাকর মাত্র। কি করবো বলুন, গরিবের ছেলে গতর খাটিয়ে দু' পয়সা রোজগার করতে শিখেছি বটে, কিন্তু চুরি করতে শিখিনি।

চরিত্রহীন হইলেও কথাগুলি ক্ষিতীশের হৃদয়ে বিঁধিল।

ক্ষি—তাহলে তুমি আমার কোন উপকার করতে পার না?

কা—আজ্ঞে, যদি প্রভুপুত্র সন্তুষ্ট হন তবে আমার বেতনের ৪০৲ টাকা আপনার প্রীত্যর্থে দিতে পারি। যখন আপনি বিষয়ের মালিক হবেন তখন আমার টাকার যেরূপ সুব্যবস্থা মনে করেন তাই করবেন—আর তখন যেমন আদেশ করবেন সেই মত কাজ করবো, অবশ্য বেঁচে থেকে চাকরি করার দুরদৃষ্ট তখনও যদি থাকে।

বিশেষ রুষ্ট হইয়া ক্ষিতীশচন্দ্র উত্তর করিল—চল্লিশ টাকা দেখাতে এসেছ? ৪০৲ টাকা আমার একদিনের পান সিগারেটের খরচ। ছোট মুখে বড় কথা?"

এরূপ বিকৃত মস্তিষ্ক হতভাগ্যের সহিত বৃদ্ধ কালীচরণ অধিক বাক্‌বিতণ্ডা করা যুক্তি সঙ্গত বলিয়া মনে না করিয়া বলিল—

তবে আদেশ হয় ত এখন বিদায় হই?

অধিক কুপিত হইয়া ক্ষিতীশচন্দ্র উত্তর করিল—

তুমি দূর হও। কিন্তু মনে থাকে যেন—বেশীদিন নয়—অতি শীঘ্রই আমার হাতে তোমাকে পড়তে হবে।

একটু মৃদু হাঁসিয়া কালীচরণ উত্তর করিল—"আশীর্ব্বাদ করুন—ধর্ম্মে যেন মতি থাকে। ধর্ম্মপথে থাকলে অর্দ্ধেক রাত্রেও অন্নমিলে। মানুষ মানুষের কি ক্ষতি করতে পারে? যাক্—অপরাধ করে থাকি ভবিষ্যতে উপযুক্ত সময়ে দণ্ড দিবেন। উপস্থিত আজ বিদায় হই!"—এই বলিয়া কালীচরণ প্রণাম করিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিল। সামান্য একটা চাকরের নিকট এইরূপ উত্তর শুনিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র মনে মনে বিশেষ কুপিত হইল। অধরে দন্ত চাপিয়া বলিতে লাগিল:—

"আচ্ছা, থাক তুমি! তোমার ভণ্ডামী আমি ভাঙবো। হারামজাদা—চোর!"

অধিক কিছু না করিতে পারিয়া রোষে ক্ষোভে সদর্প পদাঘাতে মেদিনী কাঁপাইয়া ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়মিত নৈশ বিহারে বাহির হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রসময় ভারতবর্ষের নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। নিজের ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার মানসে প্রথমে পুরীধাম তাহার পর ওয়ালটিয়ার, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে দিনকতক করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাহাতে রোগের বিশেষ প্রতীকার হইল না বটে; কিন্তু কতকটা প্রশমিত হইল। এক্ষণে তিনি দেহের ব্যাধি অপেক্ষা মনের ব্যাধি অধিক অনুভব করিতে লাগিলেন। প্রায়ই সন্ধ্যার সময় একাকী সমুদ্র তটে বসিয়া দিগন্তপ্রসারী নীলাম্বুরাশির তরঙ্গমালা বিস্মিত নেত্রে নিরীক্ষণ করিতেন; আর মনে মনে ভাবিতেন, "ভগবান তুমি আছ—তুমি আছ—সত্যই তুমি আছ।" যতই এ কথা ভাবিতেন, ততই ভক্তি ও শ্রদ্ধায় তাঁহার মাথা আপনি অবনত হইয়া পড়িত।

বিষয়-বিভবের মায়ায় মোহান্ধ হইয়া মানব যে তাঁহার কথা একবারও ভাবেন না একথা তিনি এখন বেশ বুঝিতে পারিলেন। কে যেন তাঁহাকে বলিতে লাগিল—যে সর্ব্বশক্তিমান ভগবান এই ব্রহ্মাণ্ডের রচয়িতা তিনি ন্যায় ও ধর্ম্মের অবতার। এই জগতেই মানব জীবনের শেষ হয় না, পরজন্ম আছে। ইহ জন্মের কর্ম্ম ফল সঙ্গে লইয়া মানবকে শ্মশানের পরপারে আবার জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয়। কর্ম্মকাণ্ডশূন্য বিষয়-বিভব-বিমুগ্ধ বিলাসী রসময়

আজ বাস্তবিক ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। মেনকার প্রতি যে ঘোরতর অবিচার করিয়াছেন সে অবিচারের জন্য একদিন যে একজনকে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে, একথা আপনা হইতেই তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণে অনুতাপানল দ্বিগুণ বেগে জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। জীবন প্রহেলিকা কে বুঝাইবে? মানব কোথা হইতে আসে—কোথায় যায়—আত্মার গতি কি হয়? এই-রূপ নানা প্রশ্ন তাঁহার মনের মধ্যে আপনিই উঠিতে লাগিল; ক্রমে সংসারের বস্তুতে তিনি আস্থা হারাইতে লাগিলেন। যতই দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, ততই এই সংসারের অতি প্রিয় ও ভোগের সামগ্রী গুলি বিষময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। শুধু ঐহিক সুখের কামনায় তিনি এতবড় সাধের জীবনটা বৃথা নষ্ট করিয়াছেন এই ভাবিতে ভাবিতে অনেক সময়ে তাঁহার আত্মগ্লানি উপস্থিত হইত।

এই অনুতপ্ত প্রাণ লইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তিনি হরিদ্বারে যান। সেখান হইতে ৺কাশীধামে গিয়া দিনকতক বাস করেন। সেই সময় ৺কাশীধামে মণিকর্ণিকায় ঘাটের উপরই পরিব্রাজক সদানন্দ স্বামী থাকিতেন। সদানন্দ স্বামী একজন প্রকৃত সাধু। তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি দেখিলে ও তাহার সুমধুর কণ্ঠনিঃসৃত সুললিত ধর্ম্মকথা শুনিলে পাষাণেরও প্রাণ ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। রসময় এখন বন্ধুবান্ধব ও বিষয়িলোকের সংসর্গ বর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সংসর্গ রসময় বাবুর আর ভাল লাগে না।

তিনি স্বামীজির কথা শুনিবার জন্য প্রায়ই প্রত্যহ সন্ধ্যার পর তাঁহারই নিকটে আসিয়া বসিতেন ও ভাগীরথীতটে তাঁহার মুখনিঃসৃত মধুর ধর্ম্ম কথা শুনিয়া প্রাণে প্রকৃত আনন্দ পাইতেন। স্বামিজীকে বেষ্টন করিয়া প্রত্যহ শত শত নরনারী ধর্ম্ম উপদেশ ও দুরূহ শাস্ত্রগ্রন্থের মর্ম্ম ও ব্যাখ্যা শুনিতেন। অল্পদিন আলাপের পরই স্বামীজি রসময়কে যেন একটু বিশেষ যত্নের সহিত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এইভাবে প্রায় ৩।৪ মাস কাটিয়া গেল। মানসিক অবস্থা যেন একটু ভাল বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল।

একদিন রাত্রি প্রায় ১০ টা বাজিয়াছে। শারদাকাশে পূর্ণ শশধর উদিত হইয়া সমস্ত জগতটীকে স্নিগ্ধ রজত-কিরণে ভাসাইয়া দিতেছে। স্বামীজির সন্ধ্যাকালীন বক্তৃতা শেষ হইয়া গিয়াছে—শ্রোতাগণ প্রায় সকলেই নিজ গৃহাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে—শুধু রসময়, স্বামীজি ও তাঁহার দুই একজন প্রিয়শিষ্য ইঁহারা মণিকর্ণিকার ঘাটে বসিয়া ২।৪টি কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময় একটি যুবক অশ্রু মুছিতে মুছিতে আসিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক স্বামীজিকে বলিলেন—

"মহাশয়! বুঝি সময় উপস্থিত। শেষ কাজটুকু করাইয়া দিন। দয়াবান আপনি, আপনি যা করেছেন তা বোধ হয় পরের জন্য এজগতে কেউ করে না, করতেও পারে না।"

প্রশান্ত মূর্ত্তিধারণ পূর্ব্বক নিরুদ্বেগে স্বামীজি বলিলেন—"বালক তুমি! মায়ের জন্য পুত্র করবে না ত কে করবে ভাই? এ যে পুত্রেরই কায, চল সাধ্বীর শেষ কার্য্যটুকু আমরা

ভুইপুত্রে সমাধা করিগে।” বলিয়া রসময়কে বিশেষ করিয়া একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া স্বামীজি যুবকের সহিত চলিয়া গেলেন।

অনতিবিলম্বে হরিধ্বনি করিতে করিতে স্বামীজি ও যুবক একটি প্রৌঢ়া রমণীকে খাটে করিয়া মণিকর্ণিকার ঘাটে আনিয়া নামাইলেন। রমণী রোগে ও শোকে অতিশয় শীর্ণা হইয়া গিয়াছেন। মৃত্যু শিয়রে দাঁড়াইয়াছে; তবুও যেন বদন হইতে পবিত্র মাধুরী ঝরিতেছে। ক্ষীণ দৃষ্টি এখনও তেজোব্যঞ্জক। অন্তিম সময়ের কান্তি দেখিলে বোধ হয় যেন একদিন তিনি সৌন্দর্য্যের চরম সীমায় উঠিয়াছিলেন। রমণী সধবা। স্বামীজি তাঁহাকে লাল পেড়ে সাড়ী পরাইয়া—কপাল হইতে সীমন্ত পর্য্যন্ত সমস্তটাই সিন্দূর লেপিয়া দিয়াছেন, দুইপদ অলক্তের রাগে রঞ্জিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে তাঁহারই কতকগুলি শিষ্য খোল, মৃদঙ্গ ও করতালি লইয়া হরি সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে ঐ স্থানটি জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল। রমণীর এখনও নাড়িশ্বাস আরম্ভ হয় নাই—হইতেও বড় বিলম্ব নাই। তাঁহার জ্ঞান তখনও সম্পূর্ণ রহিয়াছে। তিনি সর্ব্বপাপ বিনাশিনী—সদ্যঃ পাতক সংহন্ত্রী জাহ্নবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দুই হস্ত কপালে ঠেকাইলেন, তাহার পর চক্ষুর্দ্বয় মুদিত করিলেন। সতীদর্শনে উৎফুল্ল হইয়া ভাগীরথী কুলকুল করিয়া সাগরাভিমুখে ছুটিয়াছে। আকাশ হইতে পূর্ণশশধর স্নিগ্ধ কিরণ ঢালিয়া মুমূর্ষুর পবিত্র দেহ মণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। সংকীর্ত্তনের

সহিত উচ্চ হরিধ্বনি চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়াছে। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!

স্বামীজি এই ভাবে রমণীকে ভাগীরথীতটে রাখিয়া রসময়কে ডাক দিলেন। রসময় তখন রমণীর জীবন এই সংসার পরিত্যাগ করিয়া কোন অজানা অচেনা রাজ্যে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে দেখিয়া ঘোর চিন্তায় মগ্ন হইয়াছিলেন। স্বামীজির আহ্বান শুনিয়া তিনি রমণীর নিকটে আসিলেন। আসিবামাত্র স্বামীজি রসময়ের হস্ত বজ্রমুষ্টিতে ধারণ পূর্ব্বক গম্ভীর স্বরে বলিলেন—

—"রসময়! দাম্ভিক রসময়! চিনেছ কি এ রমণী কে? চিনেছ কি? বিনা দোষে কার অত্যাচারে—কার হতাদরে অকালে এই রমণীর এই দশা উপস্থিত হয়েছে?"

রসময় প্রথমে কিছু বুঝিতে পারিলেন না। কতকটা হতবুদ্ধি হইয়া রমণীর প্রতি নীরবে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখ হইতে একটিও বাক্য সরিল না। স্বামীজি তখন রমণীকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিলেন—

মা—মা! তোমার সন্তানের কথা মিথ্যা হয় নাই। এই অন্তিম সময়ে এই জাহ্নবী কুলে তোমার শিয়রে তোমার স্বামী দণ্ডায়মান। সতীর আকাঙ্ক্ষা কখনও অপূর্ণ থাকে না মা।

রমণী চক্ষুরুন্মীলন করিয়া একবার স্বামী রসময়কে দেখিলেন। তাঁহার গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। তাঁহার হৃদয়ের যাতনা যেন ক্ষণকালের জন্য প্রশমিত হইয়া গেল। মুখমণ্ডলের

মলিন ভাব দূর হইয়া গেল। মৃদু অথচ স্পষ্টস্বরে রমণী উত্তর করিলেন—

—"এসেছ? অন্তিম সময়ে দেখা দিয়েছ? যথেষ্ট করুণা তোমার! স্বামি! প্রভু! না জানি পূর্ব্বজন্মে কত পাপ করে-ছিলাম, তাই এ জীবনে বিনা অপরাধে স্বামীর সেবা করতে পারলাম না। বল প্রভু! বল—দাসীর অপরাধ ভুলে গেছ—বল—এই শেষ—একবার বল। যদি চরণে কোন অপরাধ করে থাকি সেটী নিজগুণে মার্জ্জনা ক'রে অভাগীরে একবার আশীর্ব্বাদ কর। জনমের মত এ সংসার ছেড়ে চলে যাচ্ছি—একবার চরণ ধূলি দাও।"

রসময়ের আর বুঝিতে বাকি রহিল না। বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিলেন।

—"মেনকা! মেনকা! স্বর্গের দেবী! আমি কি করেছি! না বুঝে ঘোর মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হ'য়ে, শুদ্ধ একটা সন্দেহের বশবর্ত্তী হ'য়ে সাধ্বীর প্রাণে পদাঘাত করেছি। আমায় ক্ষমা কর সতি!"

র—কই একবার মাথায় পা দুখানি দাও। আমায় আশীর্ব্বাদ কর।

তারপর স্বামীজির ইচ্ছা অনুসারে রসময় নিজ ক্রোড়ে মেনকা দেবীর মস্তকটি রাখিয়া তাহাতে হাত দিয়া সাধ্বীর শীর্ণ বিবর্ণ শুভ্র জ্যোৎস্নামণ্ডিত মুখখানি দেখিতে লাগিলেন, ও তিনি অজস্রধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন—

—"মেনকা! সতি! মহা পাপী আমি—দুর্বৃত্ত দানব আমি—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমি অনুতাপানলে দগ্ধ হচ্ছি। ইচ্ছা ছিল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব কিন্তু তুমি সে প্রায়শ্চিত্তেরও সময় দিলে না। মহিমময়ী তুমি! তুমি স্বর্গে চল্লে নরক ভোগ করতে আমাকে ফেলে রেখে গেলে।"

এইবার রমণী স্বামীজির প্রতি পুলকদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—

"বাবা! ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। তোমার দয়ায় আমার অন্তিম সাধ পূর্ণ হলো। অন্য কামনা আর কিছু নাই।" তাহার পর আর একবার স্বামীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন—

"আমি বড় সুখে আজ মরছি। তবে তোমার কাছে আমার একটী অনুরোধ। জীবনে আমার কোন সাধই পূর্ণ কর নাই। এই শেষ অনুরোধ—আমার রবি রহিল—একে দেখো। এ আমার হিয়াঙ্গের শেষ রক্ত বিন্দু। আমার বড় সাধের রবিকে ভাসিও না। আমি একে তোমারই হাতে সপে দিয়ে গেলাম। আমিই তোমার কাছে না হয় অপরাধ করেছি? আমাকেই না হয় দোষী সাব্যস্ত করেছ—কিন্তু এত কোন দোষ করে নি। এত তোমারি সন্তান। তার এ জগতে আপনার বলতে আর কেউ রইল না। তুমি একে দেখো।"

এই বলিয়া সাধ্বী স্বামীর পদধূলি শিরে লইলেন, ক্রমে তাঁহার বাক্‌শক্তি বন্ধ হইয়া আসিল। আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

রবীন্দ্র মাতার অন্তিম কাল সন্নিকট বুঝিতে পারিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—

"মা! আমায় ফেলে চললে? কার কাছে দিয়ে যাচ্ছ মা? জগতে আমার কে রহিল? মা! মা আর কথা কইবে না। এই বলিয়া রবীন্দ্র মাতার চরণ ছুটী শিরে লইলেন।

মেনকা দেবী কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। শুধু তাঁহার নয়ন প্রান্তে ছুই এক বিন্দু অশ্রুকণা দেখা দিল। নাভিশ্বাস আরম্ভ হইল। রবীন্দ্র মাতার মুখে গঙ্গাজল দিল। অতি অল্পক্ষণ মধ্যে সংকীর্ত্তন ও হরি গুণগান শুনিতে শুনিতে স্বামীর ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া মেনকাদেবী ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্র মাতার অন্তেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিলেন। চিতা নিভিল। কিন্তু রসময়ের হৃদয়ে যে আগুন এতদিন ধীকি ধীকি জ্বলিতেছিল মেনকার শেষ সাক্ষাৎ তাহাতে ইন্ধন প্রদান পূর্ব্বক ঘোর দাবানলে পরিণত করিল। চিতার আগুনের সহিত রসময়ের হৃদয়ের আগুন নিভিল কই? মেনকাদেবীর অস্তিত্ব ইহলোক হইতে লোপ পাইল বটে কিন্তু তাঁহার প্রতি দুর্ব্ব্যহারের কোনরূপ যখন প্রতিকারের উপায় রহিল না তখন রসময়ের হৃদয়ের আগুন ধূ ধূ জ্বলিতে লাগিল। রসময় যন্ত্রণায় ছট ফট করিয়া উন্মত্তের ন্যায় হইয়া গেলেন। কি করিবেন—কি করিলে শান্তি পাইবেন—কি প্রায়শ্চিত্ত করিলে এ পাপের খণ্ডন হইবে এই চিন্তায় তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন। দেহের অসুস্থতা হেতু একটা অশান্তি—তাহার উপর হৃদয়ের জ্বালা লইয়া একটা ঘোর অশান্তি। তাঁহার জীবনটা বড় অশান্তিময় হইয়া উঠিল। তাহার উপর পুণ্যতোয়া জাহ্নবীকূলে যখনই আসিয়া বসিত তখনই সাধ্বী মেনকা দেবীর শেষ কথাগুলি মনে পড়িত —"আমার রবীকে দেখো। তোমারই হাতে তাকে সঁপে দিয়ে গেলাম, সেত তোমারি।" কখন কখন মনে হইত অন্তরীক্ষে তাঁহার অশরীরি আত্মা যেন বলিতেছে—'বিনা দোষে আমাকে না হয় দোষী সাব্যস্থ করেছ? এত কোন দোষের দোষী নয়।" শ্মশানের দমকা হাওয়া হু হু শব্দে ছুটিয়া আসিয়া যেন

তাহার কাণে কাণে বলিত—"এ জগতে তাহার আপনার বলতে কেউ রইল না। আমার মত তার যেন দুর্দ্দশা ক'রো না—তার জন্তে আমি মরেও সুখ পাচ্ছি না—শ্মশানে শ্মশানে হাওয়ার সঙ্গে হা হা করে ঘুরে বেড়াচ্ছি?" সেই হা হা শব্দ গাছের উপর দিয়ে—গঙ্গার উপর দিয়া আকাশে কোথায় মিশিয়া যাইত। সঙ্গে সঙ্গে রসময় বাহ্য জ্ঞানশূন্ত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেন—'সাধ্বী ক্ষমা কর—যা করেছি সে অপরাধের দণ্ড পাচ্ছি। আর অপরাধ করবো না। তোমার জীবনে বড় কষ্ট দিয়েছি। প্রায়শ্চিত্তের অবসর না দিয়ে তুমি চলে গেলে। এখন তোমার প্রেতাত্মার যাতে প্রীতি হয় তাই করবো।"

স্বামীজি রসময়কে আশ্বস্ত করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই ঘটনার পর হইতে স্বামীজি নিরন্তর রসময়ের সহিত থাকিয়া ধর্ম্ম ও শাস্ত্র কথা কহিয়া তাঁহার অনুতপ্ত প্রাণে শান্তি বারি ঢালিতে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যাহার প্রাণে চিন্তার আগুন জ্বলিতেছে তাহার শান্তি কোথায়? তবুও রসময় স্বামীজির সহবাসে আরও মাস খানেক রহিলেন বটে কিন্তু তাঁহার দেহ একেবারে ভগ্ন হইয়া গেল। তাঁহার ব্যারামের বৃদ্ধি হইল। অবস্থা দিন দিন অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল।

রসময়ের সাহায্যে রবীন্দ্র কাশিধামেই মাতার শ্রাদ্ধাদি প্রেতকার্য্য অতি জাকজমকের সহিত সম্পন্ন করিলেন। রবীন্দ্রকে রসময় দিনকতক তাঁহার সঙ্গে থাকিতে বলিলেন। স্বামীজিও

সেইরূপ আদেশ হইল। কাজেই রবীন্দ্রকে তাঁহাদের সহিত আরও কিছুদিন কাশীতে থাকিতে হইল।

এদিকে রসময়ের সহিত মেনকা দেবীর শেষ সাক্ষাতের পর যাহা ঘটিয়াছিল সে বিষয় সৌদামিনী দেবী তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর অঘোর দাসের পত্রে অবগত হইয়া বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। বলা বাহুল্য সৌদামিনী ও তাঁহার পুত্র ক্ষিতীশচন্দ্র রসময়ের সহিত আসেন নাই। সৌদামিনী দেবীর না আসার কারণ এই যে, ইদানীং সৌদামিনী দেবীর প্রতি রসময়ের ততটা অনুরাগ ছিল না; বরং তাঁহাকে দেখিলে তিনি কতকটা বিরক্ত হইতেন। তাহার উপর ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জলবায়ুর উপকারিতা দেখিবার মানসে তিনি স্থায়ীভাবে কোন স্থানে থাকিবার সঙ্কল্প না করায় স্ত্রীকে সঙ্গে লন নাই, উদ্দেশ্য ছিল যে,—যে স্থানটি তাঁহার পক্ষে উপকারী বলিয়া বোধ হইবে সেই স্থানে নিজ পরিবারবর্গকে আনাইয়া দীর্ঘ অবসর কাটাইবেন। কিন্তু এতাবৎ যে যে স্থানে তিনি গিয়াছিলেন তাহার মধ্যে কোনটাই তাঁহার মনোমত না হওয়ায় স্ত্রীকে আনিবার ব্যবস্থা করেন নাই। আর ক্ষিতীশ আসেন নাই—কারণ তাহাতে তাহার পড়াশুনায় ব্যাঘাত ঘটিবে—অন্ততঃ ইহাই রসময়ের বিশ্বাস। কিন্তু যখন সৌদামিনীদেবী মেনকাদেবী সংক্রান্ত পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ঘটনা শুনিলেন তখন তিনি আর নীরব থাকিতে পারিলেন না। স্বামীকে জানাইলেন যে যখন বিদেশ ভ্রমণে তাঁহার কোন উপকার দর্শিল না তখন যেন তিনি শীঘ্র স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন কিম্বা তাঁহার

এই অসময়ে স্ত্রীকে নিকটে রাখিয়া সেবা শুশ্রূষা করিবার সুযোগ দেন। এইরূপ অনেক কথা লিখিলেন বটে কিন্তু রবীন্দ্র সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপন করিতে সাহসী হইলেন না।

রসময় স্বামীজির সহিত এই সময়ে সাংসারিক বিষয় লইয়া নিভৃতে অনেক গুলি পরামর্শ করিলেন। পরিশেষে স্বামীজির আদেশ অনুসারে রসময় পুত্র রবীন্দ্রনাথকে শীঘ্রই নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে যাইতে অনুরোধ করিলেন। পুত্র রবীন্দ্র তাহাতে আর দ্বিরুক্তি করিল না। যাত্রাকালে রসময় পুত্রকে স্নেহালিঙ্গন পূর্ব্বক আশী-র্ব্বাদ করিলেন এবং আদেশ করিলেন যে তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহাকে সংবাদ দিলেই যেন সে নির্ভয়ে খুলনায় নিজ পিত্রালয়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করে।

পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ স্বামীজী ও পিতার পদধূলি লইয়া কলিকাতা রওনা হইল।

আরও দিন কয়েক কাশীতে কাটিয়া গেল। এই সময়ে রস-ময় প্রায়ই নির্জ্জনে থাকিয়া চিন্তা করিতেন ও মধ্যে মধ্যে স্বামিজীর সহিত কি পরামর্শ করিতেন তাহা তাঁহার ভৃত্য ও কর্ম্মচারীগণ-কেহই জানিতে পারিত না।

রসময় কোন উপকার না পাইয়া অধিকতর ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া কাশী পরিত্যাগ করিলেন। কাশী হইতে বরাবর নিজ বাটী খুলনায় ফিরিয়া আসিলেন। স্বামীজীর নিকট বিদায় কালীন তাঁহার ধর্ম্ম নিষ্ঠার ও পরহিতকারিতার ভূরি ভূরি প্রশংসা করি-লেন এবং তাঁহার অন্তিম কালে যাহাতে তিনি স্বামীজির চরণ স্পর্শ

করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন —স্বামীজীও এই অনুরোধ রক্ষা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

রসময় খুলনায় আসিয়া পুত্র ক্ষিতীশচন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন না। ক্ষিতীশচন্দ্র এখন কলিকাতায় নানাপ্রকার আমোদে ব্যস্ত। অধ্যয়নের ব্যাঘাত হইবে বলিয়া পুত্রকে খুলনায় আসিতে দেন নাই, এইরূপ কথা স্বামীকে জানাইয়া সোদামিনীদেবী পুত্রের চরিত্রহীনতার বিষয় গোপন করিলেন। রসময়ের উপর তরুণী ভার্য্যার একদিন বিশেষ আধিপত্য থাকায় তিনি এ কথায় প্রতিবাদ করিলেন না। রসময় বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার অন্তিম সন্নিকট। সেইজন্য নিজের ইহকালের হিসাব নিকাশ দিতে যাইবার পূর্ব্বে একবার প্রধান কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া তহবিলের আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশ চাহিলেন। নিকাশে ৭০০০ টাকার তহবিল মিলিল না। বিশেষরূপে উৎপীড়িত হইয়া প্রধান কর্ম্মচারী স্বীকার করিলেন যে তাঁহার অনুপস্থিত কালে ঐ ৭০০০৲ টাকা ক্ষিতীশচন্দ্রের হিসাবে ব্যয়িত হইয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসা করায় কর্ম্মচারী উত্তর করিলেন কর্ত্রী সোদামিনীদেবীর আদেশে ক্ষিতিশচন্দ্রকে দেওয়ানী আদালতের গ্রেপ্তারী পরোয়ানার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য উক্ত টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। পুত্র ক্ষিতীশচন্দ্র নিজ বিলাসিতার জন্য অর্থাভাব পরিপূর্ণ করিবার উপায়ন্তর না দেখিয়া মোটা সুদে কাবুলীওয়ালাদের নিকট হইতে ৫০০০ টাকা ঋণ করিয়াছিল। সেই ঋণ অতি অল্প সময় মধ্যে সুদে

আসলে প্রায় ১০০০ টাকা হইয়া যায়। সেই টাকার জন্ত পাওনাদার নালিশ করিয়া পরোয়ানা বাহির করে। কাজেই কর্ম্মচারী তহবিল হইতে এই টাকা দিতে বাধ্য হন। এই সমস্ত শুনিয়া রসময় অধিক মর্ম্মপীড়িত হইলেন। স্ত্রীর নিকট এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করায় সৌদামিনী দেবী সহস্রাধিক মিথ্যার অবতারণা করিয়া পুত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলেন বটে কিন্তু বিষয়ী ও বিচক্ষণ রসময়ের চক্ষু এড়াইতে পারিলেন না। তিনি বুঝিলেন মাতার আদরে পুত্র ক্ষিতীশচন্দ্র উচ্ছৃঙ্খল ও চরিত্রহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার এত যত্নের ধন সম্পত্তি এই ভাবী উত্তরাধিকারীর হস্তে অতি সত্বরই সমস্ত নষ্ট হইবে ভাবিয়া তিনি অস্থির হইলেন। মনে মনে এই সংকল্প করিলেন শীঘ্রই ইহার একটী প্রতীকার করিতে হইবে। তিনি কলিকাতাস্থিত বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী কালীচরণকে কলিকাতার সেরেস্তার হালচাল জানিবার ও তাহার সহিত একটা পরামর্শ করিবার জন্ত আহ্বান্ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

শীতকাল। রাত্রি প্রায় ১১টা। এই সময় কলিকাতা জোড়া বাগানে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হয়। নিমতলা ও জোড়াবাগানে প্রায় ১ বর্গ মাইল স্থান অধিকার করিয়া অনেকগুলি কাঠের গোলা বা আড়ৎ আছে। স্তূপাকার কাষ্ঠ রাশি এইস্থানে মধ্যে মধ্যে সন্নিবেশিত থাকে, এমন কি মালিকদের গদি ঘরগুলি প্রায়ই সমস্ত কাষ্ঠ নির্ম্মিত। শীতকালে এইগুলি রৌদ্রতাপে একেবারে শুষ্ক হইয়া বারুদের স্তূপে পরিণত হয়। যদি দৈবদুর্ব্বিপাকে কোন একস্থলে অগ্নি সংযোগ হয় তাহা হইলে বিপদের আর সীমা থাকে না। কি জানি সেদিন কাহার ত্রুটীতে এই কাঠগোলা মধ্যে আগুন লাগে এবং অতি অল্প সময় মধ্যে এ আগুন ভীষণ আকার ধারণ করে। অগ্নি-শিখা লোল জিহ্বা বিস্তার করিয়া একে একে অনেকগুলি কাঠগোলা আক্রমণ করিল। দমকল প্রভৃতির সাহায্য আসিবার পূর্ব্বে অগ্নিরাশি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া শুধু কাঠগোলাগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিল না— এই ভীষণ অগ্নিরাশি কাঠগোলাগুলিকে কেন্দ্র করিয়া চতুর্দ্দিকস্থ গৃহস্থদের ও ব্যবসাদারদের গৃহ আক্রমণ করিতে লাগিল। কলিকাতার মধ্যে যে কয়টি দমকল ছিল সকলগুলিই অনতিবিলম্বে জোড়াবাগানে আসিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ কার্য্যে নিযুক্ত হইল। পুলিসের

বড় বড় কর্ম্মচারীগণ ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা যখন দেখিলেন যে সমাগত দমকল সাহায্যে এই ভীষণ অগ্নিরাশির প্রকোপ দমন করা অসম্ভব, তখন তাঁহারা হাওড়া কাশীপুর প্রভৃতি স্থানের দমকল আনাইবার জন্য টেলিফোন করিলেন। ইত্যবসারে অগ্নি ভীষণ হইতে ভীষণতর আকার ধারণ করিল। হু হু শব্দে হুতাশন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া দমকল চালকদের চেষ্টা ব্যর্থ করিতে লাগিল। চারিদিকে হৈ হৈ পড়িয়া গেল। সে এক লোমহর্ষণ ভীষণ ব্যাপার। নিকটস্থ রাজপথ লোকে লোকারণ্য। কেহ আর্ত্তনাদ করিতেছে—কেহ প্রাণ বাঁচাইবার জন্য ছুটাছুটি করিতেছে—কেহ বা কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া দূরে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছে—আর সরকারী বেসরকারী অনেকেই অগ্নি রাশিকে আয়ত্তাধীন করিবার প্রাণান্ত চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইতেছে না। হুতাশনের বেগ প্রশমিত হওয়া দূরে থাক সেই গগনস্পর্শী অগ্নিশিখা অল্পক্ষণের মধ্যে কাঠগোলাগুলির সীমা অতিক্রম করিয়া মধ্যস্থিত রাজপথ অতিক্রম করিয়া গৃহস্থদের বাটিগুলি আক্রমণ করিয়া নিরীহ ক্লান্ত নাগরীকদের যৎপরনাস্তি ক্ষতিগ্রস্থ করিতে লাগিল। প্রাণভয়ে ভীত হইয়া এই সমস্ত নাগরীকগণ নিজ নিজ শয়ন কক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আর্ত্তনাদ তুলিয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল ও সকলেই নিজ নিজ সম্পত্তি বাঁচাইবার জন্য নিকটস্থ লোকেদের সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। কে কাহাকে দেখে—কে কাহাকে

সাহায্য করে? সকলেই নিজ নিজ স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত। এই প্রলয়ঙ্করী অগ্নিরাশির তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়া সকলেই হতবুদ্ধি ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল।

এইস্থানেই কেশব বাবুর চিকিৎসার জন্য রবীন্দ্রের উদ্যোগে একখানি দ্বিতল বাড়ী আজ প্রায় ৪ মাস হইল ভাড়া লওয়া হইয়াছে। রবীন্দ্রের মেশের নিকট বলিয়া এই স্থানেই বাড়ী ঠিক করা হয়। সেই বাটিতে জ্যোতীর্ম্ময়ী দাদামহাশয়ের সহিত উপস্থিত বাস করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে কেশব বাবুর বাসা-বাড়ির দ্বিতলগৃহে আগুন ধরিয়া গেল।

পীড়িত কেশব ও তাহার কর্ম্মচারীগণ গৃহ মধ্য হইতে রাজ-পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন ও প্রাণ ভয়ে চীৎকার করিতেছেন। ব্রাহ্মণের আজ সর্ব্বনাশ উপস্থিত। তাঁহার একমাত্র স্নেহপুত্তলি জ্যোতীর্ম্ময়ী যে দ্বিতল গৃহে সুখে নিদ্রা যাইতেছে—আর সেই ঘরেরই কড়ি কাঠ জানালা দরজায় আগুন লাগিয়াছে। বৃদ্ধ কেশব বাবু উন্মত্তের মত আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন— "আমার কি সর্ব্বনাশ হলো? কে আমার জ্যোতিকে বাঁচাবে জ্যোতীকে বাঁচাও, ওগো আমার জ্যোতিকে বাঁচাও।" কে কার কথা শুনে—কে কাহাকে দেখে? তিন চারিটি দমকল কোন দিকে সামলাইবে—এখনও অন্যান্য স্থানের দমকল আসিয়া পৌঁছায় নাই। যেগুলি উপস্থিত ছিল সেগুলি বহ্নিরাশিকে কাঠগোলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখিবার জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতেছিল। সেই

লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া তাহারা এক্ষণে অন্য দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারিল না। চতুঃপার্শ্বস্থিত গৃহস্থদের বাটির মধ্যে যে গুলি ব্রহ্মার কোপে পড়িয়াছিল সে গুলিকে তাহাদের অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া যাইতে হইল। কলিকাতার চতুঃপার্শ্বস্থিত স্থানের দমকলগুলি আসিয়া পড়িলে এই সব দিকে নিযুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে এইরূপ আদেশ প্রচারিত হইল। সরকারী কর্ম্মচারিদেরই বা দোষ কি? এই ভীষণ প্রলয় বহ্নি দমন করিবার শক্তি তাহাদের কোথায়? অগ্নির প্রকোপ যতটা আয়ত্তের মধ্যে রাখিতে পারে এই তাহাদের এখন চেষ্টা। কেশবের আর্ত্তনাদ জনতার কোলাহলের সঙ্গে কোথায় মিশিয়া গেল। কেহ তাহার স্নেহপুত্তলি জ্যোতী-র্ম্ময়ীকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে পারিল না। বৃদ্ধ রুগ্ন কেশব কি করিবেন—তিনি নিজের বুকে করাঘাত করিতে লাগিলেন ও পাগলের মত ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে জ্যোতীর্ম্ময়ীর শয়নকক্ষের যে জানালাটি প্রজ্বলিত কাটগোলার সম্মুখস্থ ছিল সেই জানালাটিতে আগুন ধরিয়া গেল ও অনতিবিলম্বে উহা অঙ্গারে পরিণত হইয়া গেল এবং তন্মধ্য-স্থিত লৌহদণ্ডগুলি ঝন্ ঝন্ শব্দে রাজপথে পড়িয়া গেল। "হায়—হায়—কি হইল—আমার জ্যোতীকে কেউ বাঁচাইতে পারে না—হা মধুসূদন—হা নারায়ণ—আমার হৃদয়নিধিকে তুমি বাঁচিয়ে দাও প্রভু।"

সহসা জনতাভেদ করিয়া গৈরিকবসনধারী এক নবীনসন্ন্যাসী

কেশববাবুর সম্মুখীন হইয়া বলিলেন—"আপনার কে আত্মীয় প্রজ্জ্বলিত গৃহমধ্যে নিদ্রিতা ?"

কে—বাবা! আমার একমাত্র বংশের নিধি প্রাণসমা পৌত্রী—আমার জীবনসর্ব্বস্ব—জ্যোতীর্ম্ময়ী।

নাম শুনিয়া সন্ন্যাসী শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"আমি বাঁচাইব।"

কেশব পাগলের মত জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কে সন্ন্যাসী ?" তুমি কি করে বাঁচাবে—তুমি বাঁচাতে পারবে বাবা!

ধীর প্রশান্তভাবে যুবক কহিল—"হাঁ মহাশয়। যদি এখনও সে জীবিতা থাকে তবে আমি বাঁচাব—আপনি স্থির হন।"

"কে তুমি এই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে তাহাকে বাঁচাচ্ছ ? বালক তুমি—তুমি কি পারবে ?"

"দেখি মধুসূদন কি করেন ?" এই বলিয়া যুবক নিকটস্থ একটা বাঁশের দোকান হইতে একটা বাঁশের বৃহৎ মই দ্রুতপদে আনয়ন করিলেন এবং তৎসাহায্যে যে জানালাটা অঙ্গারে পরিণত হইয়া কক্ষ মধ্যে একটা ভীষণ ছিদ্রের সৃষ্টি করিয়াছিল সেই স্থানের সহিত রাজপথের সংযোগ করিয়া দিল। তৎপরে সেই সন্ন্যাসী বিনা বাক্য ব্যয়ে নিজ গৈরিক বসন পাকড়ী সমস্ত ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া আদ্র কৌপিন মাত্র পরিধান পূর্ব্বক দ্রুতপদে জ্যোতীর্ম্ময়ীর শয়ন কক্ষ লক্ষ্য করিয়া উপরে উঠিতে লাগিল।

ঠিক এইসময় কলিকাতার সন্নিকটস্থ স্থানের আহুত দমকলের মধ্যে একটা ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়া কার্য্যে ব্রতী হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। যখন এই দমকল চালক দেখিল যে একজন বীর যুবক নগ্নদেহে বিপদসাগরে ঝাঁপ দিয়াছে এবং মইএর সাহায্যে বহ্নি বেষ্টিত জানালার নিকটে উঠিয়াছে তখন তাহাকে বিরত করিবার চেষ্টা বৃথা ভাবিয়া দমকলসাহায্যে ঐ যুবকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া জল ছাড়িতে লাগিল। সেই জলরাশি যুবককে ভাসাইয়া দিয়া ছিদ্রমধ্য দিয়া অনর্গল বেগে গৃহে প্রবেশ করিতে লাগিল। ইহাতে যুবকের গৃহ প্রবেশের পথ অনেকটা প্রশস্থ হইল, এবং এই অনর্গল জলপ্রবাহ যুবকের উদ্ধারকার্য্যে অনেক সহায়তা করিতে লাগিল। যখন ব্যাপার এই ভাবে দাঁড়াইয়াছে তখন সকলের দৃষ্টি ঐ যুবকের উপর পড়িল। দর্শক মণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন—"উঃ কি অসম সাহস? একটার জন্যে বুঝি ছুটো মরে? কেহবা বলিল এ লোকটা বাতুল না কি?" কেহ বলিল, "এ লোকটার নিশ্চয় যোগবল আছে, নচেৎ এমন অসমসাহসীক কার্য্যে ব্রতী হয়?" প্রভৃতি নানা প্রকার জল্পনা চলিতে লাগিল। যুবক কোন কথায় ভ্রূক্ষেপ করিল না—নির্ভীক হৃদয়ে সবেগে জানালার ছিদ্র মধ্য দিয়া প্রজ্বলিত গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল ও অচিরে লোকদৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল। গৃহ মধ্যে তাহার গতি লক্ষ্য করিয়া দমকল চালক জল ছাড়িতে লাগিল। দর্শকমণ্ডলীরা সকলেই ক্ষণেক

নিস্পন্দ ও নীরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া উৎকণ্ঠার সহিত যুবকের পরিনাম দর্শন করিবার জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল।

কেশব অধীর হইয়া কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কিছু দেখতে পাচ্ছ বিনোদ? দেখনা—একটু এগিয়ে দেখনা।'

বি—আর কি দেখবো মশাই। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। কি হতে কি হয়—আবার দেখুন।

কেশবের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে যুবক জানালার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দর্শকমণ্ডলী হৈ হৈ শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। 'বাহবা! বাহবা! কি বীরত্ব! Bravo! Bravo!" প্রভৃতি শব্দ চারিদিক হইতে উচ্চারিত হইতে লাগিল। যুবক জানালার নিকট দাঁড়াইয়া একবার চক্রাকার নিজের সর্ব্বাঙ্গটাই জলে সিক্ত করিয়া লইল। যখন তাঁহার পৃষ্ঠদিক দর্শকমণ্ডলীর দৃষ্টিগোচরীভূত হইল তখন তাহারা নিকটস্থিত অগ্নির আলোক দেখিতে পাইল যুবকের পৃষ্ঠে বস্ত্রবন্ধনে আবদ্ধ প্রায় অর্দ্ধসিক্ত এক যুবতীর দেহ। কেশব পাগলের মত চীৎকার করিয়া উঠিল—

"ঐ যে আমার জ্যোতী! বিনোদ! ও বিনোদ! আমার জ্যোতী বেঁচে আছে ত?"

বিনোদ উদগ্রীব চিত্তে যুবকের কার্য্য কলাপ নিরীক্ষণ করিতেছিল। কাজেই উপস্থিত প্রভুর কথার কোন সদুত্তর দিতে পারিল না। শুধু বলিল—

"সবুর করুন মশাই—আগে নাবুক।"

অনতিবিলম্বে দর্শকমণ্ডলীর করতালি ও উচ্চ আনন্দ ধ্বনির মধ্যে যুবক সিঁড়ি হইতে ভূমিতলে অবতরণ করিল। তাঁহার বিশেষ কিছু ক্ষতি হইয়াছে এরূপ বোধ হইল না। তবে তাহার পদতলে অগ্নির তাপে দুই একস্থানে ফোস্কা পড়িয়াছে—ইহাই দেখিতে পাওয়া গেল। যুবকের নগ্নপদ না থাকিলে বোধ হয় এ সামান্য অনিষ্টও ঘটিত না। যাহাহউক যুবক ইহাতে কোনরূপ ভ্রূক্ষেপ করিল না।

যুবক ভূমিতলে মাত্র আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন অমনি জ্যোতীর্ম্ময়ীর শয়ন গৃহের কড়িকাঠ ভাঙ্গিয়া ছাদের কতক অংশ 'হুড়মুড়' শব্দে ভূপতিত হইল। সকলেই যুবককে ধন্য ধন্য করিল। সকলেই বলিতে লাগিল—"ভগবান রক্ষা করেছেন,—ভগবান রক্ষা করেছেন। আর একটু বিলম্ব হ'লেই বালিকা ছাদ চাপা প'ড়ত।" যুবক সিড়ি হইতে নামিয়াই কেশব বাবুর সম্মুখীন হইয়া কহিলেন—"মহাশয়! বালিকাকে মূর্চ্ছিতা অবস্থায় তুলে এনেছি। তাঁর সংজ্ঞা নাই। এখনই চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।"

কেশব—"বাবা—বল আমার জ্যোতী বেঁচে আছে ত?

যুবক মনে মনে বলিলেন—"তা না হ'লে এ অভাগা আর আপনার কাছে মুখ দেখাইত না।" প্রকাশ্যে বলিলেন "যখন তাঁহাকে তাঁহারই বস্ত্রের অর্দ্ধেক অংশের দ্বারা আমার পৃষ্ঠে বন্ধন করি তখন তাঁহার প্রাণ ছিল। আমার বোধ হয় জীবনের আশা এখনও সম্পূর্ণ আছে।"

বৃদ্ধ কেশব কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন—বাবা! তুমি কে? ভগবান কি স্বয়ং অবতীর্ণ হ'য়ে আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন?

অনতিবিলম্বে ভৃত্যকে শীঘ্র একখানি মোটর আনিতে আদেশ করিয়া তিনি জ্যোতির শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন।

এই সময় পুলিসের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণ যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন ও দমকল চালকদের নেতাগণ যাঁহারা এই অগ্নি-কাণ্ড নির্ব্বাপণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই যুবকের নিকট আসিয়া তাহার পরিচয় চাহিলেন। যুবক শুধু উত্তরে ক্ষমা চাহিলেন ও নিজ পরিচয় দিতে অস্বীকার করিলেন। তাঁহারা অনেক মিনতি ও অনুনয় করিলেন এবং সরকার বাহাদুর হইতে তাঁহার বীরত্বের উপযুক্ত পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইলেন—যুবক তথাপি নিজের পরিচয় দিলেন না—তিনি ধীরে ধীরে ভীড়ের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

প্রভুর আহ্বানে কালীচরণ কলিকাতা হইতে খুলনায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে পুত্র ক্ষিতীশচন্দ্রের কার্য্যকলাপ, সম্বন্ধে বিশ্বাসী ভৃত্য কালীচরণকে রসময় বাবু অনেক প্রশ্ন করিলেন এবং পুত্রের গতিবিধির ও চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথাই পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে জিজ্ঞাসা করিলেন। কালীচরণ যাহা যাহা জানিতেন ও যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা অকপটে সমস্তই প্রভুকে জানাইলেন। সমস্ত ঘটনা শুনিয়া তিনি বড়ই চিন্তিত ও বিচলিত হইলেন। এই শঙ্কটাপন্ন অবস্থায় যখন তিনি কালীচরণের মুখে শুনিলেন যে, পুত্র ক্ষিতীশচন্দ্র শুধু তাঁহার মৃত্যুরূপ শুভ দিনের অপেক্ষায় বসিয়া আছে, তখন তিনি রোষে ও ক্ষোভে বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন। কলিকাতায় থাকিয়া পুত্রের যে শিক্ষাদীক্ষা কিছুই হয় নাই তাহা তাঁহার বুঝিতে বাকি রহিল না। ধীরচিত্তে সমস্ত কার্য্য কারণের সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা করিয়া পুত্র অপেক্ষা স্ত্রী সৌদামিনী দেবীকে এজন্য তিনি বিশেষরূপ অপরাধিনী করিলেন। যতই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন ততই স্ত্রী ও পুত্রের প্রতি ঘৃণার ভাব তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল।

কাশীধামে মণিকর্ণিকার ঘাটে সাধ্বী মেনকা দেবীর অন্তিম সময়ের ঘটনাবলী তাঁহার মনে অনুতাপানল জ্বালিয়া দিয়াছিল। তিনি মনে মনে নিজের দুষ্কার্য্যের প্রতিবিধান করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ

হইয়াছিলেন। তাহার উপর ক্ষিতীশচন্দ্রের ও তাহার গর্ভধারিণীর সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া তাহাদের উপর রসময় বাবুর মন অধিকতর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ক্ষিতীশও পুত্র—রবীন্দ্রও পুত্র। কিন্তু দুজনের কি প্রভেদ। রবীন্দ্রের উদার হৃদয়, ধর্ম্মগতপ্রাণ, দেব-দ্বিজ ও পিতা মাতার প্রতি ভক্তি, সহিষ্ণুতা ও শিক্ষা দীক্ষার বিষয় যতই ভাবিতে লাগিলেন ততই তিনি তাঁহার কৃতকর্ম্মের জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। ভাবিলেন "আমি সুধা ফেলিয়া গরল খাইয়াছি—মণি ফেলিয়া কাচখণ্ডে আকিঞ্চন করিয়াছি। এখনও কি উপায় নাই? বাকি যে ক'টা দিন আছে এর মধ্যে কতকটা কি প্রতীকার করিতে পারি না?" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি আত্মহারা হইয়া যাইতে লাগিলেন। তারপর মেনকা দেবীর অন্তিম সময়ের অনুরোধ ও শেষ কথা গুলি তখনও যেন কর্ণকুহরে ঝঙ্কার দিতেছে বলিয়া বোধ হইল। মেনকা দেবীকে পরিত্যাগ করিবার পর হইতে আজ অবধি অতীত জীবনের পত্রগুলি খুলিয়া যতই দেখিতে লাগিলেন ততই নিজের উপর ঘৃণা আসিতে লাগিল। তিনি কি করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। সৌদামিনী দেবীকে ও পুত্র ক্ষিতীশচন্দ্রকে বড় একটা নিকটে আসিতে দিতেন না। তিনি বাহিরের মহলেই থাকিতেন, আর সেই খানেই তাঁহার চিকিৎসা চলিত। দাস দাসী ও কর্ম্মচারীদের মধ্যে শুধু কালীচরণকে নিকটে রাখিতেন। কালীচরণ এই মুমূর্ষু প্রভুকে নিজ পিতার ন্যায় সেবা করিয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতেন। এই সময় বিশেষ কাতর হইয়া তিনি কাশীধাম

হইতে সদানন্দ স্বামীকে একবার আসিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি ইহাও জানাইলেন যে, তাঁহার অবস্থা দিন দিন অতি শোচনীয় হইতেছে এবং অচিরে যে তাঁহাকে কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। অতএব এই সময়ে যেন তিনি তাঁহার খুলনার বাটীতে পদধূলি দিয়া তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। অধিক বিলম্ব করিলে হয়ত আর এ জগতে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনা থাকিবে না। এ ছাড়া তিনি জানাইলেন যে, তাঁহার সহিত বৈষয়িক দুই চারিটী পরামর্শ করিবার প্রয়োজন আছে। নিজের দিন দিন বুদ্ধি ভ্রংশ হইতেছে—এমন কি অধিকক্ষণ চিন্তা করিয়াও নিজের হিতাহিত নির্ণয় করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত তাঁহার এখন রহিত হইয়া আসিতেছে। যদি স্বামীজি দয়া পরবশ হইয়া একবার শেষ দেখা দেন তবে এই উপযুক্ত সময়—কারণ বহুমূত্র হইতে তাহার যক্ষ্মারোগ উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার তলব আসিয়াছে—মোট-ঘাট গুছাইয়া লইতে যা দেরী।

এই সংবাদ পাইয়াই স্বামী সদানন্দ অচিরে খুলনায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামীজিকে পাইয়া রসময় জগৎ ভুলিয়া গেলেন। ধর্ম্মের কি মহিমা! এতদিন প্রাণে যে তীব্র জ্বালা সহ্য করিতেছিলেন, স্বামীজির সংসর্গে ও তাঁহার সরস সুললিত ধর্ম্মকথা শ্রবণে তাঁহার হৃদয় কতকটা প্রফুল্ল হইতে লাগিল। ধর্ম্মকথা ছাড়া উপস্থিত বিষয় সম্পত্তি লইয়া স্বামীজি ও কালীচরণের সহিত নিভৃতে অনেকগুলি পরামর্শ চলিতে লাগিল।

স্বামীজি যখন দেখিলেন যে রসময়কে কালব্যাধি আক্রমণ করিয়াছে ও তাহার জীবনের মিয়াদ অতি অল্পই আছে, তখন তিনি রসময়-বাবুকে প্রথম পুত্র রবীন্দ্রকে আনিবার ইঙ্গিত করিলেন। অন্য কোন উপযুক্ত লোক না থাকায় কর্ম্মচারী অঘোর দাসকে কলিকাতায় জোড়াবাগানের মেসে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইল। তিনি আদেশ দিলেন যে, যত শীঘ্র পারে সে যেন রবীন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া খুলনা আইসে। অঘোর দাস সৌদামিনীর অনুগত লোক। যদিও অঘোরকে এই কার্য্য অতি গোপনে সম্পন্ন করিতে বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল তথাপি এ সংবাদ অন্দরমহলে অতি সত্বরই প্রচারিত হইয়া গেল। মাতা পুত্রে নিভৃতে অনেক পরামর্শ করিলেন, এবং অবশেষে উহারা স্থির করিলেন যে অঘোর দাস উপস্থিত খুলনা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বদেশ রাণাঘাটে পুত্র পরিবারের সহিত দিনকতক কাটাইয়া শেষে যেন কলিকাতায় যায়। ইতিমধ্যে হয়ত রসময় ইহলীলা সম্বরণ করিতে পারেন। রসময়ের সহিত যাহাতে আর রবীন্দ্রের সাক্ষাৎ না হয় ইহাই মাতা পুত্রের উদ্দেশ্য। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, এই সাক্ষাতে তাঁহাদের স্বার্থহানির সম্ভাবনা। যাহাহউক, অঘোরদাস প্রভুপত্নীর আদেশমত খুলনা ত্যাগ করিল।

প্রায় ১ সপ্তাহ কাটিয়া গেল। রসময়ের অবস্থা অধিকতর আশঙ্কাজনক হইতে লাগিল। কিন্তু রবীন্দ্র আসিল না। এই সময়ে স্বামীজির কাশীধামে বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায়, তিনি আর অধিক দিন খুলনায় থাকিতে পারিলেন না। তিনি অগত্যা

অনিচ্ছাসত্ত্বেই খুলনা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার বড় সাধ ছিল তিনি এখানে থাকিতে থাকিতে যেন রবীন্দ্র পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসে। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। তবে তিনি বিদায় লইবার পূর্ব্বে বুঝিয়াছিলেন যে অঘোরনাথ নিশ্চয়ই রসময়ের কথামত রবীন্দ্রনাথের নিকট যায় নাই। ইহার মধ্যে অন্দরমহলের হস্তক্ষেপ থাকায় ভৃত্য অঘোর-দাস প্রভুর সহিত প্রতারণা করিয়াছে। যাহাহউক তিনি খুলনা পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে কলিকাতায় রবীন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে পিতৃসমীপে পাঠাইয়া তবে কাশীধাম যাইবেন এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি রসময়ের নিকট বিদায় লইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রাণ রক্ষাকারী নবীন সন্ন্যাসী—কে? মাতার প্রেতকার্য্য সমাধা করিয়া রবীন্দ্র তাহার পিতা ও স্বামীজির আদেশ অনুসারে বরাবর বারাণসী হইতে কলেজে যোগদান করিবার জন্য কলিকাতায় আসিতেছিল। শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হইবার পর স্বামীজি তাহাকে হিন্দুশাস্ত্রমত একবৎসর অশৌচ প্রতিপালন করিতে আজ্ঞা দিলেন। তিনিই নিজ হস্তে তাহাকে গৈরিক বসনে সাজাইয়া দিয়া কাশী হইতে বিদায় দিলেন। বিশালবক্ষ উন্নতদেহ সৌম্যমূর্ত্তি রবীন্দ্র যখন স্বামীজির আদেশমত নগ্নপদে গৈরিক বসন পরিহিত হইয়া মুণ্ডিত মস্তকটি গৈরিক পাগড়িতে আচ্ছাদিত করিয়া বিদায় লয়, তখন স্বামীজির প্রাণ যথার্থই পুলকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাহার পবিত্র মাধুরী তখন শত গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই সন্ন্যাসী বেশধারী রবীন্দ্র ট্রেণ হইতে অবতরণ করিয়া জোড়াবাগান মেসে আসিবার সময় পথে বিপন্না জ্যোতীর্ম্ময়ীর কথা শুনিয়া স্বেচ্ছায় অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া যেরূপে তাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন। তখন কেহই এই নবীন সন্ন্যাসী রবীন্দ্রকে চিনিতে পারে নাই। রবীন্দ্র জ্যোতীর্ম্ময়ীকে দেবী ভাবে মনে মনে পূজা করিত, সে পূজার তাহার কোন কামনা ছিল না। প্রতিদান বা পুরস্কার তাহার হৃদয়ে

কোন দিন স্থান পায় নাই। রবীন্দ্র মনে মনে জানিত যে, সে সমাজের চক্ষে একটি নগণ্য ও ঘৃণিত ব্যক্তি। অনেকেই তাহাকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। কিন্তু জ্যোতীর্ম্ময়ী তাঁহাকে সহোদরের মত ভাল বাসিত আর তাহার সহৃদয়তার জন্যই কেশব বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং প্রতাপান্বিত কেশব বন্দ্যোপাধ্যায়ের আনুগত্য লাভ করিয়াই গ্রাম্য দলাদলির সঙ্কীর্ণতার মধ্যেও রবীন্দ্র ও তাহার মাতা নির্ব্বিঘ্নে স্থান পাইয়াছিল। একারণ রবীন্দ্রের কেশবের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি—এ কারণ জ্যোতীর্ম্ময়ীর উপর আন্তরিক স্নেহ ও অনুরাগ। এ অনুরাগ নির্ম্মল, পবিত্র ও মধুর। জ্যোতী ভালবাসিবে বলিয়া রবীন্দ্র তাহাকে ভাল বাসে নাই। জ্যোতীর মঙ্গল দেখিলে তাহার সুখ —জ্যোতীর আনন্দে তাহার আনন্দ—জ্যোতীই যেন এখন তাহার সকল সুখের কেন্দ্রস্থল। পাছে পরিচয় দিলে কেশবের বা জ্যোতীর প্রাণে কৃতজ্ঞতা জাগিয়া উঠিয়া তাঁহাদের স্থির ও নির্ম্মল প্রাণে তরঙ্গের সঞ্চার করে এই জন্যই রবীন্দ্র আত্মগোপন করিয়াছিল।

জ্যোতীর্ম্ময়ীর উদ্ধারের পরই কেশব তাহাকে মেডিক্যাল কলেজে লইয়া গিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিলেন। পরে মেডিক্যাল কলেজের সন্নিকটে একটি বাড়ীভাড়া লইয়া সেই খানে তিনি তাহার চিকিৎসা চালাইতে লাগিলেন। রবীন্দ্র প্রত্যহই প্রায় অধিকাংশ সময় জ্যোতীর সেবায় নিযুক্ত থাকিত। যদিও তাহার বি, এ, পরীক্ষা সন্নিকট, তথাপি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া শুধু

জ্যোতীর শুশ্রূষায় দিবারাত্র অতিবাহিত করিতে লাগিল। প্রথম প্রথম স্বল্প মাত্রায় জ্যোতীর সংজ্ঞা দেখা দিত বটে-কিন্তু তখনই সে —"ঐ আগুন—ঐ আগুন"—"পুড়ে মলুম—পুড়ে মলুম" বলিয়া চিৎকার করিয়া আবার সংজ্ঞা হারাইত। কখনও বা—"কে "কোথায় আছ—দাদা মশাই! দাদা মশাই! রবি দা! আমায় রক্ষা কর" বলিয়া সে চিৎকার করিয়া উঠিত—আবার ক্ষণেকের জন্য সংজ্ঞা লোপ পাইত। এই ভাবে ২।৩ দিন কাটিয়া গেল। ক্রমে তাহার অবস্থা ভাল হইতে লাগিল। একদিন ক্ষত স্থানে যখন রবীন্দ্র ঔষধের প্রলেপ দিতেছিল তখন জ্যোতির্ম্ময়ী চক্ষুরুন্মিলন করিয়া রবীন্দ্রকে বেশ নিরীক্ষণ করিল। পরে কহিল "তুমি? তুমি রবিদা আমায় বাঁচিয়েছ? অত আগুনে তোমার ভয় করলো না? তুমি আমায় বড় ভালবাস, নয়?"

যুগপৎ বিস্মিত ও হর্ষোৎফুল্ল হইয়া রবীন্দ্র কহিল "কে বল্লে আমি তোমাকে বাঁচিয়েছি?"

জ্যো—আমি ত তোমার স্বর শুনেছিলাম। আমি যে শুনলাম জ্যোতী, জ্যোতী, ভয় নেই—ভয় নেই আমি এসেছি—সে যে ঠিক তোমারই স্বর, রবিদা! তার পর কি হ'লো মনে নাই।

রবি—তুমি ভুল শুনেছ। তোমাকে একজন যোগী উদ্ধার করেছেন।

যোগী? কে তিনি? এই বলিয়া জ্যোতী আবার মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

আরও এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল—ক্রমে তাহার অবস্থা ভাল

হইতে লাগিল। কেশব এইরূপ রবীন্দ্রের একাগ্রচিত্তের সেবা দেখিয়া তাহার প্রতি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন।

ক্রমে জ্যোতীর্ম্ময়ী বেশ আরোগ্য লাভ করিল। প্রায়ই আজকাল রবীন্দ্র কেশব ও জ্যোতীর্ম্ময়ী সকলেই একত্রে গল্পগুজব করিয়া থাকেন। ৺কাশীধামে রবীন্দ্রের মাতার পরলোক গমন, সদানন্দ স্বামীজির নিঃস্বার্থ পরোপকারিতা, সহৃদয় ব্যবহার, স্বামীজির কৌশলে রসময়ের সহিত রবীন্দ্রের সাক্ষাৎ, রসময়ের পুত্র রবীন্দ্রের প্রতি সহানুভূতি, মেনকা দেবীর সহিত রসময়ের সাক্ষাৎ, মেনকা দেবীর মর্ম্মস্পর্শী শেষ অনুরোধ, প্রভৃতি সমস্ত ঘটনাই কেশব ও জ্যোতীর্ম্ময়ী বিশেষ আগ্রহের সহিত শুনিতে লাগিলেন।

রসময়ের চিত্তপরিবর্ত্তনের আভাস পাইয়া ইঁহারা—বিশেষ জ্যোতীর্ম্ময়ী অত্যন্ত পুলকিত হইল। আর স্বামীজির উন্নত ও উদার হৃদয়ের কথা যত তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন ততই তাঁহাদের প্রাণে একটা ভক্তির ভাব উদিত হইতে লাগিল। কেশব বাবু একবার সদানন্দ স্বামীজির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ধন্য হইবেন এইরূপ সঙ্কল্পও করিলেন।

একদিন সকলে বসিয়া অনেকপ্রকারের কথাবার্ত্তা কহিতেছেন এমন সময় স্বামীজি হঠাৎ সেই স্থানে বিনা আহ্বানে আসিয়া উপস্থিত। তিনি আসিবা মাত্র রবীন্দ্র ভক্তিভরে তাঁহার পদধূলি লইয়া তাঁহাকে গৃহমধ্যে বসাইল এবং তৎক্ষণাৎ কেশব বাবুকে ও জ্যোতীর্ম্ময়ীকে স্বামীজির পরিচয় দিয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা

করিল। বিনা আয়াসে নিজ কুটিরে স্বামীজির দর্শন পাইয়া কেশববাবু যারপর নাই পরিতুষ্ট হইলেন।

স্বামীজি জানাইলেন যে তিনি রবীন্দ্রের অনুসন্ধানে প্রথমে জোড়াবাগান মেসে গিয়াছিলেন। তথায় অন্যান্য ছাত্রবৃন্দের নিকট জ্যোতীর্ম্ময়ীর বিপদের কথা শুনিলেন এবং এই বিপদের পর জ্যোতীর্ম্ময়ীর জন্য রবীন্দ্র যে প্রাণপণে সেবা শুশ্রূষা করিয়া তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছে এ বিষয়ও জ্ঞাত হইলেন। পরে তাহাদের নিকট এই বাসার ঠিকানা পাইয়া তিনি অনুসন্ধান করিতে করিতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

এই সময়ে কিরূপে এক নবীন সন্ন্যাসী অমানুষিক ধৈর্য্য ও সাহস দেখাইয়া ঘোর বিপদ হইতে তাঁহার বিপন্না জ্যোতীর্ম্ময়ীকে উদ্ধার করিয়া ছিলেন তাহা কেশববাবু স্বামীজিকে জানাইলেন। স্বামীজি কেশবের কথা শুনিয়া সেই উদ্ধারকারী সন্ন্যাসীর ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি যখন শুনিলেন যে সেই সন্ন্যাসী আপন পরিচয় গোপন করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, তখন তিনি মাত্র দুই একবার ঈষৎ বক্রভাবে রবীন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু ইহা কেহ লক্ষ্য করিল না। স্বামীজি আর অধিক সময় নষ্ট না করিয়া রসময় বাবুর অসুখের কথা উল্লেখ করিলেন এবং তাহার দিন সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছে ও এই সময় তিনি একবার রবীন্দ্রকে দেখিতে চান ইহাও জানাইলেন। অঘোর দাস যে তখনও

রবীন্দ্রকে কোন সংবাদ দেয় নাই এ কথা জানিয়া তিনি বড় বিশেষ বিস্মিত হইলেন না।

সকলেই বিশেষ রবীন্দ্র তাহার পিতার মুমূর্ষু অবস্থার কথা শুনিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইল। যদিও সে সেইদিনই খুলনায় রওনা হইতে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু পরদিন হইতে তাহার বি, এ, পরীক্ষা আরম্ভ হইবে এজন্য অন্তত ৩।৪ দিন খুলনা যাত্রা স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইতেছে—এ কথা স্বামীজিকে জানাইল। স্বামীজি এই কথা শুনিয়া বিষম সমস্যায় পড়িলেন। বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া পরীক্ষার শেষ দিন পর্য্যন্ত রবীন্দ্রকে কলিকাতায় থাকা সম্বন্ধে সম্মতি প্রদান করিয়া বলিয়া দিলেন যে, পরীক্ষা দিয়াই সেই রাত্রের ট্রেণে যেন সে খুলনা যাইতে বিলম্ব না করে। তৎপরে কেশব বাবুর, জ্যোতীর্ম্ময়ীর ও রবীন্দ্রের ব্যবহারে ও আকিঞ্চনে পরিতুষ্ট হইয়া স্বামীজি সকলকেই আশীর্ব্বাদ করিয়া কাশীধাম যাত্রা করিবার জন্য সত্বরই হাওড়ামুখে যাত্রা করিলেন। কেশব ও রবীন্দ্র স্বামীজিকে ২।১ দিন তথায় থাকিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু স্বামীজি বিশেষ কাজে ব্যস্ত থাকায় অচিরে কাশীধাম যাত্রা করিবেন বলিয়া তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিবেন না এইরূপ মনোভাব জানাইলেন; এবং তাঁহার এই ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাহিলেন। তবে সুযোগমত বারান্তরে আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সকাল হইয়াছে। গতরাত্রিটা রসময় বড়ই কষ্টে কাটাইয়াছেন সমস্ত রাত ছটফট করিয়াছেন। অবস্থা পলে পলে খারাপ হইতেছে। মধ্যে মধ্যে একবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—রবীন্দ্র! রবীন্দ্র এলে?

কালী—না মশাই! রবীন্দ্র এখনও আসে নাই।

রস—তবে ঘরে কে? তুমি কে?

কালী—আজ্ঞে, আমায় চিন্‌তে পার্‌ছেন্ না? আমি কালীচরণ।

রস—তোমার পাশে ও কে?

কালী—আজ্ঞে! ছোট বাবু।

রস—কে? ক্ষিতীশ?

ক্ষি—আজ্ঞে হাঁ।

রস—ক্ষিতীশ, তুমি যাও অন্দরে গিয়ে তোমার কাজ দেখ। ক্ষিতীশ চলিয়া গেল।

রস—দেখ কালীচরণ! আমার শরীরটা রাত্রের চেয়ে এখন একটু ভাল বলে বোধ হচ্ছে। কিন্তু আমি চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছি না।

কালী—বলেন ত ডাক্তার বাবুকে আবার খবর দিই।

রস—না ডাক্তার বাবুকে খবর দিতে হবে না। ডাক্তার এখনি আস্‌বে। আর সে এসেই বা কি করবে? দেখ খানিক আগে আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম যেন রবি এসেছে—কিন্তু বাড়ী ঠিক করতে পারছে না—তাই পথে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তুমি ষ্টেশনের পথে একটু এগিয়ে দেখতে পার? তোমার অচেনা কোন যুবক যদি আমাদের বাটীর খবর লয় তবে তাহাকে শীঘ্র ক'রে আনবে। তাকে আমার মরবার আগে একটীবার বিশেষ দরকার। আমার আর অধিক বিলম্ব নাই।

আচ্ছা', তবে আমি একটু এগিয়ে দেখছি" এই বলিয়া প্রভুভক্ত কালীচরণ তৎক্ষণাৎ প্রভুর আদেশমত ষ্টেশনের রাস্তায় ছুটিয়া গেল। ভোরেই কলিকাতার ট্রেণ আসিবার সময়।

এই সময়ে সৌদামিনী দেবী মুমূর্ষু স্বামীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দরজা খুলিবামাত্র রসময় জিজ্ঞাসা করিলেন—

কে? রবি এলে?

রবির নাম শুনিয়া সৌদামিনী জ্বলিয়া উঠিলেন। মনে মনে বলিলেন—রবি—রবি করেই ম'লো? রবি এসে যে ওঁর কি পিণ্ডি চটকাবে তা উনিই জানেন। মনোভাব গোপন করিয়া বলিলেন—না রবি নয়, আমি।

রস—কে তুমি?

সৌ—তুমি আমায় চিন্‌তে পারছ না?

রস—ও তুমি? তুমি এখানে কেন? এখনি ডাক্তার আসবে।

ঈষৎ কুপিতভাবে সৌদামিনী বলিলেন—

হ্যাগা! তুমি কি বলছ? তোমার এই শক্ত ব্যারাম। আর কাছে কেউ নেই। তোমায় এ অবস্থায় ফেলে কি অন্দরে ব'সে থাকা যায়? ছেলেটাকে ত ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলে। কি যে বুঝেছ তা তুমিই জান। দশটা নয় পাঁচটা নয়—একটা ছেলে। সে কাছে এলে তাড়িয়ে দাও কেন, বলত?

রসময় অধিক কথা কহিতে পারিলেন না। শুধু বলিলেন—হুঁ, আচ্ছা যা ভাল হয় কর।

সৌদামিনী নিকটে বসিয়া স্বামীর গায়ে ও মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণ মধ্যে ডাক্তার বাবু আসিলেন। এই সময় সৌদামিনী দেবী গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন।

ক্ষিতীশচন্দ্র ডাক্তার বাবুর সঙ্গে গৃহ মধ্যে থাকিলেন। ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—রসময় বাবু! আজ কেমন আছেন?

রসময় যেন কি একটা নেশার ঝোঁকে শুইয়া ছিলেন। প্রথমে কিছু শুনিতে পাইলেন না। তাহার পর আবার ডাক দিতে রসময়ের যেন চমক ভাঙ্গিল। তিনি বলিলেন—

কে? কে? রবি?

ডা—কেমন আছেন?

রস—কে? ডাক্তার বাবু?

ডা—হাঁ।

রস—আমি কেমন আছি বল্‌তে পারছি না। বোধ হয় এইবার ভালই থাকবো।

রসময়ের কথা কহিতে কষ্টবোধ হইতেছিল। ডাক্তার বাবু তাঁহাকে অধিক বিরক্ত করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। তারপর ক্ষিতীশকে চুপি চুপি বলিলেন—

আর অধিকক্ষণ নয়। মিথ্যা ঔষধপত্র দেওয়া। এখন যা করবার সেই সবের উদ্যোগ কর—এই বলিয়া নিজ দর্শনী পকেটে পুরিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন। ক্ষিতীশ ও ডাক্তারের সঙ্গে গৃহের বাহিরে গেল। তথায় গিয়া মাতার সহিত গোপনে ২।৪টি কথা কহিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া ক্ষিতীশ একটু সজোরে রসময়ের ঘরের দরজা খুলিল। খুলিবামাত্র রসময় ভাঙ্গাভাঙ্গা স্বরে অতি কষ্টের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—কে? রবি এলে?

ক্ষিতীশচন্দ্র উত্তর দিলেন—

হুঁ। আমি এসেছি।

রসময় যেন নবসঞ্জীবনী সুধার বলে উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—

কই বাবা, কাছে এস। তোমার জন্যেই প্রাণটা বেরোয়নিরে। ঐ তোমার মা আমায় ডাকছে। আমি তার কাছে যাবো। তুমি একবার আমার কাছে এস বাবা।

এই কথা শুনিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র আস্তে আস্তে দৃষ্টিশক্তিহীন মুমূর্ষু পিতার খাটের পার্শ্বে কৃত্রিম রবীন্দ্র সাজিয়া বসিল। রসময় নিজ দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া স্পর্শ দ্বারা রবীন্দ্রের অস্তিত্বের বিষয় নিঃসন্দেহ হইয়া বলিলেন—

"এসেছ—খুব সময়েই এসেছ। তা না হলে আমার মনে বড় কষ্ট থেকে যেতো, বাবা।" রসময় রবীন্দ্র ভ্রমে ক্ষিতীশের মাথায় হাত দিয়া বলিলেন—"আশীর্ব্বাদ করি সুখে থাক—বংশের মুখ উজ্জ্বল ক'রো। ক্ষিতীশ স্বার্থপর, নীচ, পাষণ্ড, নরাধম। তার মুখ দেখতে চাই না"—তাহার পর নিজের যজ্ঞোপবীতসংলগ্ন একটী চাবি পুত্রকে দেখাইয়া বলিলেন—

"দেখ বাবা, তোমার মাকে অন্যায়ভাবে বড় কষ্ট দিয়েছি। সে কথা মনে হ'লে আমার প্রাণের জ্বালা শতগুণে বেড়ে উঠে। কুশ কাঁটার আগুণ আমার বুকের মধ্যে হুহু করে জ্বলতে থাকে। এইবার সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।" তাহার পর একটু সামলাইয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন—"শোন রবি! এই চাবিটি এই ঘরে যে আলমারী আছে তারই চাবি। সেই আলমারীর নীচের তাকে দুই খানা উইল আছে। প্রথম উইলে তোমাকে বঞ্চিত ক'রে সয়তান ক্ষিতীশকে তার মায়ের অনুরোধে সব দিয়েছিলাম। আমার ভ্রম আমি এখন বেশ বুঝেছি। তাই কাশী থেকে এসে স্বামীজির সঙ্গে পরামর্শ করে দ্বিতীয় উইল লিখেছি। এই উইলে প্রথম উইল নাকোচ করে দিয়েছি। এই দ্বিতীয় উইলের মতে সমস্ত কায হবে। তুমিই আমার বিষয়ের ভাবী উত্তরাধিকারী। শুধু তোমার বিমাতা ও তাহার পুত্রের ভরণপোষণের জন্য মাসিক এক শত টাকা দিবে। আর এই বাটীর মধ্যে যেখানে তুমি ভাল বুঝবে, সেইখানে তাদের থাকতে দিবে। উইল পড়লেই সব জানতে পারবে। আর সদানন্দ স্বামিজীকে আতুরাশ্রম করবার

জন্য ২৫০০০ টাকা দিয়া গেলাম। শেষ কথা এই যে, প্রভুভক্ত কালীচরণ তাহার এই বৃদ্ধ বয়সে যাতে সুখে থাকে, সেই জন্য ৫০০০ টাকা তাকে দিয়েছি। বেশী কথা বলতে পারছি না। এই নাও পৈতা থেকে চাবিটা খুলে নিজের কাছে রেখে দাও। এই আলমারীর ডুপ্লিকেট চাবী স্বামীজির নিকট আছে। তিনিও বোধ হয় আজ আসবেন।"

বৃদ্ধ রসময়ের কথাগুলি শুনিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র শিহরিয়া উঠিল। চারিদিক যেন অন্ধকার দেখিতে লাগিল। তাহার মস্তক ঘুরিয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল কোথা রাজরাজেশ্বর—আর কোথায় আমি পরান্ন-প্রতিপালিত ঘৃণিত কুক্কুর? এও কি সম্ভব?

রসময় কথা গুলি বলিয়া একটু নিস্তব্ধ রহিলেন। ক্ষিতীশের আর সবুর সয় না। কই—পিতার যজ্ঞোপবীতসংলগ্ন চাবী কই?

সে একবার পিতার প্রতি দৃষ্টি করে—আবার পরক্ষণেই গৃহ-কপাট প্রতি লক্ষ্য করে। ঐ বুঝি রবীন্দ্র আসিয়া পড়িল। ঐ বুঝি সর্ব্বনাশ ঘটিল। সব বুঝি যায়। বৃদ্ধ রসময়কে তথাপি নীরব দেখিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র অগত্যা কৃত্রিমস্বরে বলিল—"কই? চাবি দিন।"

ক্ষিতীশের কথা শুনিয়া বৃদ্ধের চটক ভাঙ্গিল। উত্তরে বলিলেন—"হাঁ, এই নাও বাবা!" পরে পৈতাসহ চাবিটি ক্ষিতিশের হাতে দিলেন। ক্ষিতীশ চাবি খুলিয়া লইল।

বৃদ্ধ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "চাবি পেয়েছ?"

ক্ষিতীশ উত্তর করিল—"হু।"

রস—আলমারী খুলে আগে উইল দুখানি নিজের হস্তগত করে রাখ। কা'কেও উপস্থিত জানতে দিও না। পরে স্বামীজির সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ ক'রো।

"যে আজ্ঞা" এই বলিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র উইল দুইখানি বাহির করিয়া নিজের জামার পকেটে রাখিল। পরে পিতাকে বলিল—হাঁ পেয়েছি।

রস—কাছে এস।

ক্ষিতীশ পিতার নিকটে গেল। রসময় রবি ভ্রমে ক্ষিতীশের শিরে পুনরায় হাত দিয়া বলিলেন—

"বেঁচে থাক বাবা! সুখে থাক। এইবার আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারবো আঃ—! আঃ! নারায়ণ! নারায়ণ!

বৃদ্ধের দৃষ্টি উর্দ্ধে উঠিল। মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ পাইল। ক্ষিতীশচন্দ্র তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিজের বৈঠকখানা ঘরের ড্রয়ারের মধ্যে উইল দুইখানি দ্রুত রাখিয়া গৃহটির চাবি বন্ধ করিয়া দিয়া আবার পিতৃসমীপে আসিল। আসিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—

"বাবা! বাবা!" সব নিস্তব্ধ! রসময় আর ইহজগতে নাই। তাঁহার প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়াছে।

সহসা গৃহ কপাট খুলিয়া গেল। গৃহমধ্যে যুবক রবীন্দ্র কালীচরণের সহিত দ্রুতপদ বিক্ষেপে প্রবেশ পূর্ব্বক পিতৃপদপ্রান্তে লুটাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"বাবা! বাবা! শেষ দেখা হলো না। প্রাণে বড় আক্ষেপ র'য়ে গেল—একটি কথা

কইতে পারলাম না। আমি বড় অভাগা। আমি বড়ই মহাপাপী।"

ক্ষিতীশচন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল-"দাদা! দাদা! আজ সকাল থেকে বাবা তোমার জন্য বড়ই কাতর হয়ে ছিলেন। একবার দেখা ক'রে দুটো কথা বলবার বড় ইচ্ছা ছিল। তা হলো না। এ আক্ষেপ ম'লেও যাবে না, ভাই!"

দেখিতে দেখিতে গৃহখানি লোকে লোকারণ্য হইল। আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব যে যেখানে ছিলেন সকলেই আসিয়া সমবেত হইলেন। আত্মীয় স্বজনেরা ক্ষিতীশচন্দ্র ও সৌদামিনীকে শান্ত করিবার জন্য প্রয়াস পাইলেন। রবীন্দ্রের দিকে কাহারও বিশেষ লক্ষ্য পড়িল না। সে ত উত্তরাধিকারী সূত্রে পিতার অগাধ বিষয়ের মালিক হয় নাই। কালীচরণ নীরবে মৃতদেহের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল। আর তাহার দুই নেত্র হইতে শতধারে অশ্রু ঝরিতে ছিল। কিছুক্ষণ পরে সৎকারের ব্যবস্থা হইল। এই সময় রবীন্দ্র একবার ক্ষিতীশকে জিজ্ঞাসা করিল—"ভাই! বাবা যে আমার সঙ্গে দেখা করবেন বলে আকিঞ্চন করেছিলেন তা তোমাকে কিছু বলতে বলেছেন কি?"

ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে ক্ষিতীশ বলিল—"না দাদা! তিনি তোমার সম্বন্ধে আমায় কিছু বলেন নাই। শুধু জিজ্ঞাসা করছিলেন যে রবি এসেছে কিনা—রবির সঙ্গে দেখা হ'লো না—দুটো কথা ছিল।"

"আমি বড় হতভাগ্য। আমি মহাপাপী।"—এই বলিয়া রবীন্দ্র কাঁদিতে লাগিল।

সত্বরই অতি জাঁকজমকের সহিত গ্রামবাসী ও স্বজন পরি-বেষ্টিত রসময়ের মৃতদেহ শ্মশান ভূমিতে আনীত হইল। বৈকালের মধ্যে রসময়ের ইহ জগতে আর কোন চিহ্নই রহিল না। ক্ষিতীশের প্রধান কণ্টক শ্মশান বহ্নিতে ভষ্মীভূত হইয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রসময়ের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাধা হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যা ৭টা। ক্ষিতীশচন্দ্র নিজ বৈঠকখানা ঘরে একাকী প্রবেশ পূর্ব্বক দরজায় অর্গল আবদ্ধ করিয়া নিজ চেয়ারে আসিয়া বসিল। সম্মুখস্থ টেবিলের উপর উজ্জ্বল দীপ প্রজ্বলিত। সমস্ত বাটীটি নিস্তব্ধ। একটা গাঢ় শোকচ্ছায়া যেন চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে। ক্ষিতীশচন্দ্র নিজ আসন গ্রহণ করিয়া গৃহটির চারিদিক বেশ ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল। তারপর টেবিলের ড্রয়ারটি খুলিয়া দুই খানি উইল বাহির করিল। প্রথম উইল খানি সে পূর্ব্বেই পাঠ করিয়াছিল। সে খানি আর পাঠ করিবার আবশ্যক বিবেচনা করিল না। উহা একখানি বড় খামের মধ্যে যেমন ছিল তেমনি রাখিল। তাহার পর শেষের অর্থাৎ দ্বিতীয় উইল খানি খামের মধ্য হইতে বাহির করিয়া নিবিষ্ট চিত্তে উহা পাঠ করিতে লাগিল। একবার—দুইবার—তিনবার পড়িল। প্রথম বার পাঠে ক্ষিতীশের হৃদয়ে উত্তেজনার উদয় হইল, দ্বিতীয় বার পাঠে রোষ ও তৃতীয়বার পাঠে অধরে বিদ্রূপের মৃদু হাসি দেখা দিল। সে রবীন্দ্রকে উদ্দেশ পূর্ব্বক মনে মনে কহিল—"নরাধম পিশাচ রবীন্দ্র! জারজ ঘৃণিত কুকুর! তোর এত সৌভাগ্য? তুই এই অগাধ সম্পত্তির মালিক হবি? আর আমি? আমি তোর উচ্ছিষ্ট প্রত্যাশী—অনুগ্রহের কাঙ্গাল

হয়ে দিন কাটাব? তুই রাজ-রাজেশ্বর হবি—আর আমি তোর করুণায় ভিখারী হয়ে কীটানুকীটের মত এক পার্শ্বে পড়ে থাকবো? এও কি সম্ভব? তা হয় না—তা হতে পারে না। তোর জন্ম দুঃখ ভোগ করবার জন্যে—আর আমার জন্ম সুখ ভোগ করবার জন্যে। এ বিষয় বিভব, সম্মান, পদ গৌরব সমস্তই আমার। তোকে এক পয়সা দিব না—এক কপর্দ্দকও না। ওঃ ধর্ম্ম রক্ষা করেছেন। আর তিন চার মিনিট দেরী হলে সব ফস্‌কে গিয়েছিল আর কি? কি বুদ্ধিই খাটিয়েছিলাম! এখন রবীন্দ্র কি করবে?—" ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া দ্বিতীয় উইল খানি বজ্রমুষ্টিতে ধারণ পূর্ব্বক আবার কহিতে লাগিল—"তুই আমার অমঙ্গল! তুই আমার ভাগ্য বিধ্বংসী প্রলয়! তুই আমার বিভীষিকা! তোকে ইহ জগতে আর এক মুহূর্ত্তও রাখবো না"—এ সংসারে তোর চিহ্ন মাত্রও থাকবে না। এই বলিয়া ক্ষিতীশ উইল খানি প্রদীপ্ত চিমনীর মুখে ধারিল। যেমন ধরিয়াছে অমনি বাহিরের দিকের খড় খড়িতে দুই তিনটি সবল আঘাতের শব্দ হইল। ক্ষিতীশচন্দ্র চমকিয়া উঠিল। তাঁহার বুক দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল, আর অমনি হস্তস্থিত উইলখানি খসিয়া ভূমি তলে পড়িয়া গেল। ভয়-বিচলিত নেত্রে খড়খড়ির দিকে চাহিয়া দেখে কে যেন তাহার অপেক্ষায় বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। ক্ষিপ্র গতিতে ভূতলে পতিত উইল খানি পুনরায় ড্রয়ার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া উহা বন্ধ করিয়া দিল। এমন সময় বাহির হইতে শব্দ হইল—

"খোল। শীঘ্র দরজা খোল।"

কণ্ঠস্বর ক্ষিতীশের পরিচিত। তথাপি সঠিক জানিবার জন্য সে কপাটের নিকট উঠিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কে? কে ডাকে?"

উত্তর—"আমায় চিনতে পারছ না? আমি যে তোমার বিজলী।"

এমন একটা মহৎ ও শুভ কার্য্যে বাধা পড়িল দেখিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইল বটে, তবে বিজলী আসিয়াছে দেখিয়া তাহার ধড়ে প্রাণ আসিল। সে তৎক্ষণাৎ বিজলীকে আধ খানা দরজা খুলিয়া দিয়া মাত্র প্রবেশের পথ দিল ও সে প্রবেশ করিলে পরই আস্তে আস্তে দরজাটির অর্গল আবদ্ধ করিয়া দিল। মনের চাঞ্চল্য ও বিরক্তি ভাব গোপন করিয়া বিজলীকে উদ্দেশ্যপূর্ব্বক ক্ষিতীশ কহিল—

"অসময়ে হঠাৎ আজ কি মনে করে বিজলি! এমন ত এক দিনও হয় নি।"

বি—"এর চেয়ে কি আর শুভদিন হবে প্রিয়তম? আজ তোমার যে দিন উপস্থিত হয়েছে, এমন দিন অতি ভাগ্যবান না হলে কাহারও আসে না।"

একটু মৃদু হাসিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র উত্তর দিল—"তাহলে তুমি সব শুনেছ?"

বি—"শুনিনি? তোমার রোজের খবর আমি রাখি। তুমি বড়লোক তোমার কত কায, কত বন্ধু, কত ফুর্ত্তি; তুমি সব সময়ে হয়ত আমাকে মনে না রাখতে পার, কিন্তু তুমিই যে আমার সব; দিন রাত আমি তোমারি ধ্যান নিয়ে আছি।"

উত্তর শুনিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র বিশেষ পুলকিত হইল। নিকটস্থ চেয়ারে বিজলীকে বসাইয়া সোহাগভরে তাহার চিবুক ধরিয়া বলিল—

"হৃদয়েশ্বরি! যতই কাজে ব্যস্ত থাকি না কেন—তোমার প্রেমই আমার লক্ষ্য। যখনই যেখানে থাকি না কেন, প্রাণটা তোমারই চরণ প্রান্তে লুটিয়ে পড়ে থাকে"—এই বলিয়া বিজলীকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক ক্ষিতীশ তাহার অধরে একটি চুম্বন করিল।

বিজলী বিশেষ কোন ভাবান্তর দেখাইল না। ক্ষণেক নীরব থাকিয়া ক্ষিতীশের কার্য্য কলাপ লক্ষ্য করিতে লাগিল। ক্ষিতীশের ভুজপাশ হইতে দেহকে মুক্ত করিয়া বিজলী বলিল—

"আচ্ছা ভাই এইবার দেখা যাবে—কার প্রেম, কার ভালবাসা বেশী।"

ক্ষি—"বেশত—পরীক্ষা হো'ক না।"

সেইরূপ গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া বিজলী বলিল—"মনে আছে ক্ষিতীশ—কি ব'লে আমাকে কুলের বার করেছ? বাবা তারকেশ্বরের মাথায় হাত দিয়ে কি শপথ করেছ—তা মনে আছে ত?"

ক্ষি—"ও কথা আবার তুমি স্মরণ করিয়ে দিবে কি? সে ত আমার দিবা রাত্র ধ্যান ও জপ।"

বি—"শুনে সুখী হলাম। তুমি বলেছিলে যে—যেদিন তোমার শুভদিন উদয় হবে, সেই দিনই আমাকে বিবাহ করবে; এ কথা মনে আছে কি?"

ক্ষি—"মনে নাই আবার?"

বি—"আজই ত তোমার সেই শুভদিন উপস্থিত।

ক্ষি—"কথাটা অনেকটা ঠিক বটে। তবে একটু সবুর করতে হবে ভাই! আগে শ্রাদ্ধাদি সব চুকে যাক। বাবার উইলের প্রবেট নিয়ে বিষয় গুলি হাত করে নিই। তবে না নিশ্চিন্ত হয়ে—যা বলবে তাই করবো। তুমি যা বললে সে ত আমি করতে বাধ্য—ধর্ম্মতঃ লোকতঃ করতে বাধ্য। যাক্, সে সব কথা আজ থাক—আজ বড় বিশ্রী দিন। বিনা আহ্বানে তুমি এসেছ, অথচ ছুটো যে ফূর্ত্তি করে তোমায় বুকে নিয়ে রাতটা কাটাব তার যো নাই।"

বিজলীর প্রাণে তখন একটা গুরুভার রহিয়াছে। মনে হয় যেন কতরকম দুশ্চিন্তায় সে কাতর। কাযেই আমোদ প্রমোদের কথা উত্থাপিত হইবার পর বিজলী বলিল—"ছিঃ! এই অশৌচের সময় ফূর্ত্তি আমোদ করতে নেই। আমি সেজন্য আসি নাই। তোমাকে তোমার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছি।"

ক্ষি—"ও গুলা সব ভট্‌চায্‌ বেটাদের বুজরুকি। বাবা ম'রে স্বর্গে গেলেন—এর চেয়ে আর আনন্দের বিষয় কি আছে? এতে ত ফুর্ত্তি করাই উচিত। তা নয়—মদ খাবার যো নাই—মেয়ে মানুষ নিয়ে আমোদ করার যো নাই—এ একটা মহা উৎপাত।"

বি—"যাক; ১০।১২ দিনে আর কি আসে যায়?"

ক্ষি—"আসে যায় না কি? এই মেঘ না চাইতে যে জল এসে

পড়েছে, অথচ বুক ফাটা চেষ্টা এতে—এ জল না খেয়ে কি ছাড়তে ইচ্ছা করে ?"

বি—তোমার শপথ রেখো—আমোদ ত আছেই। বাল বিধবাকে তুমি যে প্রলোভনে কুলের বার করেছ, সে কথার যেন অমর্য্যাদা না হয়।"

ক্ষি—"ছি! ছি! তুমি আমায় মিছে সন্দেহ কর কেন ?"

বি—"সন্দেহ করি সাধে ক্ষিতীশ! ভেবে দেখ আমার সঙ্গে কত বেইমানি করছ ? আমায় পিঁজরে পূরে কত অত্যাচার না করছ—বেইমান!"

ক্ষি—"অত্যাচার ?"

বি—"নিশ্চয়ই! তোমার জন্য আমার বুক ফেটে যাচ্ছে—আর তুমি কলিকাতায় গিয়ে নিজে আমোদ প্রমোদে দিন কাটাচ্ছ। আমি কি কিছু শুনিনি ? তোমার কীর্ত্তি কলাপ জানি না ?"

ক্ষি—"ও সব বাজে কথা। দুষ্ট শত্রুরা রটিয়েছে নিশ্চয়, ওসব বিশ্বাস ক'রো না।"

বি—"হাঁ—আমি ও সব অবিশ্বাস করবো—যেদিন তুমি ব্রাহ্মমতে আমায় বিবাহ করবে।"

কপটতার সহিত ক্ষিতীশ উত্তর করিল—"বেশত। তার ত আর দেরী নাই গো ?"

বি—"আচ্ছা—তবে আজ বিদায় হই—বিরক্ত করলুম—যেন রাগ করো না।"

"ওরে আমার সোণারে! বিরক্ত ? বিরক্ত বলো না

এতে আমার মনে বড় কষ্ট হয়। এই শোকের দিনে তোমাকে বুকে নিলে আমার যে কত শান্তি তা কি করে জানবে।” এই বলিয়া আবার একটি গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক ক্ষিতীশচন্দ্র বিজলীর গণ্ডে চুম্বন করিল।

বিজলী বিদায় লইবার অভিপ্রায়ে চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। রাত্রি গভীর হইয়াছে ও চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার দেখিয়া বিজলী ক্ষিতীশকে বলিল—“দেখ, আমার একা যেতে বড় ভয় হচ্ছে। তুমি ষ্টেশন অবধি যদি আমায় সঙ্গে নিয়ে পৌঁছিয়ে দাও তাহলে বড় উপকার হয়।”

ক্ষি—“একা ট্রেণে যেতে পারবে ত?”

বি—“তা না গেলে কে আর সঙ্গে যাচ্ছে বল? তুমি ত আজ যেতে পারবে না?”

ক্ষি—“না—তাত পারি না।”

বি—“তবে একাই যাবো, একটা ষ্টেশন ত যাবো—তাতে আর ভয় কি? আর চাকর এসে আমার জন্য আলো নিয়ে অপেক্ষা করবে। তুমি শুধু এখানকার ষ্টেশন অবধি আমার সঙ্গে চল।”

অধিকক্ষণ বিজলীকে গৃহ মধ্যে রাখিলে জানাজানির সম্ভাবনা, সেই জন্য তাহাকে শীঘ্র বিদায় দেওয়া ক্ষিতীশেরও উদ্দেশ্য। কারণ এখনও তাহার আসল কার্য্যটি বাকি আছে। তাহার জন্য মনও চঞ্চল। অগত্যা বিজলীরূপ গলগ্রহটিকে দূর করিবার মানসে ক্ষিতীশ বলিল—“আচ্ছা। অপেক্ষা কর। আমি এক খানা

আলোয়ান ওবর থেকে গায়ে দিয়ে আসি"—এই বলিয়া সে সেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

বিজলী প্রথমে আসিয়া কপাটে আঘাত করিবার পূর্ব্বে আস্তে আস্তে খড় খড়ির পাখি খুলিয়া সার্সির কাঁচের ভিতর দিয়া গৃহা-ভ্যন্তরে ক্ষিতীশ দ্বিতীয় উইল পত্র লইয়া যাহা যাহা করিতে-ছিল তাহা সমস্তই দেখিয়াছিল। বিজলীর প্রথম ধারণা হইয়াছিল যে, উইলখানি বোধ হয় অন্য কোন বিলাসিনীর প্রেমপত্র—নাগর ক্ষিতীশের উদ্দেশ্যে নিশ্চয় লিখিত হইয়াছে। ক্ষিতীশ উহা দুই তিন বার পাঠ করিয়া পাছে কাহারও হস্তগত হয় এই ভয়ে চিমনীর আগুনে জ্বালাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিতেছে। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কপাটে শব্দ করিয়া বিজলী তাহার পত্রদাহকার্য্যে বাধা দিয়াছিল। বিজলীর প্রাণে একটা ঘোর ঈর্ষ্যার ভাব উদিত হইয়াছিল—এ কথা উল্লেখ করাই বাহুল্য মাত্র। তবে সেই পত্রে কি লেখা আছে ও লেখিকা নব প্রণয়িনী যে কে, তাহা জানিবার জন্য সে বিশেষ কৌতূহলাক্রান্ত হয়। ক্ষিতীশচন্দ্র যেই দ্রুতপদে শাল আনিতে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল, বিজলী সুন্দরী সেই অবসরে আস্তে আস্তে ড্রয়ারটি খুলিয়া ক্ষিতীশের গোপনীয় প্রেম-পত্র ভাবিয়া স্বর্গীয় রসময়ের দ্বিতীয় উইলখানি চুরি করিয়া নিজের কাপড়ের কসিতে উত্তমরূপে গুঁজিয়া রাখিল। ক্ষিতীশ এ বিষয় কিছু জানিল না এবং তাঁহার মনে এ বিষয়ে কোন সংশয়ও উপস্থিত হইল না। বিজলী যে তাহার উইল পাঠ গোপনে লক্ষ্য করিয়াছে, ইহা ক্ষিতীশ কল্পনায় আনিতে পারে নাই। ক্ষিতীশচন্দ্র

তত্ত্বরই একখানি শাল গায়ে দিয়া গৃহ মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিল। আসিয়া দেখে, যে বিজলী যথাস্থানে নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। একবার ভাবিল যে, ড্রয়ারটি খুলিয়া উইলটি যথাস্থানে আছে কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখে। আবার মনে মনে ভয় পাইল, পাছে বিজলী উহা দেখিতে পায় এবং দ্বিতীয় উইলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইঙ্গিতেও কিছু জানিতে পারে। আরও বিশেষ ভয় পাইল, যদি উইলখানি দেখিয়া উহার মর্ম্ম বিজলী শুনিতে চায় তবে হিতে বিপরীত হইবার সম্ভাবনা। ক্ষিতীশের উদ্দেশ্য এই যে, জগতের দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি যেন উইলের কথা না জানিতে পারে। এজন্য অধিক কিছু করিতে পারিল না। কেবল ড্রয়ারটিতে চাবী দিয়া বাহিরের দরজা খুলিল। উভয়ে গৃহ হইতে বাহির হইল, এবং ভৃত্যকে দরজায় চাবি বন্ধ করিবার আদেশ দিয়া বিজলীকে লইয়া অতি সন্তর্পণে ও সংগোপনে ষ্টেশন অভিমুখে চলিয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

জ্যোতীর্ম্ময়ীর বিপদের কথা শুনিয়া তাহার সখী সুহাসিনী কলিকাতায় তাহাকে দেখিতে আসিয়াছে। রবীন্দ্র খুলনায় চলিয়া যাওয়াতে জ্যোতীর্ম্ময়ী বড়ই দুঃখিত ও কাতর হইয়াছিল। এই প্রবাসে সদা সর্ব্বদা রবীন্দ্রের সহিত কথাবার্ত্তায় গল্প গুজবে দিনটা এক রকম বেশ কাটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু তাহার কলিকাতা পরিত্যাগের পর জ্যোতীর্ম্ময়ীর প্রাণটা যেন উদাস হইয়া গেল। ঠিক সেই সময়েই সুহাসিনী আসাতে জ্যোতীর্ম্ময়ীর একজন সঙ্গিনী মিলিল। সে বড় সন্তুষ্ট হইল। রবীন্দ্র পরীক্ষা দিয়াই গতরাত্রের ট্রেণে খুলনায় গিয়াছে। আর আজ প্রাতে সুহাসিনী কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত। মধ্যাহ্নে আহারাদি শেষ করিয়া দুই সখীতে নির্জ্জনে কত কথা হইতেছিল। আত্মীয় স্বজনের সম্বন্ধে কথা হইল। তাহার পর সাংসারিক কথা হইল। শেষে কলিকাতার জোড়াবাগানে জ্যোতির্ম্ময়ী যে বিপদে পড়িয়াছিল ও যেরূপ অভাবনীয় উপায়ে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিল, সেই সমস্ত প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল।

সু—"আচ্ছা—যখন তোর ঘরে আগুন লাগে, তখন কি তোর বেশ জ্ঞান ছিল না?"

জ্যোতী—"আমার কি জ্ঞান থাকবে ভাই! আমি ১০ টার

পর খাওয়া দাওয়া করে উপরে গিয়ে শুয়েছি, খানিক পরেই অগাধে ঘুমিয়ে পড়ি।"

সু—"তারপর কি করে জানতে পারলি? আর কখন জানতে পারলি যে, ঘরে আগুন লেগেছে?"

জ্যোতী—"কখন ঘরে আগুন লাগে তা আমি কিছু জানতে পারিনি। যখন আমার পাশের ঘরটা হুড়মুড় শব্দে পড়ে যায়, তখন আমার ঘুম ভাঙ্গে, আর তখন দেখি যে, আমি যে ঘরে শুয়ে আছি তার ঠিক অপর দিকের জানালা দরজা ও কাড়কাঠ ধূ ধূ করে জ্বলছে। দেখেই ত প্রাণ উড়ে গেল, সেই দিকেই ঘর থেকে বাহিরে যাবার পথ কি না।"

সু—"সর্ব্বনাশ। তারপর তুই কি করলি?"

জ্যো—"খুব চেঁচাতে লাগলাম। দাদা মশাইকে ডাকতে লাগলাম।"

সু—"তারপর?"

জ্যো—"তারপর যখন কেউ এল না—আর ঘর থেকে বা'র হওয়া ও অসম্ভব বলে বোধ হতে লাগলো—তখন আমার মাথা ঘুরতে লাগলো। গায়ে তাত লাগতে, লাগল কিন্তু বিছানা ছেড়ে এগিয়ে যেতে সাহস হলনা। প্রাণটার মধ্যে কেমন ধড়ফড় করতে লাগলো। ক্রমে হতাশ হয়ে আসন্ন মৃত্যুর মুখ পানে চেয়ে পড়ে রইলাম। বেশীক্ষণ চুপ করে থাকতে পারলুম না, আবার চেঁচাতে লাগলাম; দাদা মশাইকে ডাকতে লাগলাম, রবিদাকে ডাকতে লাগলাম। আবার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপতে লাগলো; যখন কেউ এলো

না, তখন কাঁদতে কাঁদতে যেন অজ্ঞানের মত হয়ে যেতে লাগলাম।"

সু—"তার পর? তার পর?"

জ্যো—"তার পর ভাই এক আশ্চার্য্য ঘটনা! তখনও আমার ঠিক জ্ঞান আছে—কিন্তু আর চেঁচাতে বা কথা কইতে পাচ্ছি না; আমার মনে হলো, যেন রবি দা' এসে ব'ল্লে—"জ্যোতি! জ্যোতি! 'ভয় নেই; আমি এসেছি আমি তোমাকে বাঁচাব। ভয় নেই—একটু সাহস দেখাও।"

সু—"তখন তুই কি করলি?

জ্যো—"আমার তখন আর কথা বলবার ক্ষমতা ছিল না—মাথা ঘুরছিল—কেমন জ্ঞান হারাচ্ছিলাম। আমি তার কথার উত্তর দেবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছু বলতে পারলাম না। তারপর আমার জ্ঞান ছিল না। যখন আমার জ্ঞান হলো, তখন দেখি, একটা অজানা জায়গায়—অচেনা ঘরে আমি শুয়ে আছি—আর রবিদা আমার সেবা করছে।"

সু—"আচ্ছা যে তোকে বাঁচালে সে কে? সে কি রবি দা?"

জ্যো—"রবিদা ত তা স্বীকার করে না। শুনলাম, কে একজন সন্ন্যাসী আমাকে ঐ আগুনের ভিতর থেকে বা'র করে এনেছেন।"

সু—"যা হোক ভাই, যে বাঁচালে তার সাহস খুব।"

জ্যো—সাহস নয়? মানুষ পরের জন্য এতটা করতে পারে তা আগে আমি জানতাম না।"

সু—“নিশ্চয়ই সে মানুষ নয়, সে দেবতা। আচ্ছা, তুই রবিদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলি?”

জ্যো—“কতবার। প্রথম বার যখন তাকে জিজ্ঞাসা করি তখন সে শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললে—আমি কি করে তোমায় বাঁচালাম। আমি তখন কাশী থেকে কলিকাতায় এসে পৌঁছাই নাই। তখনও আমি ট্রেণে।”

সু—“তবে সে কে? এ বিপদে ঝাঁপ দিয়ে তোকে বাঁচাতে গেল—সে কে ভাই?”

জ্যো—“দাদা মহাশয় বলছিলেন যে সন্ন্যাসী ঐ বিপদে আমায় বাঁচিয়েছে তার সন্ধান যেমন ক’রে হোক—আর যত দিনে হোক নিতেই হবে।”

সু—“এ খবর বা’র করা এখন বড় কঠিন। আর সে খবর নিয়েই বা কি হবে?”

জ্যো—নিয়ে কি হবে? কি বলিস? নিজের প্রাণের মমতা ত্যাগ করে যে পরের জন্য এত বড় বিপদ মাথা পেতে নিতে পারে সে দেবতাকে দেখবার ইচ্ছা হয় বই কি?

সু—শুধু দেখবার ইচ্ছা, না তা ছাড়া আর কিছু মতলব আছে?

জ্যো—“আবার কি মতলব থাকতে পারে?”

সু—“না তাই জিজ্ঞাসা করছি।”

জ্যোতি ঈষৎ কুপিত হইয়া বলিল, “তোর সব কথাতেই একটু ঠোকর মারা চাই।”

সু। “ওলো ঠোকর নয়—মনে করেছিলাম বুঝি সেই

সন্ন্যাসীর সন্ধান নিয়ে তার সঙ্গে যৌবনে যোগিনী সেজে বৈরাগ্য অবলম্বন করবি।"

জ্যো—"য', তোর সব বিষয়েই ঠাট্টা! শুধু শুধু যোগিনী সাজতে যাব কেন?"

সু—"যাবি কেন তা তোকে কি বোঝাব? মনের দুঃখে! এমন লক্ষ্মী ঠাকৃরুণের মত চেহারা—এমন ঢলঢলে যৌবন—এসব কি মাঠে মারা যাবে লো? একজনের হাতে তুলে দিতে হবে ত? তা সে সন্ন্যাসীই হোক, আর গৃহীই হোক। গৃহী আর যখন পাওয়া গেল না তখন সন্ন্যাসী; সন্ন্যাসীই সই।"

জ্যো—"তোর কথার মাথাও নেই—মুণ্ডুও নেই।"

সু—"ওলো, মাথামুণ্ডু আমার সবই ঠিক আছে। ভাল করে দ্যাখ—তোরই মাথার ঠিক নেই—যাবার দাখিল হয়েছে। আহা, তা ত যাবারই কথা—এদিকে যে পনর পার হলো। আর কি মাথা ঠিক থাকে, না ঠিক থাকলে ভাল দেখায়? যাক্ আর বেশী ভাবতে হবে না, দাদা মশাই ওদিকে ঘটক্ লাগিয়েছেন।"

ঘটকের কথা শুনিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী যেন কতকটা বিচলিত হইল। তাই উত্তরে বলিল—"কে বললে?"

সু—"আমার শ্বশুর বাড়ীর কাছে তাঁর আলাপী একজন ভাল ঘটক আছে—সেই ঘটককে লাগিয়েছেন; আমি ওঁর মুখে শুনেছি। উনি বলে পাঠিয়েছেন, তোমার সখীকে ভাবতে বারণ কোরো—তার দুঃখের নিশা অবসান শীঘ্রই হবে।"

জ্যোতী ভাবিল "কথাটা সত্য?" আমি ত এ সব কিছু জানি

না। ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল—"তুই আমার একটী উপকার করবি?"

সু—"কি, যাতে এই মাসেই বিয়ে হয় তার ব্যবস্থা করবো?"

জ্যো—"ছেলে মানুষি করিস্ না-শ্যামসুন্দরকে একখানা চিঠি পাঠিয়ে বারণ করে দে যেন তিনি ঘটক না লাগান। দোহাই তোর! তোর পায়ে পড়ি। ঘটককে আমি না হয় কিছু টাকা পাঠিয়ে দিতে রাজি আছি।"

সু—"অবাক করলি—তুই কি চিরকাল মিসিবাবা থাকবি না কি?"

জ্যো—"তা জানি না। তুই ঘটক লাগাতে বারণ কর।"

সু—"কেন? কেন? এখানেও কি তোদের কলিকাতার হাওয়া লাগল নাকি? ধেড়ে ধেড়ে চার ছেলের মায়ের বয়সী মেয়েরা যেমন নিজে পছন্দ করে দেখে শুনে বিয়ে করে, তুইও বুঝি সেই রকম দেখে শুনে বিয়ে করবার মতলবে ফিরছিস্।"

জ্যো—"তোর যেন সব বিষয়েই ঠাট্টা।"

সু—"তবে তোর ভিতরে কিছু গলদ আছে ভাই?"

একটু বিস্মিত হইয়া জ্যোতি বলিল—"গলদ আবার কি? মুখে আগুন তোমার।"

সু—"আমার ত মুখে আগুন কিন্তু এখন আসল কথাটা বল দেখি। আমায় যদি সব খুলে খেলে বলিস তবেই আমি ঘটককে বারণ করে দিতে পারি ও তোরও একটা হিল্লে লাগিয়ে দিতে পারি।"

জ্যো—"খোলাখুলি আবার কি? কি গোপন করেছি যে খুলে বলতে হবে?"

সু—"আমার কাছে লুকুবি কি? আমার চোখে ধুলা দেওয়া তোর সাধ্যি নয়। তবে আমি হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙ্গবো নাকি?"

জ্যোতির বুকটা গুরু গুরু করিতে লাগিল। চোর বুঝি ধরা পড়িল। তবু কৃত্রিম সাহস দেখাইয়া উত্তর করিল—"কি বলবি—বলনা?"

সু—"বলি? তবে হাঁড়ি ভাঙ্গি—রাগ করিস্ না যেন?"

জ্যো—"ভাঙ্গ না। অত মুখ সাপাটি কিসের? কি জানিস্ বল না?"

সু। "কি বলবো জ্যোতি। তোকে দেখলে আমার প্রাণটা সত্যিই কেঁদে উঠে। তোর বাসনা পূর্ণ হওয়া বড় কঠিন বলে মনে হয়। অনেক বাধা লো—অনেক বাধা। সে বাধা ঠেলে ফেলে দাদামশাই যে বিয়ে দিবেন এমন ত বোধ হয় না।"

জ্যোতির বড় বড় চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া গেল।

সুহাসিনী সমস্তই লক্ষ্য করিল। বন্ধুর হৃদয়ের ব্যথা বুঝিতে পারিয়া মনে বড়ই কষ্ট অনুভব করিল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সুহাসিনী পুনরায় বলিল—"ওসব কল্পনা ছেড়ে দে ভাই—যা হবে না, তা নিয়ে কেন প্রাণে কষ্ট পাস্. দিদি! স্মৃতি থেকে তার মূর্ত্তি সরিয়ে দে—এখনও বুঝে চল এখনও সময় আছে।"

কথাগুলি শুনিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী ক্ষণেক নিস্তব্ধ রহিল। সে

মনে মনে ভাবিতে লাগিল—"যার ধ্যানে সুখ—যাকে দেখলে আনন্দ—দেবতার ন্যায় যে ধার্ম্মিক ও প্রেমিক—সে মুর্ত্তি হৃদয় থেকে তাড়িয়ে দেওয়া কি এত সহজ? সে চিত্র মুছে ফেলা কি মুখের কথা? এতে যদি আত্মহত্যা করতে হয় সেও ভাল। তবু সেই স্মৃতি নিয়েই মরতে পারব ত।" ভরা গাঙ্গে বান ডাকিল। টস্‌টস্‌ করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর চক্ষু হইতে জল ঝরিতে লাগিল।

এমন সময় জ্যোতির দাদামশাই একখানি টেলিগ্রাম হাতে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন—"শুনেছ জ্যোতি!"

দুই সখীতে ব্যস্তভাবে নিজেদের কথাবার্ত্তা চাপা দিল। জ্যোতীর্ম্ময়ী সন্তর্পণে চক্ষু মুছিয়া দাদা মহাশয়কে বলিল—"কি বলছ, দাদা মশাই!"

দা—"রবির কাছ থেকে তার এসেছে। আহা, এত কোরেও শেষ সময়ে তার বাপের সঙ্গে দেখা হয় নি। সে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই রসময় বাবু ইহ সংসার ত্যাগ করে গেছেন!"

কথা শুনিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী হৃদয়ে একটা ভীষণ আঘাত লাগিল। দুঃখিতভাবে উত্তর করিল—"এত করেও দেখা হলো না?"

দা—"না, দেখা হয় নি। দেখা হলে ছোঁড়ার বোধ হয় ভাল হতো। যাক সকলই তাঁর ইচ্ছা।"

জ্যোতী কোন উত্তর করিল না। শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেই গৃহ পরিত্যাগ করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ক্ষিতীশচন্দ্র ষ্টেশন হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখে যে, স্বামীজি ও তাঁহার দুইতিন জন শিষ্য ও কলিকাতাস্থিত দুইচারি জন আত্মীয় তাহার বাটিতে অতিথি স্বরূপ আশ্রয় লইয়াছেন। তাঁহাদের উপযুক্ত স্থান দিবার জন্য ক্ষিতীশচন্দ্রের বৈঠকখানা ঘরটি খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

তাহার বৈঠকখানা ঘরটি কতকগুলি আগন্তুক কর্তৃক এইরূপ ভাবে অধিকৃত হইয়াছে দেখিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র মনে মনে কিছু বিরক্ত হইল, কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলিল না। সকলের সহিত মৌখিক ভদ্রতা দেখাইতেও ত্রুটি করিল না। পরে স্বামীজির সহিত বিনীত ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। স্বামীজিও রসময়ের মৃত্যুতে বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছেন এবং তাঁহার সহিত শেষ সাক্ষাৎ হইল না—এই কারণ বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন তাহাও প্রকাশ করিলেন। অন্যান্য দু'চারটি কথার পর রবীন্দ্রনাথ তথায় উপস্থিত হইল। রবীন্দ্রনাথ স্বামিজীর কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া একটু দূরে উপবেশন করিল; অশৌচের জন্য স্বামিজীর পদধূলি গ্রহণ করা হইল না। ইত্যবসরে ক্ষিতীশচন্দ্র নিজের টেবিলের ড্রয়ারটি খুলিয়া উইল দুইখানি যথাস্থানে আছে কি না দেখিবার চেষ্টা করিল। প্রথম উইলখানি রহিয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয়খানি নাই দেখিয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। সে এক

একটি করিয়া টেবিলের যতগুলি ড্রয়ার ছিল সমস্তগুলি খুলিল ও তন্ন তন্ন করিয়া কাগজপত্র উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। কিন্তু কোথাও দ্বিতীয় উইলখানি খুজিয়া পাওয়া গেল না। তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিল—"আমি কি উইলখানি সঙ্গে লইয়া ষ্টেশনে গিয়াছিলাম? কই এমন ত বোধ হয় না। তবে উইল-খানি গেল কোথা? ড্রয়ারের কপাট চাবিবন্ধ রহিয়াছে। তবে উইল কোথা গেল? কি হইল? কি সর্ব্বনাশ হইল? রবীন্দ্র কি তবে আমার টেবিলের দরজা অন্য চাবি দিয়া খুলিয়া উইলখানি হস্তগত করিয়াছে? অসম্ভব কিসে? খুব সম্ভব। নিশ্চয়ই এ তারই কাজ? তাই যদি হয়, তাহলে তাকে আজই রাত্রে খুন করে উইল কেড়ে নিতে হবে? কিন্তু খুনের আগে একবার ভাল করে খোঁজ করা যাক।" এইরূপ ভাবিয়া সে তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া "রামা রামা" বলিয়া ডাক দিল। রামা তাহার পিয়ারের চাকর।

রামা উত্তর দিল,—"আজ্ঞে যাই।"

ক্ষি—"শিগ্‌গির এদিকে আয় বেটার ছেলে।"

রামা অতিথিদের অভ্যর্থনায় ব্যস্ত ছিল। প্রভুর ডাক শুনিয়া তৎক্ষণাৎ হাঁপাইতে হাঁপাইতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল—"কি বল্‌ছেন হুজুর!"

ক্ষি—"হাঁরে? আমার ঘরের দরজা খুলেছিল কে?"

রামা ওরফে রামচন্দ্র নিজের কর্ম্ম পটুতার পরিচয় দিবার জন্য বলিল—"কেন হুজুর! যেই স্বামীজি ও কুটুম্ব লোকেরা আমাদের

বাড়ীতে এসে আপনাকে ডাক দিলেন, তখনই আমি গিন্নিমাকে খবর দিলাম। তিনি আপনার ঘর খুলে দিতে বল্লেন, তাই আমি নিজে খুলে দিয়েছি।"

ক্ষি—"যখন আমি বেরিয়ে যাই, তখন ত তোকে বৈঠকখানার ঘরে চাবি দিতে বলেছিলাম।"

রা—"আজ্ঞে, আমিও চাবি বন্ধ করে দিয়েছিলাম।"

ক্ষি—"তারপর চাবী খুল্লি কখন?"

রা—"যখন গিন্নীমা হুকুম দিলেন তখনই খুলে দিলাম।"

ক্ষি—"আচ্ছা, তুই যা।"

ক্ষিতীশচন্দ্র আর কাল বিলম্ব না করিয়া একটি বড় বাতি ও দেশলাই সংগ্রহ করিয়া কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া সংগোপনে ষ্টেশনের পথ ধরিয়া চলিল।

ইত্যবসরে স্বামীজি রবীন্দ্রকে নিকটে ডাকিলেন ও গুটিকতক বিশেষ প্রয়োজনীয় সংবাদ জানিতে চাহিলেন।

স্বামীজি বলিলেন—"তার পর রবীন্দ্র, তোমার পরীক্ষার শেষ দিনই কলিকাতা হইতে রওনা হয়েছিলে?"

র—"আজ্ঞে হাঁ! সেই রাত্রেই।"

স্বা—"বেশ! রসময় বাবু তার পর দিনই মারা যান?"

র—"আজ্ঞে হাঁ!"

স্বা—"তাঁর মৃত্যুর সময় তাহ'লে নিকটেই ছিলে? সে সময় রসময় বাবু উইল সম্বন্ধে তোমাকে কোন কথা বলেছিলেন?"

রবীন্দ্রনাথের চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। বলিল—"স্বামীজি,

আমি বড়ই অভাগা। জীবন্ত অবস্থায় আর পিতৃদেবের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই।"

"সাক্ষাৎ হয় নাই?" স্বামীজি যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। তাহার পর হতাশ ভাবে বলিলেন—"এত করেও তোমাদের শেষ সাক্ষাৎ হল না। আমার এত চেষ্ট—এত পরিশ্রম তবে কি সব ব্যর্থ হল!"

কথাটা রবীন্দ্রনাথ ভালরূপ বুঝিতে পারিল না। নীরবে হেঁটমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণেক পরে স্বামীজি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"তাহ'লে দ্বিতীয় উইলখানি তোমার হস্তগত হয় নাই?" সজল নয়নে রবীন্দ্র উত্তর করিল—"যখন আমি আসিয়া পৌঁছিলাম তখন তাঁহার দেহ হতে প্রাণ বায়ু বহির্গত হয়েছে। উইলের কথা কি বলছেন তা আমি বুঝিতে পারছি না।"

ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া স্বামীজি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"রসময়ের মৃত্যুর সময় কালিচরণ কি নিকটে ছিল?"

র—"আজ্ঞে না, শুনছি যে, মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি আমাকে দেখবার জন্য বড় কাতর ও অস্থির হন। তিনি নাকি স্বপ্নে দেখে-ছিলেন যে, আমি যেন ষ্টেশনে নেমে পথ ঠিক করতে না পেরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। কথাটী প্রকৃত বটে। অজানা দেশে আমি পথ ঠিক করতে পারি নাই। এজন্য তিনি কালিচরণকে আমার উদ্দেশ্যে ষ্টেশনের পথে পাঠায়েছিলেন। তার পর কালিচরণ

আমাকে পথ দেখিয়ে এই বাটিতে আনে। আমি এসে দেখি পিতৃদেব আর ইহ জগতে নাই।"

স্বা—"হা হতভাগ্য পুত্র! তোমার অদৃষ্টে এ অপেক্ষা আর কি বেশী ঘটতে পারে?"

র—"কেন স্বামীজি! পিতৃদেব মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাকে পুত্র ব'লে আহ্বান করেছেন—আমায় আশীর্ব্বাদ ক'রে স্বর্গে গেছেন—এর চেয়ে আর অন্য কোন সৌভাগ্য আমি কামনা করি না।"

র—"তুমি কামনা না করতে পার, কিন্তু আমার কামনা যথেষ্ট ছিল।"

স্ব—"সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী আপনি, আপনার কামনা কেন দেব?"

স্বা—"বাতুল তুমি! সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী আমি—তোমার এই সংসার নিয়ে—তোমার স্বার্থ নিয়ে এখনও জড়িয়ে রয়েছি কেন, তা তুমি কি বুঝবে, বালক! আমার দায়ীত্বের ভার তোমাকে কি বুঝাব? যদি শঙ্করী কখনও দিন দেন তবেই বুঝাতে পারব। আর তা যদি না পারি, তাহ'লে তোমাকে এ জীবনে শুধু জ্বালা ভোগ করেই ইহকালের লীলা শেষ করতে হবে। আমারও অবস্থা তাই।"

র—"আপনার কথা আমি ভাল বুঝতে পারলাম না।"

স্বা—"এখন বুঝবার আবশ্যকতা নাই ও বুঝিবার চেষ্টাও করো না। তবে মনে বড় খেদ রইল, রসময়ের জীবন থাকতে থাকতে

তোমার সহিত তাঁর সাক্ষাৎ হল না। তা হ'লে হয় ত তোমার জীবনের স্রোত আজ অন্যদিকে প্রবাহিত হত।"

র—"দেখুন, পিতৃদেবের সহিত শেষ সাক্ষাৎ হ'ল না—তাঁর অন্তিম সময়ে এতটুকুও সেবা করতে পারলাম না—তাঁর পদধূলি নিয়ে শেষ আশীর্ব্বাদ লাভ করতে পারলাম না—এ অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় কি আছে? তবে যখন শুনলাম যে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি এ অধমকে স্মরণে ও চরণে রেখেছেন, তখন আমার সকল ব্যথার, সকল যন্ত্রণার অবসান হয়েছে।"

স্বামীজি রবীন্দ্রনাথের পিতৃভক্তির ও তাহার পবিত্র হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া উইল সম্বন্ধে আর কোন কথা উত্থাপন করিলেন না। কথাগুলি শুনিয়া স্বামীজি শুধু নীরবে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বে ক্ষিতীশচন্দ্র নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল। দ্বিতীয় উইলখানি ষ্টেশনের পথে খুজিয়া পাইল না—আসিয়াই অতি সরল ও সহজ ভাবে স্বামীজি ও অন্যান্য আগন্তুকবর্গকে হস্তপদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক সান্ধ্যকৃত্য সমাপন করিতে অনুরোধ করিল ও সকলের আহারাদির ব্যবস্থা করিতে অন্দরমহলে সংবাদ পাঠাইল। স্বামীজি ও রবীন্দ্র গৃহ ত্যাগ করিলে পর, অতি সন্তর্পণে ক্ষিতীশচন্দ্র প্রথম উইলখানি নিজের ড্রয়ার হইতে বাহির করিয়া পিতার আলমারীর মধ্যে নিঃশব্দে রাখিয়া উহার চাবীটি বন্ধ করিয়া দিল। পরে সম্মুখে পুষ্করিণীরমধ্যে ঐ চাবীটি সজোরে নিক্ষেপ করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

দেখিতে দেখিতে অশৌচকাল শেষ হইয়া আসিল। স্বামীজি বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে আর খুল্‌না পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। গুরু, পুরোহিত, আত্মীয় কুটুম্ব ও নিমন্ত্রিত অধ্যাপক বৃন্দ এই কার্য্যে যোগদান করিলেন। ক্ষিতীশচন্দ্র স্বামীজিকে পণ্ডিত মণ্ডলীর আদর আপ্যায়নের ও যথোচিত মর্য্যাদা রক্ষার ভার দিল। রবীন্দ্রনাথকে ক্ষিতীশচন্দ্র জ্যেষ্ঠের সম্মান দেখাইতে ক্রুটি করিল না। দুই ভ্রাতায় শাস্ত্রোচিত বিধান অনুসারে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিল। সকলেই ক্ষিতীশচন্দ্রকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। নীচ দরিদ্র ধনবান আহূত অনাহূত সকলেই তাহার ব্যবস্থা ও সুশৃঙ্খলতা দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইল। মূল কথা এই যে—শ্রাদ্ধ ব্যাপার দেখিয়া অনেকেই—যাহারা ক্ষিতীশচন্দ্রকে চরিত্রহীন বলিয়া জানিত—তাহারা তাহাদের মতের পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইল। রসময়ের মানব লীলা এই ভাবে একরূপ শেষ হইয়া গেল।

এ সমস্ত গোলমাল মিটিয়া গেলে পর, যখন স্বামীজি কাশী যাইবার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন, তখন ক্ষিতীশচন্দ্র বিশেষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঐ প্রসঙ্গে মত দিল বটে কিন্তু তাহার পূর্ব্বে সাংসারিক দু'একটী বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিল। যে দিন স্বামীজি খুল্‌না পরিত্যাগ

করিবেন স্থির হইল, সেই দিন প্রাতে ক্ষিতীশচন্দ্রের বৈঠকখানায় ২।৪ জন বর্দ্ধিষ্ণু ভদ্রসন্তান আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্ষিতীশ-চন্দ্র কহিল—"স্বামীজি! দেখুন আপনি বাবার বিশেষ হিতকারী বন্ধু। তিনি শেষ সময় পর্য্যন্ত আপনার নাম করেছেন। তিনি দাদার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বড়ই কাতর হন। কিন্তু তাঁর সে বাসনা পূর্ণ হয় নাই। তবে মারা যাবার আগে ব'লে গেছেন যে তাঁর আলমারীর মধ্যে তিনি উইল লিখে রেখে গেছেন। আর সেই আল্‌মারীর চাবী আপনার কাছেই আছে! তিনি মৃত্যুর অনতিপূর্ব্বে আমাকে বলেন যে, যখন রবীর সঙ্গে দেখা হ'লো না, তখন স্বামীজি না এলে যেন উইল কেহ স্পর্শ না করে।"

স্বা—"তাহ'লে তিনি তোমাকে কোন চাবী দেন নাই?"

ক্ষি—"আজ্ঞে না। বললেন,—যখন রবীর সঙ্গে দেখা হলো না, তখন আর কেহ যেন আল্‌মারী না খোলে। কোন চাবী বা কাগজ পত্র কিছুই আমায় দেন নাই।"

কথাগুলি শুনিয়া স্বামীজির হতাশ প্রাণে যেন আশার সঞ্চার হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "রসময় যখন বুঝিলেন যে রবীন্দ্র আসিল না তখন চাবীটি গোপনে রাখিয়া এইরূপ আদেশ দিয়া তিনি বিচক্ষণতারই পরিচয় দিয়াছেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষিতীশকে এইরূপ বলিয়া থাকিবেন। নচেৎ ক্ষিতীশচন্দ্র কি করিয়া জানিবে যে আমার কাছে ডুপ্লিকেট্ চাবীটি আছে? তাহলে বোধ হয় আলমারীর মধ্যে দুইখানি উইলই দেখিতে

পাইব।” এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি ক্ষিতীশচন্দ্রের কথার উত্তর করিলেন—“তুমি যা বল্লে তা সবই সত্য। রসময় বাবু আমাকে বড়ই শ্রদ্ধা করতেন। আমার সহিত ইদানীং প্রায় সংসার সম্বন্ধে অনেক কথা বার্ত্তা বলতেন, শেষ উইল লিখে, আল্‌মারীর মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর নিজের চাবীটি কোথায়?”

ক্ষি—“আজ্ঞে, তা ত জানি না। সে সব ত আমায় কিছু ব’লে যান নাই।”

উপস্থিত ভদ্র মণ্ডলীর মধ্যে একজন স্বামীজিকে বলিলেন—“যখন রসময়ের চাবীটি পাওয়া যাচ্ছে না, তখন আপনার চাবীটি দিয়ে আল্‌মারী খুলতে বাধা কি?”

স্বামীজি বলিলেন—“কিছুমাত্র না—আমি ত সর্ব্ব সমক্ষেই আলমারির চাবী খুলতে প্রস্তুত।”

এই বলিয়া ব্যাগ হইতে চাবীটী বাহির করিয়া স্বামীজি নিজ-হস্তে আলমারী খুলিতে গেলেন। তাঁহার বক্ষস্থল দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। হস্ত কাঁপিতে লাগিল। প্রথম উদ্যমে চাবীটী লাগিল না। আল্‌মারী খুলিবার পূর্ব্বে চাবীটী একবার মাটিতে পড়িয়া গেল। উহা স্বামীজি তুলিয়া লইলেন ও বিশেষ সাবধানতার সহিত আল্‌মারী খুলিলেন। ক্ষিতীশচন্দ্র নিরুদ্বেগে প্রশান্তচিত্তে সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর সহিত কথাবার্ত্তায় ব্যস্ত ছিল; মধ্যে মধ্যে ভৃত্যদিগকে ডাক হাঁক দিয়া তামাকু, সিগারেট পান প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিতেছিল। স্বামীজির কার্য্যের দিকে তাহার কোন লক্ষ্যই ছিল না। পৈতৃক সম্পত্তি সম্বন্ধে উইলের ব্যবস্থা

যেন তাহার ভ্রূক্ষেপের বিষয় নহে বলিয়া বোধ হইতেছিল। তবে বক্র দৃষ্টিতে স্বামীজির কার্য্য কলাপ যে মাঝে মাঝে নিরীক্ষণ না করিতে ছিল এমন নহে। আলমারী খুলিয়া স্বামীজি তাহার ভিতর-কার কাগজ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। আক্ষেপের বিষয় সেই পুরাতন অপ্রিয় দর্শন প্রথম উইল খানি দৃষ্টিগোচর হইল। দ্বিতীয় উইল—যাহার সম্পাদন কার্য্যে তিনি বিশেষ তৎপর হইয়াছিলেন ও যাহার সম্পাদনে তাঁহার নিজের কতকটা কৃতিত্ব ছিল—সে উইলখানি কোথায়? এ কি? তবে রসময় কি অন্তিম সময়ে দ্বিতীয় উইল খানি লিখিয়া আবার নষ্ট করিয়াছিলেন! তাও কি হয়? তাও কি সম্ভব? তবে কি হইল? তবে কি ক্ষিতীশচন্দ্র প্রতারণা করিয়া সমস্ত মিথ্যা বলিল? অসম্ভব কি সে? এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে দর্শক মণ্ডলীর মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি মশাই! উইল কি পাওয়া যাচ্ছে না?"

স্বামীজি একটু অপ্রস্তুত হইয়া অগত্যা খামের মধ্যস্থিত প্রথম উইল খানি বাহির করিয়া বলিলেন—"না, এই যে উইল পাওয়া গিয়াছে।"

সর্ব্ব সমক্ষে সেই পূর্ব্বেকার প্রথম উইলখানি খামের ভিতর হইতে বাহির করা হইল। দ্বিতীয় উইলের কোন অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া গেল না।

স্বামীজি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন; তবে সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর সমক্ষে কোন কথা বলিতে পারিলেন না। ক্ষিতীশ

চন্দ্র বক্রদৃষ্টিতে সমস্তই লক্ষ্য করিতেছিল কিন্তু প্রকাশ্য ভাবে কিছু বলিবার আবশ্যকতা বোধ করিল না।

উইলের মর্ম্ম পাঠ করা হইলে পর সভাস্থ সকলেই ক্ষিতীশের সৌভাগ্যে আনন্দ প্রকাশ করিলেন—রবীন্দ্রের জন্য সামান্য মাত্র সহানুভূতি দেখাইবারও সাহস করিলেন না। কারণ অনেকেই রবীন্দ্রনাথকে জীবনে কখন দেখেন নাই বা যদিই দেখিয়া থাকেন তবে তাহার নিতান্ত শৈশব অবস্থায়। এইরূপ অবস্থায় তাহাদের হৃদয়ে হঠাৎ সহানুভূতি আসিতে পারে না। আর যদিই আসিয়া থাকে তাহা হইলে তাহা ক্ষিতীশের সাক্ষাতে প্রকাশ করিয়া তাহার বিরাগ ভাজন হইবার আশঙ্কায় কেহ কিছু বলিলেন না।

উইল্ পাঠ শেষ হইলে পর উহা স্বামীজি ক্ষিতীশের হস্তে সমর্পণ করিলেন। দুই চারিটি আপ্যায়িতের পর সভাভঙ্গ হইল ও সমবেত ভদ্রমণ্ডলী নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন।

বৈকালে স্বামীজি সহ রবীন্দ্র পিতৃভবন পরিত্যাগ করিল। যাইবার সময় রবীন্দ্রনাথ বিমাতার চরণ ধুলি মাথায় লইয়া জীবনের মত নিজ জননী ও জন্মভূমির নিকট বিদায় লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল; কিন্তু বিমাতা অত্যন্ত শিরঃপীড়ায় কাতর থাকার জন্য বুঝি তাহার বাসনা পূর্ণ করিতে পারিলেন না। তবে বিদায়ের পূর্ব্বে ক্ষিতীশচন্দ্র রবীন্দ্রকে উইলের সর্ত্ত অনুসারে তাহার প্রাপ্য পৈতৃক পুস্তাকাগারে রক্ষিত পুস্তক গুলি লইয়া যাইতে অনুরোধ করিল। রবীন্দ্রনাথ উত্তরে বলিল যে, পিতার দান তাঁহার স্নেহাশীর্ব্বাদ

স্বরূপ সে চিরদিন মাথায় করিয়া রাখিবে। তবে গত বর্ষায় দামোদরের বন্যায় তাহার নরগ্রামের মাতুলভবন ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে, বাড়ীর কোন নিদর্শনই নাই। এই বিশ্বমাঝে উপস্থিত তাহার মাথা গুঁজিয়া থাকিবার মত এতটুকুও স্থান নাই, কাজেই এতবড় পুস্তকাগারের গ্রন্থগুলি লইয়া সে কোথায় রাখিবে। অতএব উপস্থিত ক্ষিতীশচন্দ্রকে সেই গ্রন্থগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে; তবে পিতৃদত্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে পিতার অতি প্রিয়, অতি আদরের পবিত্র "গীতা" খানি সে তাঁহার পবিত্র স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ সঙ্গে লইয়া যাইতে ইচ্ছুক। ক্ষিতীশচন্দ্র ইহাতে কোন অমত প্রকাশ করিল না, বলিল যে, সুযোগ মত সংবাদ দিলেই পুস্তকগুলি সে তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিবে—এই বলিয়া ক্ষিতীশ পুস্তকাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক পবিত্র গীতা খানি আনিয়া রবীন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিল। গ্রন্থ খানি দেখিয়াই রবীন্দ্র চিনিল। এই খানি লইয়া তাঁহার পিতা কাশীধামে কতদিন স্বামীজির সহিত কত তর্কবিতর্ক করিয়াছেন। কতদিন স্বামীজি এই গীতার উদ্ধৃত দুরূহ শ্লোকগুলির সুললিত ও সরল ব্যাখ্যা করিয়া তাহার পিতার ও শত শত শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন—সেই সব কথা তাহার স্মৃতিপটে জাগিয়া উঠিল। আর জাগিয়া উঠিল কাশী ধামে রুগ্ন পিতার পার্শ্বে বসিয়া যে সেবা করিয়াছিল—সেই সমস্ত কথা। তবু জীবনে মাত্র কয়দিন পিতৃ চরণ দর্শন ও তাঁহার সেবা ভাগ্যে ঘটিয়া ছিল। আর সে সৌভাগ্য জীবনে ঘটিবে না—আর জীবনে তাঁহার চরণ দর্শন

পাইবে না—ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি আছে? নীরব রবীন্দ্রনাথের চক্ষু দিয়া দর বিগলিতধারে অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। স্বামীজি রবীন্দ্রের মর্ম্মব্যাথা বুঝিলেন—তিনি অশ্রু মুছিয়া দিয়া বলিলেন—"ছি! রবীন্দ্র! চোখে জল কেন ভাই? দুনিয়ার নিয়মই এই। রমণী সুলভ দুর্ব্বলতা দেখাইও না। চল, আমরা যাই। ট্রেণের সময় হয়ে এলো।"

ক্ষিতীশ রবীন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া মনে মনে বিদ্রূপের হাসি হাসিল। স্বামীজির কথায় রবীন্দ্রের চটক ভাঙ্গিল। রবীন্দ্র ক্ষিতীশের হস্ত হইতে গীতা খানি গ্রহণপূর্ব্বক ভ্রাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্বামিজী সহ ষ্টেশনের পথে বাহির হইল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

"কেমন দিদি! বায়স্কোপ ভাল লাগছে না?"

"সত্য কথা বলতে কি দাদা,—আমার মোটেই ভাল লাগছে না।"

"ভাল লাগছে না—কেন?"

"ঐ ত দেখছ দাদা—মেরীকে বিয়ে করবার জন্যে কপট লোক গুলো কি রকম ভান করা ভালবাসা দেখাচ্ছে। এই কি পুরুষের কাজ? এসব দেখলে ওদের উপর ভারি রাগ হয়। মনে হয়—এ সংসারে পুরুষ গুলো প্রতারক—ভণ্ড—শঠ।"

"এও কি একটি শিক্ষা নয়?

"শিক্ষা বটে। কিন্তু এ কুশিক্ষা ত দুনিয়া জুড়ে রয়েছে দাদা! সে শিখতে এখানে ছুটে আসতে হবে কেন? দেবতার মত মানুষ আমি দেখতে চাই দাদামশায়।"

"তাও আছে বৈকি? ঐ দেখনা যে মেরীকে লাভ করবে তাঁর প্রকৃতিটা কেমন? দেখে শুনে তবে মতামত প্রকাশ ক'র।"

"তা বটে। মানুষও আছে বই কি—কিন্তু দাদা রামের মত পতি, লক্ষণের মত দেবর—এ আদর্শ জগতে অতি বিরল।"

"বিরল ত হবেই। রত্ন যদি এত সহজ প্রাপ্য হ'তো তা হলে কি তার আদর থাকতো দিদি! তা হয় না রে ভাই হয় না। অভি-নয় খুব ভালই হচ্ছে। তোর মনটা ভাল নেই, তাই ভাল

লাগছে না বলে মনে হয়। এই কয়দিনই দেখছি—তোর মনটা খারাপ রয়েছে। তাই ভাবলাম—সন্ধ্যাবেলায় একটু বায়স্কোপ দেখলে মনটা বদলে যাবে। কই তাত দিদি যাচ্ছে না।”

“দাদার উপর এই জন্ম আমার ভারী রাগ হয়। তুমি আমার খালি মন খারাপ দেখছ! এক কাজ কর দাদা—তুমি চশমার উপর আর একটা চশমা দাও।”

“না রে দিদি—তা নয়। আমি সব বুঝি ভাই, সব বুঝি। তুই বুঝি ভেবেছিস্ যে, আমি চিরদিনই এরকম পাকা-চুলো—দাঁতভাঙ্গা বুড়ো ছিলাম? আমারও একদিন তোর বয়স ছিল নাতনি! একবারে বুড় হই নাই।”

জ্যোতী দাদামশাইয়ের কথায় একটু লজ্জিত হইল—সে ভাব গোপন করিয়া বলিল, “আমার মত তোমার বয়স ছিল নাকি দাদা মশায়?”

“ছিল না? এই যে দেখছিস্ তুঁই সুমুদ্দুর মত মাথাটা—এখানে ভ্রমরের মত কালো কোঁকড়া কোঁকড়া চুল ছিল—এইখানে কার্ত্তিকের মত গোঁফ ছিল। সে দিন কি আর আছেরে ভাই, তাহলে কি তোকে খোসামোদ করে বায়স্কোপে নিয়ে আসি। সে দিন থাকলে তোর মত কত সুন্দরী আমাকেই খোসামোদ করে বায়স্কোপে নিয়ে আসত”—বলিয়া তিনি পাকা চুলে হাত বুলাইতে বুলাইতে হাসিতে লাগিলেন।

জ্যোতী বলিল, “দেখ দাদামশায় তোমার মাথায় যদি কাঁচা

চুল—আর মুখের উপর গোঁফ থাকত—তাহলে তোমায় বড্ড বিশ্রী দেখাত।"

"তুই আমার পাকাচুল দেখেই মজেছিস্ তাই কাঁচা চুলের ও গোঁফের নিন্দে করছিস ; কিন্তু তোর দিদিমারা আমার কাঁচা চুল দেখেই মজেছিল। তারা আমার পাকা চুলের কল্পনাও করতে পারে নাই—এসব আলোচনা এখন থাক ভাই—এখন তোর একটি রামের মত বর খুজে দিতে পারি তাহলে আমার ভাবনা চলে যায়—আর তোরও মন ভাল হয়ে যায়।"

"যাও—আমি আর বায়স্কোপ দেখব না। এখনি আমি বাড়ী চলে যাবো।"

"চটিস্ কেন, দিদি! আমার যে তোর জন্য কি ভাবনা তা তুই কি বুঝবি? আমি যে বুড়ো হয়েছি ভাই—আমার ত এ বোঝা নেবার কথা নয়। যার দায়িত্ব সে যে এই বুড়োকে মজাবার জন্যে তার ঘাড়ের বোঝা ফেলে দিয়ে কোথা চলে গেল।" এই বলিয়া বৃদ্ধ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

বালিকারও নেত্রপ্রান্তে একটু অশ্রুবিন্দু দেখা দিল।

পাঠক! বুঝিয়াছেন—এরা কারা? জ্যোতির্ম্ময়ীর মনটা দুইচারি দিন ধরিয়া বড়ই উদাস ছিল। এই জন্য বৃদ্ধ কেশব ভাবিলেন যে, ঘণ্টাদুই বায়স্কোপ দেখিলে তাহার মনটা কিছু প্রফুল্ল হইতে পারে। এই ভাবিয়া নিজ প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তমা নাতিনীকে সঙ্গে লইয়া তিনি একখানি বক্সে বসিয়া বায়স্কোপ দেখিতেছিলেন। আজ "Who will marry Mary" নামক সুন্দর অভিনয়টি

প্রদর্শিত হইতেছিল। অভিনয়ের মাঝখানে যে ৫।৭ মিনিট অবসর মিলে, সেই সময় পিতামহ ও পৌত্রীতে উক্তরূপ কথোপকথন হইতেছিল। অভিনয়ের প্রসঙ্গ হইতে যখন বৃদ্ধের হৃদয়ে পুত্রের অকাল-বিয়োগজনিত দুঃখমাখা স্মৃতি জাগিয়া উঠিল, তখন উভয়েই কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন। বলা বাহুল্য সেই অবসরে রঙ্গমঞ্চ আলোকিত হইয়া উঠিল। বৈদ্যুতিক আলোকছটায় তখন রঙ্গমঞ্চ উদ্ভাসিত। এই সময় নিকটবর্ত্তী আর একটি বক্সে গুটিকতক যুবক একটি বারবিলাসিনী লইয়া অভিনয় দেখিতেছিল। সেই উজ্জ্বল আলোকে নিকটস্থিত জ্যোতীর্ম্ময়ীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি হঠাৎ একটি যুবকের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। যুবক ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া স্থির দৃষ্টিতে বালিকাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অন্যান্য বন্ধুগণ সেই সময়ে পান সিগারেটের শ্রাদ্ধ করিতে করিতে সঙ্গিনী বার-বিলাসিনীকে লইয়া রঙ্গরহস্য করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে সেই যুবকের চমক ভাঙ্গিল। সে পার্শ্বস্থিত অন্য বন্ধুটিকে চুপি চুপি বালিকাকে দেখিবার জন্য ইঙ্গিত করিল। পরে জিজ্ঞাসা করিল—"নিতাই কেমন দেখলে ?"

"কি বলব দাদা ! Beutiful—"

"A paragon—2nd Cleopetra"

"নিতাই ? ওরা কারা—বলতে পার ?

"কি করে বলবো দাদা ! তুমিও যেখানে—আমিও সেখানে।"

"যেমন করে হোক—ওর সন্ধান নিতেই হবে। আমার সর্ব্বস্ব

যায়—আমার প্রাণ যায়—সেও স্বীকার, সুন্দরীকে করতলগত করতেই হইবে।"

"টাকায় কি না হয় ? রূপচাঁদ ছাড়লে দুনিয়ার সুন্দরী পায়ের তলায় গড়াগড়ি যায়। তা ঐ একটা ছুঁড়িকে বাগানো যাবে না ?"

"বল—তুমি যেমন করে পার ওকে যোগাড় করবে ? বাবার বিষয় অর্দ্ধেক নষ্ট হয় সেও স্বীকার, তবু ওকে চাই। অঃ নিতাই চুপ করে রইলে যে ? বলনা কি করবে ?"

"আরে দাঁড়াও—আগে একটু সমজে দেখি, কি উপায়ে ও কোন রাস্তা ধরে গেলে পাওয়া যাবে—আগে বুঝতে দাও, এত তাড়াতাড়ি করলে হবে কেন ?"

"আচ্ছা দেখ কিন্তু কাজ হাসিল করা চাই। আচ্ছা ঐ ঘাটের মড়া বুড়োটা কে ?"

"ও কেউ আত্মীয় টাত্মীয় হবে।"

"ও বুড়োটা কেন এসেছে ?"

"বেশ কথা বলেছ ত ? মেয়ে মানুষ – ছুকরী বয়স—তার উপর সুন্দরী—ওর একলা আসা খুব উচিত ছিল। তা না হয়ে কি না একটা লোককে সঙ্গে এনেছে। ভারি অন্যায়—ভারি অন্যায়।"

"না—না—ওসব কথা নয়। বুড়ো ছোঁড়া কেউ থাকবে না। থাকব—আমি ও সে।"

"ধীরে বন্ধু ধীরে ! অত উতলা হ'য়ো না। হাঁ, এক কাজ কর

দেখি। উপস্থিত শ দুই টাকা ঝাঁ ক'রে দাও দেখি, দাদা! ছুড়িটার সন্ধানের চেষ্টা দেখি।

"এখনি দিচ্ছি। আজ রাত্রে পার তবে কাল নয়।"

বাকি অর্দ্ধ অভিনয় সুরু হইল। বৈদ্যুতিক আলোকমালা নিবিয়া গেল। আবার দর্শকগণ উৎকণ্ঠিত ভাবে অভিনয় দেখিতে লাগিল। অভিনয়ের যবনিকা পড়িবার মিনিট দুই পূর্ব্বে নিতাই হঠাৎ আসন ত্যাগ করিয়া রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল—উদ্দেশ্য বন্ধুর ঈপ্সিত বালিকা বৃদ্ধসহ কোন পথ দিয়া যায় তাহার সন্ধান লওয়া। অনতিবিলম্বে অভিনয় শেষ হইল। দর্শকমণ্ডলী ভীড় করিয়া ফটক পার হইল ও যে যাহার গন্তব্য পথে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে যখন লোকের ভীড় কমিয়া গেল তখন নিতাই দেখিল যে, বালিকা বৃদ্ধের হস্ত ধরিয়া ধীরে ধীরে রঙ্গমঞ্চের সিঁড়ি হইতে অবতরণ করিতেছে। ফটকের নিকটে একজন দ্বারবান তাহাদের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল। বৃদ্ধকে আসিতে দেখিয়া অদূরে দণ্ডায়মান গাড়ীর কোচম্যানকে উদ্দেশ্য পূর্ব্বক দ্বারবান হাকিল—"গাড়ি বাড়াও।"

অমনি গাড়ীর একজন সইস গাড়ীর বাতি জ্বালিতে লাগিলে ইত্যবসরে নিতাই দ্বিতীয় সইসকে উদ্দেশ পূর্ব্বক বলিল—

"সহিস সাহেব! একটা উপকার করবে বাবা? তোমাকে বকসিস্ দিব।"

সইস বলিল—"কেয়া করনে হোগা?

"দেখ বাবা, বেশী কিছু করতে হবে না। আমি এতরাত্রে

হেঁটে বাড়ী যেতে পারছি না। তোমাদের গাড়ীর গোলামপোষে দাঁড়িয়ে যাবো বাবা! তোমাকে একটা টাকা দিব, তুমি যদি দয়া ক'রে অনুমতি কর।"

সইস মনে মনে বড়ই সন্তুষ্ট হইল। ভাবিল অনায়াসে যদি একটা টাকা পাওয়া যায় তবে মন্দ কি? তাই সে উত্তরে বলিল—"আচ্ছা—সবুর কর—পহেলা সোয়ারী চড়নে দেও; ফের তোম আস্তে আস্তে গাড়ি চড় লেন।"

এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া নিতাই সইসের সহিত গাড়ির পশ্চাৎ দাঁড়াইয়া বরাবর কেশববাবুর জোড়াবাগানের বাসা বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

গাড়ি সদর দরজায় থামিল। অমনি দ্বারবান সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া প্রভুকে অভিবাদন করিল ও ফটকের পথ আলোকিত করিয়া দিবার জন্য বৈদ্যুতিক আলোকের সুইচ্‌টি ঘুরাইয়া দিল। হঠাৎ সেই স্থান আলোকমালায় ভূষিত হইয়া গেল। আর জ্যোতীর্ম্ময়ী দাদামশাইয়ের হস্ত ধারণ করিয়া ধীর পদক্ষেপে অন্দরে প্রবেশ করিল—সঙ্গে সঙ্গে আলোক নিবিয়া গেল। সোণার চুম্‌কী বসান কাল সিল্কের সাড়ীমোড়া জ্যোতীর্ম্ময়ীর লাবণ্য দেখিয়া নিতাই সেই অন্ধকার নিশীথে ক্ষণপ্রভা চমকিত পথিকের ন্যায় ক্ষণেক নিস্তব্ধ ও নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে ভাবিতে লাগিল—"কি দেখিলাম—এ কি চিত্র—না সজীব রমণী মূর্ত্তি?"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

রসময়ের উইল প্রবেট হইয়া গিয়াছে। ক্ষিতীশচন্দ্র তাঁহার অতুল সম্পত্তির একমাত্র মালিক হইয়া নির্ব্বিবাদে সমস্ত ভোগদখল করিতেছে। এখন আর তাহাকে পায় কে? পৃথিবীর যাবতীয় সুখভোগ বিলাস তাহার করতলগত। খুলনা আর ভাল লাগে না। মহানগরী কলিকাতার মত ভোগবিলাসের স্থান কোথায়? কাজেই খুলনা ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছে। তাহার কলুটোলার বিস্তীর্ণ বসতবাড়ীর বৈঠকখানা এখন দিবারাত্র সরগরম। বন্ধু বান্ধব, চাকর নফর, মোসায়েব খানসামা অহরহ তাহার আমোদ প্রমোদের প্রস্তাব ব্যবস্থা ও উদ্যোগে সততই ব্যস্ত। ক্ষিতীশচন্দ্রের কাছে এ দুনিয়াটা যেন একটা বিলাসের বিরাট রঙ্গমঞ্চ—আর পিতৃত্যক্ত ঐশ্বর্য্য তাহারই ভোগবিলাসের উপকরণ। ক্ষিতীশচন্দ্র মধ্যে মধ্যে ভাবিত, কি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রভাবে ও কি সুচারু কৌশলেই এতবড় বিষয়টা তাহার হস্তগত হইয়াছে। আর একটু বিলম্ব হইলে কি ভাগ্য বিপর্য্যই না ঘটিত। কিন্তু এত সুখের মধ্যেও কখন কখন দ্বিতীয় উইলখানির কথা মনে হইলে তাহার প্রাণটা শিহরিয়া উঠিত—এত সুখের মধ্যেও মনে একটা অশান্তি জাগিয়া উঠিত। ভাবিত উইলখানা কোথা গেল? কে লইল? কোন অস্বাভাবিক ভৌতিক ক্রিয়া

বলে উহা অন্তর্হিত হইল নাকি? ভাবিত বটে কিন্তু কোন সুমীমাংসা করিতে পারিত না।

বহুদিন পাঠকের বিজলী সুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। কিন্তু এবার সাক্ষাৎ করাইবার পূর্ব্বে তাহার একটু পরিচয় দেওয়া অবশ্যক। রসময়ের স্বদেশবাসী একটি বন্ধু ও সহপাঠী এলাহাবাদে ডাক্তারী করিতেন। ছাত্রজীবনে ক্ষিতীশচন্দ্র পশ্চিমাঞ্চলে বেড়াইতে যায় এবং দিনকয়েক পিতার উক্ত ডাক্তার বন্ধুটির নিকট আতিথ্য স্বীকার করে। তিনি পুত্রানির্ব্বিশেষে যত্ন করিয়া ক্ষিতীশচন্দ্রকে নিজ বাটীতে স্থান দেন। ক্ষিতীশচন্দ্র বাল্যকাল হইতে উক্ত ডাক্তারের পরিবারবর্গের সহিত মেশামিশি করিত। রসময়ের সহিত ডাক্তারবাবুর বিশেষ সৌহৃদ্য থাকায় উভয় পরিবার মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব ছিল। এজন্য ক্ষিতীশচন্দ্রের ডাক্তার বাবুর অন্দরে অবারিত গতি।

বিজলী সুন্দরী ডাক্তারবাবুর বালবিধবা কন্যা। বিজলীর পিতামহ তাহাকে নবমবর্ষে গৌরীদান করেন। কিন্তু পোড়া বিধাতা তাহার প্রতি বিরূপ ছিলেন। এজন্য বিবাহের দুই বৎসর মধ্যেই বিজলী বিধবা হয়। বিজলী ক্ষিতিশকে দাদা বলিয়া সম্বোধন করিত। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ডাক্তার বাবু নিজ ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়া পাশ্চাত্য আচার পদ্ধতির বড়ই পক্ষপাতী হইয়া পড়েন; এবং নিজ পুত্র কন্যাকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে বড়ই প্রয়াস পান। অন্দর মহলে মেয়েদের হিন্দুশাস্ত্রোচিত আচার ও নিষ্ঠার পরিবর্ত্তে মেম

শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মেয়েরা রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ কথা, ব্রত নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া পিয়ানো হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান গাহিতে শিখিয়াছিলেন। তাঁহারা বিদেশী চালচলনের অনুকরণে হিন্দুর সমাদৃত চিরন্তন পর্দ্দাপ্রথা কতকটা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। ডাক্তার বাবু জাতিতে ব্রাহ্মণ। সুদূর পশ্চিমে তাঁহার কার্য্য কলাপ সম্বন্ধে কেহ তীব্র আলোচনা করিত না বটে—তিনি প্রকৃত হিন্দুর আচরণ ত্যাগ করিয়া ছিলেন বটে, তত্রাপ তিনি নিজের সমাজের বন্ধন একেবারে পরিত্যাগ করিয়া বাল-বিধবা কন্যাকে পুনরায় বিবাহ দিতে সাহসী হন নাই। বিজলী সুন্দরী ষোড়শীযুবতী। ক্ষিতীশচন্দ্র অল্প দিনের মধ্যেই অন্দর মহলে বেশ পসার প্রতিপত্তি জমাইয়া লইল। প্রথমে দুই এক সপ্তাহ থাকিবার মানসে ক্ষিতীশ বাবু আতিথ্য গ্রহণ করে, কিন্তু এলাহাবাদের এমনি একটা মোহিনী শক্তি তাহাকে তখন গ্রাস করিয়াছিল, যে দুই মাসের পূর্ব্বে ক্ষিতীশ সে দেশ ছাড়িতে পারিল না। সে যখন এলাহাবাদ ছাড়িল তখন শুনা গেল যে, বিজলী সুন্দরীও গৃহ-সংসার হইতে কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। খুব একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। পরে অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল যে, ক্ষিতীশ চন্দ্র গোপনে রাজার আইন বলে বিধবা বিজলী সুন্দরীকে বিবাহ করিবার প্রলোভন দেখাইয়া, তাহাকে লইয়া এলাহাবাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহার পূজ্য পিতৃদেবের অন্তরঙ্গ বন্ধুর আতিথেওতার ও যত্নের উপযুক্ত পুরস্কার দিয়াছে। প্রথমে ডাক্তারবাবু বড়ই গরম হইয়া যান, এবং আদালতের সাহায্যে

অপরাধীর দণ্ড বিধানে প্রয়াসী হন। কিন্তু আইন ব্যবসায়ীদের মতে ষোড়শ বর্ষ উত্তীর্ণা বিধবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নাকি পিতার জারিজুরি খাটে না। অপরাধীকে দণ্ড দিতে গিয়া পাছে নিজেই হাস্যাস্পদ হন এই ভয়ে মনের আগুন মনে চাপিয়া রাখিলেন। অতবড় একটা লোক—কি করিবেন? ঘরের কুৎসা আদালতে ও জনসাধারণে প্রকাশ করিয়া নিজের মাথা হেঁট করার চেয়ে কিল খাইয়া চুপ করাটা শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিলেন।

যাহা হৌক ক্ষিতীশচন্দ্র বিজলীকে বিবাহ করিবে এই প্রলোভন দেখাইয়া তাহার পিতার নিকট হইতে সরাইয়া আনে। তার পর দিনকতক কলিকাতায় তাহার একটি বন্ধুর রক্ষিতার বাড়ীতে গোপনে লুকাইয়া রাখে। পরে যখন গোলমাল কতক কমিয়া যায় তখন খুলনার কাছাকাছি নিজের পিতার জমিদারীর মধ্যে একটি প্রজার বাড়ীর কতক অংশ লইয়া সেই স্থানে তাহাকে রাখিয়া দেয়। বিজলীকে প্রথমে বলিয়া দিল যে, যদি সে পিতার জীবদ্দশায় তাহাকে বিবাহ করে, তাহা হইলে পিতা ক্ষুণ্ণ হইবেন এবং হয়ত তাহাকে ত্যজ্যপুত্র আখ্যা দিয়া বাড়ী হইতে বিতাড়িত করিয়া দিবেন। এজন্য ক্ষিতীশচন্দ্র তাহাকে পিতৃবিয়োগ রূপ মাহেন্দ্র ক্ষণের অপেক্ষা করিতে বলিয়া বালবিধবাকে একরূপ আশ্বস্ত করিল। মাসে মাসে তাহার খরচোপযোগী অর্থ পাঠাইয়া দিত ও প্রেমের প্রথম অবস্থায় লোকে যেরূপ করিয়া থাকে, ক্ষিতীশ-চন্দ্র সেইরূপ করিতে কোন ত্রুটী করিল না। বিজলীর কাছে ঘন ঘন যাতায়াত করিতে লাগিল। যথেষ্ট ভালবাসা দেখাইতে

লাগিল। বিজলীও আশা প্রতীক্ষায় রসময়ের মৃত্যুর দিন গুণিতে লাগিল।

কিন্তু মৃত্যু আসিয়া শীঘ্র দেখা দিল না। তাহার আকাঙ্ক্ষিত মাহেন্দ্র সুযোগ আসিতে কিছু বিলম্ব হইল। ইত্যবসরে ক্ষিতীশ-চন্দ্র কলিকাতার বন্ধু বান্ধবদের অনুগ্রহে নিত্য নব প্রস্ফুটিত কুসুমের আঘ্রাণে মত্ত হইয়া ম্লান পর্য্যুষিত বিজলী সুন্দরীকে ভুলিতে লাগিল। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছে, তাহা পাঠকগণের অবিদিত নাই।

এখন বিজলী সুন্দরী পরিত্যক্তা—তাহার কথা এখন দিনান্তেও ক্ষিতীশচন্দ্রের মনে উদিত হয় না—এমন কি তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থার কথাও সে ভুলিয়া গিয়াছে। বাল বিধবা এক লম্পটের প্রলোভনে পড়িয়া যে পাপ সঞ্চার করিয়াছিল, এইবার তাহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল। এখন কত কথাই তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সেই স্নেহময়ী জননীর কোল—কন্যাবৎসল পিতার সস্নেহ আদর—আত্মীয় স্বজনের ভালবাসা ইত্যাদি কত কথাই একে একে তাহার মনের মধ্যে ভীড় করিয়া আসিতে লাগিল। সে কি আনন্দের দিন গিয়াছে!

প্রস্ফুটিত শুভ্র শতদলের ন্যায় গৃহ সরসীতে ফুটিয়া উঠিয়া স্নেহ পবনে হেলিয়া দুলিয়া বেশ দিন কাটাইতেছিল। এমন সময় এক-দিন পাপিষ্ঠ ক্ষিতীশ দুষ্ট গ্রহের ন্যায় তাহার ভাগ্যাকাশে আসিয়া উদিত হইল। তাহার মিষ্ট কথায়—তাহার কৃত্রিম ভালবাসায় —তাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ভাল মন্দ, পথ বিপথ সে কিছু

বুঝিতে পারিল না। এইরূপ এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে সুখের প্রলোভন দেখাইয়া ক্ষিতীশ তাহাকে বিপথে লইয়া গেল। দিক বিদিক জ্ঞান হারাইয়া সেও এক এক মুহূর্ত্তের মধ্যে জীবনের সমস্ত শুভ্রতার উপরই কালি ঢালিয়া দিল। এক মুহূর্ত্তের ভুলে কামুকের কাম লালসায় নিজের জীবনের সুখ শান্তি সতীত্ব সব আহুতি দিল। কিন্তু বিনিময়ে কি পাইল? কিছু না। যাহাকে পাইবার আশায় উজ্জল দিনকে গভীর রাত্রে পরিণত করিল—যাহার সঙ্গ লাভের জন্য সহস্র ক্রোশ পাতালের অন্ধকারময় প্রদেশে নামিয়া আসিল —তাহাকে ত পাইল না। এখন সেই অন্ধকারে মুখ ঢাকিয়া খালি চোখের জল ফেলিতে লাগিল। তাহার উপর পেটে অন্ন নাই —অঙ্গে বস্ত্র নাই—দুঃখে মনোবেদনা জানাইয়া সহানুভূতি পাইবার একটা লোক পর্য্যন্ত নাই। এততেও সে যে পাগল হইয়া যায় নাই—ইহার আশ্চার্য্যের বিষয়। সে এখন কি করিবে—কোথায় যাইবে? যে নিষ্ঠুর পাষাণ তাহাকে জীবনের পঙ্কিল পথে আনিল—তাহাকে প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া তাহার দুর্ব্বল বুদ্ধিহীন জীবন কে এরূপ ভাবে বিপর্য্যস্ত করিয়া এখন দূরে সরিয়া দাঁড়াইল—তাহাকে কি সে এত শীঘ্র ক্ষমা করিবে? বিজলী সুন্দরীর এখন কেবল সেই চিন্তা!

এখন পত্র দিলে উত্তর আসে না। লোক পাঠাইলে সে দ্বারবান কর্ত্তৃক বিতাড়িত হয়। তাই আজ অনেক কৌশলে ও অনেক চতুরতায় বিজলী সুন্দরী ক্ষিতীশচন্দ্রের কলিকাতার বসতবাটির দ্বিতল শয়ন কক্ষে প্রবেশাধিকার পাইয়াছে। ক্রমান্বয়ে

অনেক দিনের অত্যাচারে ক্ষিতীশের দেহটা অসুস্থ, তাই আজ নৈশ বিহারে বহির্গত হয় নাই। সে একাকী নিজের কক্ষে দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় শায়িত—এমন সময় দীনা ক্ষীণা রুগ্না মলিনবেশা মর্ম্মপীড়িতা বিজলী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্ষিতীশচন্দ্র তাহাকে দেখিয়া প্রথমে চিনিতে পারিল না। কতকটা ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া জিজ্ঞাসা কহিল——"কে? কে তুমি?"

উ—"চিনতে পারছ না? এখন ত চিনবে না—এখন তুমি বড় লোক—জমিদার ক্ষিতীশচন্দ্র।"

একটু বিরক্ত হইয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র উত্তর করিল,—"তুমি এখানে? তুমি কি করে এলে? তুমি এখানে কেন?"

উগ্র ও তীব্রকণ্ঠে বিজলী উত্তর করিল—"এখানে কেন বুঝতে পারছ না? কি করে এসেছি শুনবে? তোমার বাড়ীর ঝিএর বেশ ধরে দ্বারবানের চোখে ধাঁ ধাঁ লাগিয়ে এখানে এসেছি। বুঝেছ? এখানে কেন? নির্ম্মম, একথা জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা হচ্ছে না?"

কথাগুলি শুনিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র একটু নরম হইল। বলিল—"লজ্জা হবে কেন? তুমি কি জন্য এসেছ বলে শীঘ্র চলে যাও।"

—"শুধু বলেই চলে যাবো?"

—"তবে কি করবে?"

"আমি কি করবো না করবো তা পরে জানবে। তুমি এখন কি করবে না করবে আগে তাই জানতে এসেছি। তোমার শুভদিন কি এখনও আসে নি?"

"কেন আসবে না? শুভদিন এসেছে—তা কি করতে হবে?"

"তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে হবে।"

"কি প্রতিজ্ঞা?"

"কি ব'লে ঘরের বার করে এনেছিলে?"

বিদ্রূপ সহকারে ক্ষিতীশ উত্তর দিল—"কি ব'লে এনেছিলাম তা মনে নাই। তুমি নিশ্চয়ই আসতে চেয়েছিলে; তাই তোমাকে নিয়ে এসেছিলাম।"

উত্তর শুনিয়া রোষে ক্ষোভে বিজলীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। উত্তরে বলিল—"বেইমান! কি শপথ করেছিলে—মনে নাই?"

প্রশ্ন শুনিয়া ক্ষিতীশ একটু হাসিয়া বলিল—"যেথায় কাম প্রবল সেখানে শপথের মূল্য কি? তোমারও তখন ঢলঢলে যৌবন, আমারও তখন ছাত্র জীবন, হাতে পয়সা নাই—এ অবস্থায় দুটো শপথ গেলে তোমায় নিয়ে সট্‌কালাম; এতে আর দোষটা কি হয়েছে? এত সবাই করে থাকে। তা বলে কি সেই কথাটা মনে করে রেখে দিতে হবে? আমার সোণাগাছিতে রোজ রাত্রে ওমন কত শপথই গালি?"

উত্তর শুনিয়া বিজলীর মাথা ঘুরিয়া গেল। সে ক্ষণেক

নিস্তব্ধ রহিল। কিছুক্ষণ পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল—"তাহ'লে বুঝব—তুমি তোমার কথামত কাজ করবে না?"

"কি কথটা ভেঙ্গে বল—তবে ত উত্তর দিব।"

"তুমি আমায় বিবাহ করবে কি না?"

চমকিত হইয়া ক্ষিতীশচন্দ্র উত্তর করিল—"বিবাহ? তোমাকে?"

"আকাশ থেকে পড়লে যে?"

"দেখ বিজলী! ওসব বাজে কথা ছেড়ে দাও। এসেছ, কিছু টাকাকড়ি দিচ্ছি নিয়ে যাও। বিবাহ আমি তোমাকে করবো না—করতে পারবে না। গত শনিবার বায়স্কোপ দেখতে গিছ্‌লে কি?"

বিজলী নীরব।

"যদি গিয়ে থাক তবে সেই যে আমাদের বক্সের পাশে বুড়োর সঙ্গে যে ছুকরী এসেছিল তাকে দেখেছ কি? তার চেহারাখানা যদি দেখতে, তাহ'লে তোমার সঙ্গে বিয়ের কথা তুলে নিজেকে হাস্যাস্পদ করতে না। তাহ'লে বুঝতে যে, জমীদার ক্ষিতীশচন্দ্রের যোগ্য যদি কোন ক'নে থাকে, তবে সেই—আর বিয়ে যদি কর্‌তে হয়, তবে তাকে।"

বিজলীর হতাশ প্রাণের ঘাত প্রতিঘাত একটি দীর্ঘ নিশ্বাসে পরিব্যক্ত হইয়া উঠিল। মরমে পীড়িতা হইয়া বিজলী উত্তর করিল—"তাহ'লে তুমি তোমার কথামত কাজ করবে না? তুমি আমাকে বিবাহ ক'রে সুখী করবে না? বেশ ক'রে বুঝে

উত্তর দাও। এই শেষ—আমি আর আসবো না। আমি তোমার কাছে আর মনোবেদনা জানাব না। যাঁর কাছে জানালে ফল পাবো তাঁকেই জানাব।"

"ও সব বাজে কথা ছেড়ে দাও। কিছু টাকা কড়ি দিচ্ছি—নিয়ে ভেসে পড়। বিরক্ত ক'রো না। আমার শরীর ভাল নয়।"

"ক্ষিতীশ! অর্থের কাঙ্গাল হ'য়ে আমি আসি নাই। অর্দ্ধাশনে আমার দিন কাটছে—শতছিদ্র কাপড় প'রে আমি লজ্জা নিবারণ কচ্ছি—তাতেও আমার দুঃখ নাই। এ দুঃখ আমি যাবজ্জীবন সহ্য করতে প্রস্তুত আছি। ভিখারীর মত আমাকে দু মুঠো অন্ন দিয়ে তাড়িয়ে দিও না। ক্ষিতীশ—অতটা নির্দ্দয় হ'ও না—অতটা নির্ম্মম হ'ও না। আমি দু'মুঠো ভাতের কাঙ্গাল হ'য়ে তোমার সঙ্গে আসিনি। ক্ষিতীশ, সেই একটা পুরান কথা মনে ক'রে দেখ। সেই প্রয়াগ তীর্থে—জাহ্নবী-যমুনা-সঙ্গমস্থলে কি ব'লে শপথ করেছিলে—সেই শিবের মাথায় হাত দিয়ে কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে? ক্ষিতীশ! শুধু তোমায় পা'ব বলে—আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেছি—পবিত্র পিতৃকুলের মাথা হেঁট করে দিয়েছি—সমাজের কলঙ্ক-পসারা মাথায় নিয়েছি। তুমি অতটা নিষ্ঠুর হ'ও না। ক্ষিতীশ! ক্ষিতীশ—" বিজলীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। তাহার মুখ হইতে আর বাক্য নিঃসৃত হইল না। ক্ষিতীশের পদদ্বয় ধরিয়া সে বালিকার মত রোদন করিতে লাগিল। ক্ষিতীশ জড় পাষাণ অপেক্ষাও জড় হইয়া ক্ষণেক নিস্তব্ধ রহিল। পরে সজোরে নিজের পা ছিনাইয়া লইয়া

ঈষৎ কুপিতভাবে উত্তর করিল—"তুমি বড় বাড়াবাড়ি করে তুলেছ। আমায় বিরক্ত করে মারলে যে? যাও তুমি এখান থেকে!"

বিজলী তখনও ফোঁপাইতেছিল। কোন উত্তর করিল না। শুধু নিজের বসনের একাংশ দিয়া মুখ ঢাকিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল।

বিজলীকে নিশ্চল দেখিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র তীব্র স্বরে বলিল—"তুমি যাবে না? না যাও, তবে দারোয়ান ডেকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিব। আর বেশী বাড়াবাড়ি কর, তবে চোর বলে পুলিসে ধরিয়ে দিব। এ কি মামার বাড়ীর আব্দার নাকি? খান্‌কিপনা কর্‌বার জায়গা পাওনি?"

বর্ষণে আকাশ পরিচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। বিজলী চক্ষু মুছিয়া এইবার গর্ব্বিতভাবে দাঁড়াইয়া উঠিল। একবার বেশ করিয়া ক্ষিতীশচন্দ্রের আপাদমস্তক নিরীক্ষণপূর্ব্বক নির্ভীক ও স্পষ্টভাবে উত্তর করিল—"যথেষ্ট হয়েছে, আর না; এর চেয়ে দারোয়ান দিয়ে অপমান করাটা বেশী হবে না। দারোয়ান ডেকো না; আমি নিজেই যাচ্ছি—আর কখনও বিরক্ত কর্‌বো না। তবে এটা মনে রেখো ক্ষিতীশ, পিপীলিকা ক্ষুদ্র হলেও তার জ্বালা দিবার শক্তি যথেষ্ট আছে। আমি চললাম। তবে আমি যদি যথার্থ তোমাকে ভালবেসে থাকি—এর শাস্তি আমারই হাতে তুমি পাবে—পাবে—পাবে।"

নিমেষের মধ্যে বিজলী অন্ধকার মধ্যে কোথায় মিশিয়া

গেল। ক্ষিতীশ ক্ষণেক চিত্রার্পিতের ন্যায় শয়ন কক্ষে দাঁড়াইয়া মনে মনে কি চিন্তা করিতে লাগিল। পরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কক্ষের আলোকটি নির্ব্বাপিত করিয়া দিয়া শয়ন করিল। ঘুম আসিল না—শুধু বিছানায় শুইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বঙ্গে শারদীয়া পূজা। বঙ্গবাসী মাত্রেই আজ আনন্দে মাতোয়ারা। আবাল বৃদ্ধ বনিতা নববেশে নবোৎসাহে উন্মত্ত। প্রেম প্রীতি ভক্তিরসে আজ বঙ্গ প্লাবিত। ঘরে ঘরে মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি হইতেছে। নহবৎ সানাইয়ের মধুর শব্দে এই দুর্ভিক্ষ ও ম্যালেরিয়া পীড়িত বঙ্গ যেন কয়েক দিনের জন্য সমস্ত যাতনা ভুলিয়া আবার সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। নর-গ্রামে কেশবের বাড়ীতে পূজা। স্বামীজি নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথেরও নিমন্ত্রণ হইয়াছে। সাধারণ নিমন্ত্রণ পত্র ত বিলি হইয়াছে—তবে রবীন্দ্রের পত্রের নিম্নদেশে জ্যোতি নিজ হস্তাক্ষরে স্বতন্ত্র লিখিয়া দিয়াছে—"রবিদা! তুমি না আসিলে পূজা সম্পূর্ণ হইবে না।" এই কয়টি কথার পর জ্যোতির্ম্ময়ীর নাম স্বাক্ষরিত ছিল।

রবীন্দ্রের নরগ্রামে আসিবার ততটা অভিলাষ ছিল না। রবীন্দ্রের নরগ্রামে আসিবার অনিচ্ছার বিশেষ কারণ ছিল। নরগ্রামের সহিত তাহার আর সম্পর্ক কি? যে মাতুলালয়ে সে এতদিন কাটাইয়াছে—গত বর্ষার বন্যায় সেই বাড়ীর কোন অস্তিত্ব নাই—আছে শুধু বড় বড় মৃত্তিকার স্তূপ। সহায় সম্পত্তি হীন, আত্মীয় স্বজন বিহীন

রবীন্দ্রনাথ কি করিতে আর নরগ্রামে যাইবে? কেশব ও জ্যোতী—তাহাকে যথেষ্ট স্নেহ করে বটে, কিন্তু সেই স্নেহের দাবী করিবার তাহার অধিকার কি? রবীন্দ্র শিক্ষিত ও বয়স্থ। এখন সে সংসার দেখিয়াছে—সংসার চিনিয়াছে। এজন্য এখন তাহাদের নিকট হইতে যত দূরে সরিয়া থাকিতে পারে ততই তাহার নিজের পক্ষে মঙ্গল—জ্যোতীর পক্ষেও মঙ্গল। তাই আর পবিত্র স্মৃতিমাথা শৈশবের ক্রীড়াভূমি নরগ্রামে যাইতে মন সরে না। তথাপি জ্যোতির্ম্ময়ীর আহ্বানে রবীন্দ্রকে বর্দ্ধমান যাইতে হইল। যাত্রা করিবে এমন সময়ে একটী মাড়োয়ারী ব্রাহ্মণ জোড়াবাগানের মেসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণটি আসিয়াই রবীন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গলা মিশ্রিত হিন্দী ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার নাম কি রবীন্দ্রনাথ?"

"হাঁ। আপনি কোথা থেকে আসছেন ও কি প্রয়োজনে আসছেন শুনতে পাই কি?"

"আপনার কাছেই বলবার জন্তে এসেছি, আর আপনি শুনতে পাবেন না? আপনি রসময় বাবুর প্রথম পুত্র রবীন্দ্রনাথ বোধ হয়?"

"আজ্ঞে হাঁ, তাই বটে। আপনার নাম?"

"আমার নাম চন্দ্রমল পাকুড়িয়া। আমি হরিদ্বারবাসী। আপনার পিতা আজ ৮ বৎসর হইল একবার হরিদ্বার তীর্থে গমন করেন। আমিই আপনাদের তীর্থপাণ্ডা। একদিন তথায়

থাকা কালীন তিনি সাধুসন্ন্যাসী ভোজন করাইবার ইচ্ছা করেন। সমস্ত আয়োজন ঠিক—কিন্তু ভোজনের নির্দ্দিষ্ট দিনের ঠিক পূর্ব্বরাত্রে তাঁহার শয়ন কক্ষে চুরি হয়—চোরে সমস্ত টাকাকড়ি চুরি করিয়া লয়। তিনি নিঃস্ব হইয়া পড়েন। আমি সেই দিন তাঁকে ১০০০৲ মুদ্রা (টাকায় ৫ সুদে) কর্জ্জ দিয়া তাঁহার সম্মান রক্ষা করি। তৎপরে কার্য্য সমাধা হইলে তিনি দেশে চলিয়া আসেন।* বলিয়া আসেন, দেশে গিয়া আমার টাকা সুদে আসলে বেবাক পরিশোধ করিবেন। তাহার পরই কান্যকুব্জে আমার পৈতৃক ভূসম্পত্তি লইয়া সরিকানি বিবাদ বাধে, এ জন্য আমি হরিদ্বার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই। জমির জন্য যে বিবাদ বাধে, তাহা লইয়া উভয় পক্ষের মধ্যে মারপিট হয়। ফলে একজন খুন ও কতকগুলি লোক জখম হয়। আমি অপরাধী শ্রেণীভুক্ত হইয়া দায়রার বিচারে ৭ বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হই। কাজেই ঐ টাকা ফেরত লইবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। কারাবাস সমাপ্ত হইলে, শুনিলাম যে রসময় বাবু ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন। বহুকষ্টের সঞ্চিত ১০০০৲ টাকা সুদে আসলে আজ ২০০০৲ টাকার উপর হইয়া গিয়াছে। আমি ২০০০৲ পাইলেই সন্তুষ্ট হই। এই টাকার লোভ আমি ছাড়িতে না পারিয়া বরাবর খুলনায় তাঁহার বাড়ী যাই। তথায় শুনিলাম তিনি আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন। ক্ষিতীশকে তাঁহার পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে বলায় তিনি বড়ই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন।"

একটু উৎকণ্ঠার সহিত রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল—"সে কি বলল ?"

"সে কথা আর কি বলবো, বাবা! বললেন—সাত আট বৎসরের দেনা, সে তামাদী হয়ে গেছে। আর টাকা যে তিনি কর্জ্জ নিয়েছিলেন তারই বা প্রমাণ কি ?"

"আপনি উত্তরে কি বললেন ?"

"আমি বললাম—তামাদী হয়েছে বটে। রাজার আইন মতে পাওনা টাকার তামাদি হয়, কিন্তু ন্যায় ও ধর্ম্মের আইনে আবার তামাদি কি ? প্রমাণ চান—প্রমাণ দিব। তবে পিতৃঋণ তামাদি হইলেও পুত্রের কর্ত্তব্য তা পরিশোধ করা। এখন আপনি দিবেন কি না জানতে চাই।"

"তাতে সে কি বলল ?"

"বললেন—না—আমি দিব না। আইনের-অমর্য্যাদা আমি কখনও করতে পারব না।"

"তারপর ?"

"আমি অনেক কাকুতি মিনতি করিলাম। গরিব ব্রাহ্মণের টাকা পরিশোধ করিয়া পিতাকে ঋণজাল হতে মুক্ত করিবার জন্য অনেক কথা বলিলাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ফলে তিনি দ্বারবান্ দ্বারা গলাধাক্কা দিয়া আমাকে তাড়াইয়া দিলেন।"

"পাষণ্ড !" বলিয়া রবীন্দ্রনাথ শিহরিয়া উঠিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন "তারপর ?"

"এখন আমি আপনার কাছে এসেছি। আপনি এর কোন

প্রতিকার করেন ভালই, নচেৎ আপনার পিতা আমার নিকট ঋণজালে বদ্ধ রহিলেন। আমি আর কি করিতে পারি? উপরওয়ালার বিচারে যাহা হয় তাহাই হইবে। আপনার মতামত জানতে পারলে আমি চলিয়া যাই।"

ক্ষিতীশের ব্যবহারের কথা শুনিয়া রবীন্দ্র মনে মনে ভাবিতে লাগিল—"লক্ষপতি ক্ষিতীশ বাবার ২০০০৲ টাকার ঋণ পরিশোধ করিতে পরাঙ্মুখ। হায় রে অর্থ! হা রে মানবের লালসা!" ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন—"দেখুন পাণ্ডাজি! আমি নিঃস্ব দীন—পথের ভিখারী অপেক্ষাও হীন। আমি একত্রে ২০০০৲ টাকা জীবনে কখন দেখি নাই। এত টাকা একবারে আমি দিব কি রূপে? আমি কায়িক পরিশ্রম করে মাসিক ৩০।৪০ টাকা রোজগার করি। আমি মাসে মাসে আপনাকে ২০ টাকা করে দিয়ে পিতৃঋণ পরিশোধ করতে প্রস্তুত। আপনি দয়া করে এই ভাবে টাকাটি নিয়ে স্বর্গীয় পিতাকে ঋণ মুক্ত করুন?"

"জীতা রও বেটা!"

"কিন্তু আপনি আমাকে একটা প্রমাণ দেখান যে, পিতা ঠাকুর আপনার নিকট হতে ১০০০৲ টাকা কর্জ্জ নিয়েছিলেন।"

"আলবাৎ! তাঁর গীতা খানি নাকি আপনার কাছেই আছে?"

"আছে—সেটি আমার পবিত্র ইষ্টদেব—আমার প্রাণ।"

"সেই গ্রন্থখানি আমি চাই।"

"প্রাণ থাকতে উটি আপনাকে দিতে পারব না। ওতে আমার পিতার স্মৃতি, পিতার শুভাশীর্ব্বাদ, পিতার গভীর অপত্যস্নেহ লুকান আছে! ব্রাহ্মণ, সে পুস্তকের আকিঞ্চন করবেন না।"

"আমি সে পুস্তক লইতে চাই না, বেটা! সেই পুস্তকখানি একবার আমার সম্মুখে আন।"

রবীন্দ্র গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক চন্দন পুষ্পমণ্ডিত পিতার গীতা খানি ব্রাহ্মণের সম্মুখে আনয়ন করিল। আনিবামাত্র ব্রাহ্মণ পুস্তকখানি চিনিলেন। বলিলেন—"হাঁ। এই বটে। আচ্ছা, এই পুস্তকের ২০০ পৃষ্ঠা খোল।"

রবীন্দ্রনাথ তাহাই করিল। তাহার পর ব্রাহ্মণ বলিলেন—"২০০ পৃষ্ঠার নিম্নদেশে কি লেখা আছে পড়।"

রবীন্দ্রনাথ পড়িলেন—"অস্তকার তারিখে হরিদ্বারবাসী পাণ্ডা চন্দ্রমল পাকুড়িয়ার নিকট ১০০০৲ টাকা কর্জ্জ লইলাম। সাক্ষী—ধর্ম্ম। "শ্রীরসময় মুখোপাধ্যায়।"

রবীন্দ্রনাথ পিতার হস্তাক্ষর অল্পদিন দেখিয়াছিল, কিন্তু তাহাতেই চিনিল। বলিল—"ব্রাহ্মণ ক্ষমা করুন। আর প্রমাণ চাই না। আমি পিতৃঋণ পরিশোধ করব।" এই বলিয়া গীতাখানি মস্তকে লইয়া পুনরায় গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক অনতিবিলম্বে নোট, টাকা, আধুলি, পয়সা মিলাইয়া ২০ টাকা আনিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে অর্পণ করিয়া বলিল—"এই আজ হতেই আরম্ভ করলাম।

প্রত্যেক মাসের এই তারিখে আপনি ২০৲ টাকা করে পবেন।"

ব্রাহ্মণ ২০ টাকা লইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। ফলে রবীন্দ্র বৈকালের ট্রেণ ধরিতে পারিল না। সেদিন আর বর্দ্ধমান যাত্রা করা ও ঘটিয়া উঠিল না।

বিংশ পরিচ্ছেদ

আজ মহাষ্টমী। নবগ্রামে কেশব বাঁড়ুয্যের বাড়িতে ভারী ধুম। সন্ধিপূজার সামান্য দেরী আছে। বৃদ্ধ কেশব উৎকণ্ঠিত ভাবে এক একবার সদরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন আবার পূজার আয়োজন ও উপকরণাদি ঠিক হইতেছে কি না, লগ্ন কতক্ষণে উপস্থিত হইবে এই লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছেন। এই ব্যস্ততার মধ্যে একটা দুশ্চিন্তার ভাব তাঁহার মুখে বেশ প্রকটিত রহিয়াছে।

অন্দরে সুহাসিনী প্রাতঃস্নান করিয়া শুদ্ধাচারে পূজার নৈবেদ্য ও অন্যান্য পূজার উপকরণ পাত্রে পাত্রে সাজাইতেছে, আর জ্যোতির্ম্ময়ী—সুহাসিনীর ছোট ভগ্নী কণককুমারীর গুছি দিয়া কেশ বিন্যাস করিয়া দিতেছে। কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ একবার অন্দরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"হাঁরে সুহাসী! রবি আসে নি?"

"না দাদামশাই! এখনও ত এলো না।"

"আক্কেলটা দেখলে?" এই বলিয়া বৃদ্ধ একটু দাঁড়াইয়া উদাস ভাবে এদিক ওদিক চাহিলেন। পরে পুনরায় বলিলেন, "মরুক্ গে—যাক্‌গে। সে আর আমাদের কে বল না? পর বইত নয়? তার জন্যই কেন এত ভেবে মরি?" এই বলিয়া তিনি

অন্দর ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে বৃদ্ধের কোমরের কশিটি খুলিয়া গেল ও পরিধেয় পট্টবস্ত্রখানি খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। বৃদ্ধ অসংযত বস্ত্রখানি ধরিয়া ফেলিলেন, কিন্তু কাছাটি খুলিয়া মাটিতে লুটাইতে লাগিল। বৃদ্ধ একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন—সঙ্গে সঙ্গে আরও কুপিত হইয়া উঠিলেন। পরে বলিলেন—"যাক্ গে। আমি নিজের কাজ করিগে। আসতে হয় আসবে—না আসতে হয় না আসবে। জগতটাই বেইমান—তা কার কথাই বা বলি বল।"

সুহাসিনী বৃদ্ধের এইরূপ অভিমানসূচক কঠোরোক্তি গুলি শুনিয়া আর নীরব থাকিতে পারিল না। বলিল—"দাদামশাই! তার কোন বিপদ হয়নি ত? সে ত আপনার নিমন্ত্রণের অমর্যাদা করবার লোক নয়। আপনাকে সে দেবতার চেয়েও ভক্তি করে। আমার বোধ হয় কোন দুর্ঘটনা বা ঘটে থাকবে। তা না হ'লে আজ এই মহাষ্টমীর দিন নিশ্চয়ই সে আসতো।"

বৃদ্ধের চিন্তার স্রোত এইবার অন্য দিকে ছুটিল। কথাগুলি শুনিয়া তিনি তাহার সারবত্তা বুঝিলেন—একটা বড় রকমের ঢোক গিলিয়া বৃদ্ধ বলিলেন—

"তাও ত হতে পারে। অসম্ভব কিছু নয়—কিন্তু যদিই কোন বিপদ ঘটে থাকে, তা হ'লে এখানে সংবাদ দিলেই ত পারত।"

"তা কি এ সময়ে পারে দাদামশাই? বাড়ীতে এত বড় একটা কাজ। সে ত আর ছেলে মানুষ নয়। হাজার হোক বয়স হয়েছে—লেখা পড়া শিখেছে। কি ক'রে এই শুভ

কার্য্যের মধ্যে একটা অশুভ সংবাদ দিয়ে আপনাকে বিব্রত করে তুলতে পারে বলুন ?"

"না, না, ছেলেটা ভারী সু—ভারী বুদ্ধিমান। তুমি যা বলছ তা খুব ঠিক। তবে কি তার সত্য সত্যই কোন বিপদ হলো নাকি? তাই ত! ছোঁড়াটা ভারী মায়াবী। আমার কে—তবু যেন আমায় যাদু করে রেখেছে। আমি তার গুণে মুগ্ধ হয়ে আছি, দিদি! একবার বিনোদকে বর্দ্ধমান ষ্টেশনে পাঠাব না কি ?"

"না থাক। এখন সন্ধিপূজার সময় হলো। আপনি ওদিকে দেখুন গে। পরে যা হয় তাই করবেন।" জ্যোতির্ম্ময়ী নীরবে দাদা মহাশয়ের সহিত সুহাসিনীর কথোপকথন একাগ্রচিত্তে শুনিতেছিল। ফলে কণককুমারীর চুলের বিনান শেষ হইবার পূর্ব্বেই অন্যমনস্ক ভাবে জ্যোতির্ম্ময়ী ডগের দড়ি জড়াইয়া দিতেছিল। কণককুমারী ইহা বুঝিতে পারিয়া মনে মনে কুপিত হইয়া গর্জ্জন করিতেছিল। আর মাঝে মাঝে মাথা নাড়িয়া জ্যোতির ভ্রম দেখাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু যখন দেখিল যে, জ্যোতির্ম্ময়ী কিছুতেই তাহার ভ্রম সংশোধন করিল না—তখন চেঁচাইয়া উঠিল—"ছাই হচ্ছে—চুল বাঁধা হচ্ছে—মাথা হচ্ছে—মুণ্ডু হচ্ছে। কতকগুলো চুল এলো, কতকগুলো চুল বাঁধা—এ রকম চুল বাঁধা কখন দেখিনি, আমার চুল বাঁধতে হবে না।"

সুহাসিনী ভগ্নীর এইরূপ উচ্চ কণ্ঠ শুনিয়া তাহার কেশ বিন্যাসের প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। সে না হাসিয়া থাকিতে

পারিল না। হাসিতে হাসিতে সে জ্যোতির্ম্ময়ীকে উদ্দেশ পূর্ব্বক কহিল—"ওমা সত্যই ত—তুই কি লা এ ক'দিনে যেন জবু থবু মেরে গেছিস্। বাড়ীতে এত বড় একটা কাজ—সমথা মেয়ে —কোথায় কাজে কর্ম্মে চরকীর মত ঘুরবি, তা না; যেন প্রাণে প্রাণ নেই, মনে মন নেই। তুই কি রকম বল দেখি?" তাহার এই তীব্র মন্তব্যে জ্যোতির্ম্ময়ী একটু অপ্রতিভ হইল। একটু রাগিয়া উত্তর করিল—"তুই আর বকিস্ নি বাবু। সব কাজেই উনি আমার দোষ ধরতে আসেন। আমি কিছু করতে পারবো না—যা।" এই বলিয়া কণককুমারীর অর্দ্ধবদ্ধ কেশগুচ্ছ খুলিয়া দিয়া জ্যোতি দাঁড়াইয়া উঠিল।

তখনও কেশব বাবু অন্দরের উঠানে দাঁড়াইয়া মৌন হইয়া কি ভাবিতেছিলেন। জ্যোতীর্ম্ময়ীকে দণ্ডায়মান দেখিয়া বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বল জ্যোতী, একবার রবীকে দেখতে বিনোদকে পাঠাব না কি?"

উত্তর পাইবার পূর্ব্বে অন্দরের প্রাঙ্গনে রবীন্দ্র সশরীরে উপস্থিত হইয়া ডাকিল—"দাদা মশাই!"

"কেশব বাবু দেখিলেন রবীন্দ্র নাথ সম্মুখে আসিয়া হাজির। আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন—"এসেছ! এস ভাই এস! বড়ই দুর্ভাবনায় ফেলেছিলে। কাল এলে না কেন ভাই?"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পদধূলি লইয়া বলিল—"সে সব অনেক কথা দাদামশাই! কাল বৈকালে রওনা হব, এমন সময়ে একটা বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হওয়ায় আসা স্থগিত করতে বাধ্য

হলাম। সে সব কথা পরে বলবো—এখন একবার বাহিরে চলুন। স্বামীজি ৺কাশীধাম থেকে এসেছেন। ষ্টেশনের বাহিরে এসে দেখি, তিনিও সকালের ট্রেণে বৰ্দ্ধমান পৌঁছেছেন। দুজনে এই পথটা এক সঙ্গেই এসেছি।”

“আমার আজ কি সৌভাগ্য—চল দাদা, চল! স্বামীজির পদধূলি এ বাড়ীতে পড়বে এটা আশাতীত”—এই বলিয়া বৃদ্ধ অন্দরের বাহিরে চলিয়া গেলেন। এদিকে কণককুমারীর কেশবিন্যাসের বিভ্রাট ঘটায়—সে রোষে ক্ষোভে মর্ম্মাহত হইয়া তাহার পূজার কাপড় চোপড় খুলিয়া ফেলিয়া গৃহের এক কোণে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছিল—আর চিৎকার করিতেছিল—“আমার কিছু চাই না—আমি কাপড় চোপড় কিছু পরবো না—আমি কিছু খাবো না—কিছু করবো না।”

কেশব ও রবীন্দ্র অন্দর হইতে চলিয়া যাইলে পর জ্যোতির্ম্ময়ী কণককুমারীর অভিমান দেখিয়া তাহার নিকট গিয়া আদর করিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল ও মুখে একটি চুমা দিয়া বলিল—“রাগ করো না দিদিটী—লক্ষ্মীটি—সোণাটি আমার! এস দিদি, আমি এখনি খুব ভাল ক’রে চুল বেঁধে কাপড় পরিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছি। এস দিদি আমার।”

অল্প সময়ের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময়ী সুচারুভাবে কণককুমারীর চুল বাঁধিয়া জামা কাপড় পরাইয়া খুকুরাণীর বেশে সাজাইয়া দিল। কণককুমারী আহ্লাদে নাচিতে নাচিতে সুহাসিনীর নিকট আসিয়া বলিল—“দিদি! দেখ—কেমন হয়েছে?”

"বেশ হয়েছে—কে করে দিলে রে?"

"ছোট দিদিমণি দিয়েছে। ছোট দিদিমণি আমাকে বড় ভালবাসে।"

কণক জ্যোতির্ম্ময়ীকে ছোট দিদিমণি বলিয়া ডাকিত।

"আমি বুঝি ভালবাসি না।"

"তোমার চেয়ে সে আমায় বেশী ভালবাসে।"

"বটে"!

"হুঁ"।

"দূর বেইমান্।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ

যথারীতি মহাষ্টমী নবমী পূজা শেষ হইল। গ্রামবাসী ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের আদর আপ্যায়নের কিছুমাত্র ত্রুটি হইল না। রবীন্দ্রনাথ আহূত ব্যক্তিদের অভ্যর্থনা পরিবেশনাদি কার্য্যে যথাসম্ভব সাহায্য করিল। চর্ব্ব্যচুষ্যের কোন অভাব হইল না। সমস্তই সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হইল। দেখিতে দেখিতে এত সমারোহ আমোদ-আহ্লাদ যাত্রা নৃত্যগীতাদির অবসান হইল। বিজয়া দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া কেশব বাঁড়ুয্যে সে বৎসরের মত শারদীয়া পূজার অবসান করিলেন। পরদিন রবীন্দ্রনাথ ও স্বামীজি নরগ্রাম পরিত্যাগ করিবেন এইরূপ স্থির করিলেন। প্রাতে রবীন্দ্রনাথ একবার শত স্মৃতি বিজড়িত মাতুলালয়ের ভগ্ন-স্তূপগুলি দেখিতে গেল। বাস্তর ভগ্নাবশেষ দেখিয়া দূর অতীতের কত স্মৃতি হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। স্বর্গগতা জননীকে মনে পড়িল। এই স্থানে জননীর স্নেহছায়ায় বসিয়া এক দিন এত দুঃখে এত কষ্টে অমরাবতীর সুখভোগ করিয়াছিল। জননীর ক্রোড়ে থাকিয়া এই তীব্র জ্বালাময় স্বার্থপূর্ণ সংসারের কোন কষ্ট অনুভব করে নাই। এখন এত বড় বিশ্বমাঝে তাহার আপন বলিতে আর কেহই নাই। সেই একমাত্র দুঃখিনী অসহায়া অবলা রমণীর অস্তিত্বে তাহার হৃদয়ে কত বল কত উৎসাহ জাগিয়া থাকিত। শুধু তাঁহারই অস্তিত্বে এই সংসারটা যেন কত বন্ধুবান্ধব আত্মীয়

স্বজন পরিবৃত বলিয়া মনে হইত। আজ তাহার সেই স্নেহময়ী জননী কোথায়? একদিন রবীন্দ্রের সংবাদ না পাইলে যিনি একদণ্ড সুস্থির থাকিতে পারিতেন না—সামান্য মাথা ধরিলে যিনি কাঁদিয়া আকুল হইতেন—দেবতার স্থানে কত মানত করিতেন—আজ তিনি কোন্ রাজ্যে? এত স্নেহ, এত যত্ন, এত মমতা কোথায় গেল? দীনা অভাগিনী মাতাকে একদিনের জন্য সে সেবা করিতে পারিল না—একদিনের জন্য তাঁহার দুঃখ ঘুচাইতে পারিল না—এ কি কম পরিতাপের বিষয়? রবীন্দ্রনাথের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তাঁহার গণ্ড বহিয়া অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

এই সময় স্বামীজি রবীন্দ্রকে দেখিতে না পাইয়া তাহার অনুসন্ধানে ফিরিতেছিলেন। সহসা রবীন্দ্রকে নির্জ্জনে দেখিতে পাইয়া তিনি মনে মনে বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। রবীন্দ্র স্বামীজিকে দেখিয়া একটু সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু স্বামীজির তীক্ষ্ণদৃষ্টি সে এড়াইতে পারিল না। স্বামীজি নিকটে আসিয়া স্নেহভরে তাহার গায়ে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"রবি! কাঁদছ? কাঁদছ কেন ভাই?"

বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। রবীন্দ্র কোন উত্তর করিতে পারিল না। একবার শুধু তাহার মুখের পানে চাহিল—তাহার চিবুক বহিয়া অজস্রধারে অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সহৃদয় স্বামীজি রবীন্দ্রের প্রাণের ব্যথা বুঝিলেন। স্নেহভরে রবীন্দ্রকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন। এইবার রবীন্দ্রের বহুদিনের

রুদ্ধ অশ্রু সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর গৈরিক বসন সিক্ত করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী কোন বাধা দিলেন না—কেবল তাহার গায়ে মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ অশ্রুবিসর্জ্জনের পর যখন রবীন্দ্রের হৃদয়ের ভার কতকটা কমিয়া আসিল—তখন তিনি বলিলেন—"মাকে মনে পড়েছে? কেঁদনা ভাই। দুনিয়ার নিয়মই এই। চোখের জল মুছে ফেল! তোমার এক এক বিন্দু অশ্রু এক একটি ভীষণ শেলের মত আমার বুকে আঘাত করে। আমার এত চেষ্টা এত প্রয়াস সমস্তই নিষ্ফল হতে চলেছে—তবু আমি হতাশ হইনি। যদি মা শঙ্করী কখন আমায় দিন দেন, তবে বুঝাব আমার প্রাণে এ গুরুভার কেন? সংসারত্যাগী বৈরাগী আমি—আমি কেন যে তোমার মায়ায় জড়িয়ে আছি—তা সেই দিন তোমাকে বুঝাব। যাক, এখন চোখের জল মুছে ফেল। শুনলাম তুমি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছ। এখন কি করবে তা আমি জানতে চাই।"

"কি করব স্বামীজি! সংসারে থাকবার মত আমার কোন বন্ধনই নাই। স্বজনশূন্য, অর্থশূন্য, মমতাশূন্য সংসার মাঝে কি নিয়ে থাকব? সংসারে থাকতে আমার বিন্দুমাত্র প্রবৃত্তি হয় না। মনে করেছি যে, উপস্থিত দিন কতক কলিকাতায় থেকে কিছু উপার্জ্জন করে সর্ব্বাগ্রে পিতৃঋণটি পরিশোধ করব। তার পর কাশীধামে গিয়ে আপনারই শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করব। আপনি আপনারই মন্ত্রে আমাকে দীক্ষিত করে সংসার-

ত্যাগী সন্ন্যাসীর পথ আমাকে দেখিয়া দেবেন। অন্য আশা বা আকিঞ্চন আমার নাই।"

"পিতৃঋণ" কথাটি শুনিয়া স্বামীজি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। তাই আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার পিতার কি ঋণ আছে? আর যদিই থাকে তা তোমাকে দিতে হবে কেন?"

"আজ্ঞে! সে একটা বড়, বিস্ময়কর ও অভাবনীয় ঘটনা বটে।" এই বলিয়া চন্দ্রমল পাকুড়িয়াকে লইয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সে সমস্তই রবীন্দ্র স্বামীজিকে বলিল।

স্বামীজি ক্ষিতীশের ব্যবহারের কথা শুনিয়া মনে মনে তাহাকে শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন। আর রবীন্দ্রের পিতৃভক্তি দেখিয়া তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। অন্তরের সহিত তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে বলিলেন—"ভাই! তোমার সদ্‌গুণ ও উদারতার বলে তুমি এ সংসারের কৃতিত্ব ও বহু যশলাভ করবে। তোমার কি এই বয়সে বৈরাগ্য সাজে? তুমি শিক্ষিত ও চরিত্রবান। সংসারী হতে হবে বৈ কি? পৈতৃক সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হয়েছ বলে কি জীবনটা এইভাবে কাটাবে? না—তা হবে না। পৌরষ ও মনুষ্যত্ব বলে তোমাকে দশের একজন হ'তে হ'বে।" সামান্য লোকের মত এ দুর্ব্বলতায় আত্মসমর্পণ করা তোমার সাজে না। হৃদয়ে বল নিয়ে এস। তোমাকে বিবাহ করে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করতে হ'বে। তোমার মত হৃদয়বান শিক্ষিত

লোক সংসারে থাকলে অনেক দীন দরিদ্র আতুরের কষ্ট মোচন হবে। তোমাকে গৃহী করবার জন্যই আমার এত প্রয়াস।”

“কেন? এ প্রয়াস আপনার কেন? সংসার বিরাগী সন্ন্যাসী আপনি—আপনার এ হতভাগার উপর এত মায়া কেন?”

“কি বলব, রবি! এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আজ আমি অক্ষম। এখন বল—তুমি আমার অনুরোধ রাখবে কিনা?”

“আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। কিন্তু আমার মনের অবস্থা বুঝে আমায় ক্ষমা করবেন। সংসারে থাকতে আমার প্রবৃত্তি নাই। সংসারে থাকবার কোন বন্ধন—কোন দায়িত্ব আমার নাই। তবে কেন সাধ করে এ বিড়ম্বনা ভোগ করা—স্বেচ্ছায় কঠিন লৌহ শৃঙ্খল পায়ে বাঁধা? আমাকে আপনার শিষ্য রূপে গ্রহণ করুন—সংযম শিক্ষা দিন—যাতে ত্যাগের মন্ত্র শিক্ষা করে প্রকৃত বৈরাগ্য গ্রহণ করতে পারি সেই পথে আমায় হাত ধরে নিয়ে চলুন। পূর্ব্বজন্মে কত মহাপাপ করেছি তাই আজ পিতা কতৃক বিতাড়িত, ভ্রুকুটিপূর্ণ কঠিন সমাজে আমি হীন, অতি নগণ্য ঘৃণিত ও আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক উপেক্ষিত। স্বামীজি! আত্মজীবনী আলোচনা করতে করতে এক একবার সাধ হয় আত্মহত্যা করে এ জীবনের অবসান করি।”

"ছি! ছি! বাতুলের মত কথা কহিও না। অকারণে ও অবিচারে তোমার পিতা তোমাকে অতি কঠোর দণ্ড দিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু সে ভ্রম তিনি পরে বুঝতে পেরে তা সংশোধন করেছেন—এই আমার বিশ্বাস। কিন্তু দৈব নিগ্রহে ও কুটিল লোকের চক্রান্তে এই সংশোধনের প্রমাণটি আমাদের উপস্থিত নয়ন গোচর হচ্ছে না। কিন্তু আমার মনে হয়, পরম করুণাময়ের রাজ্যে পাপের ও অধর্ম্মের জয় কখন হতে পারে না। ঘোর অমানিশা কতক্ষণ থাকে রবি? প্রখর রবি তোমার আকাশে অবশ্যই উঠিবে। তুমি বালক সুলভ চপলতা পরিত্যাগ কর। প্রকৃত কর্ম্মী হয়ে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করবার জন্য প্রস্তুত হও। যখন উপযুক্ত সময় আসবে—তখন বৈরাগ্য অবলম্বন করতে পার—বানপ্রস্থে তো হিন্দুরই অধিকার।"

"স্বামীজি! বৃথা আশ্বাস বাক্যে ভুলিয়ে আপনি আমায় সংসার গারদে প্রবেশ করাবেন না। পিতৃঋণ পরিশোধ পর্য্যন্ত আমি যেমন আছি সেই মতই থাকব। তার পর আমি একেবারে কাশীধামে আপনার মঠে উপস্থিত হয়ে আপনারই শরণাগত হব। কাশীর মণিকর্ণিকার ঘাটে মায়ের অন্তিম কালের ঘটনাগুলি সর্ব্বদাই মনে জাগে। মনে হয় দিনরাত সেই খানেই বসে থাকি—মনে হয় যেন সেইখানে আমার বড় আপনার—আমার বড় স্নেহের জননী আঁচল পেতে বসে আছেন। সেই আমার পবিত্র স্থান শান্তিময় স্বর্গ। আমি অন্য শিক্ষা চাই না—অন্য দীক্ষার আমার আবশ্যক নাই।"

স্বামীজি বলিলেন—"রবীন্দ্র, এতদিনে তোমার কি এই শিক্ষা হ'ল? ক্লীবত্ব পরিত্যাগ কর—পুরুষ ব'লে নিজেকে পরিচয় দাও। সব গেছে, আবার সব হবে। সংসার সংগ্রামে স্ত্রীলোকের ন্যায় অল্প শোকে ভেঙ্গে প'ড়না। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" এ মহাবাক্য ভুলে যেও না। আশীর্ব্বাদ করি ভগবান তোমার সহায় হ'ন।"

রবীন্দ্র আর বিশেষ কিছু বলিতে পারিল না, চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

স্বামিজী বলিলেন "আচ্ছা সময়ান্তরে ও বিষয়ের আরও আলোচনা হবে। উপস্থিত একবার নকুলেশ্বরের মাথায় একটু জল দিয়ে আসি। আহারাদি করে রওনা হ'তে হ'বে, প্রস্তুত হয়ে নাও।"

স্বামীজি চলিয়া গেলেন।

স্বামীজি প্রস্থান করিলে রবীন্দ্রনাথ আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। এমন সময়ে মৃত্তিকার ভগ্ন প্রাচীর পার্শ্ব হইতে সদ্যস্নাতা অসম্বদ্ধ-কুন্তলা অর্দ্ধবিকশিত মন্দার কলিকাসম জ্যোতির্ম্ময়ী রবীন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। জ্যোতির্ম্ময়ী জিজ্ঞাসা করিল—

"রবিদা! তুমি আজ কলিকাতায় যাবে?"

রবীন্দ্রের চমক ভাঙ্গিল। সম্মুখে জ্যোতির্ম্ময়ীকে দেখিয়া মনোভাব পরিবর্ত্তিত করিয়া উত্তর করিল—"হাঁ জ্যোতী! আজই যাবো।"

"আজই ?"

"আজই।"

"কেন ? লক্ষ্মীপূজা অবধি থাকলে কি ক্ষতি হয় ?"

"ক্ষতি এমন কি হয়—জ্যোতি ! ক্ষতি কিছুই না। তবে আমি আজ যেতে চাই।"

"কেন, রবিদা ? এখানে তোমার কোন কষ্ট হচ্ছে ?"

"ছি ! ছি ! ওকি কথা বলছ ? কষ্ট কেন হবে ?"

"তবে ?"

"তবে কি ?"

"তবে যাচ্ছ কেন ?"

রবীন্দ্র হাসিয়া ফেলিল। বলিল "যাচ্ছি কেন এর উত্তর কি দিব ?"

"ও আমাদের পর ভাব বুঝি ? তাই আমাদের বাড়ী এসে নিমন্ত্রিত লোকের মত এসে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে চলে যাবে, নয় ? আমরা তোমাকে লক্ষ্মীপূজার আগে কিছুতেই যেতে দেব না।"

"ছি ! ছেলে বুদ্ধি করো না। তোমাদের ঋণ এ জীবনে শুধতে পারবো না। তোমার দাদামশায়ের অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালবাসা জীবনের শেষ দিন অবধি মনে জেগে থাকবে। তবে কি জান—আমার এখানে থাকাটা উচিত নয়। তুমি এখনও বালিকা, তুমি সংসারের নিয়ম ও শাসন সম্বন্ধে কিছুই জান না—তাই ছেলেমানুষী করছো।"

"আমি ও সব জানতে চাই না। দেখ রবিদা! তুমি স্বামীজিকে যা বলছিলে তা সব আড়াল থেকে লুকিয়ে শুনেছি।"

"শুনেছ?"

"ঠিক ঠিক সব শুনেছি। তুমি আমাদের সব ছেড়ে চলে যাবে? কাশী গিয়ে স্বামীজির কাছে থাকবে?"

তাহার কথা শুনিয়া রবীন্দ্র একটু বিচলিত হইল। বালিকাকে কি উত্তর দিবে তাহা প্রথমে খুঁজিয়া পাইল না। চুপ করিয়া ক্ষণেক নীরব রহিল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী যখন কোন উত্তর পাইল না, তখন সে আবার জিজ্ঞাসা করিল—

বল না, রবিদা? আমাদের ছেড়ে তুমি একেবারে চলে যাবে?"

"তাই যদি যাই তাতে কি ক্ষতি হয়—জ্যোতি!"

"একেবারে চলে যাবে—আর আসবে না?"

"তাতেই বা ক্ষতি কি?"—

জ্যোতীর চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া সে উত্তর করিল—"ক্ষতি কি তা কি করে বলবো? আর যদিই কারো কিছু ক্ষতি হয় তাতে তোমার কি আসে যায়"—বলিয়া জ্যোতি মূর্ত্তিকার দিকে দৃষ্টি সংলগ্ন করিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

ক্ষণেক উভয়ে নীরব। পরে জ্যোতির্ম্ময়ী নিজেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিল—"দেখ—রবিদা! তুমি যা করবে

তার উপর আমাদের হাত নাই? কিন্তু একটা কথার জবাব দিয়ে তুমি যেখানে ইচ্ছা চলে যেও—কথাটার উত্তর দিবে কি?"

গম্ভীর ভাবে রবীন্দ্র উত্তর করিল—"কি বল?"

"যদি উত্তর দাও, তবে বলি।"

"বল, উত্তর দিব।"

"এ জগতে সত্য কি তোমার কেউ নেই, রবিদা! কেউ নেই—যার জন্য একবার পেছু তাকাতে পার? এ সংসারে কেউ নেই—যার মায়া বা মমতা তোমায় এতটুকু টেনে রাখতে পারে? কেউ নেই যে, তোমাকে এতটুকু স্নেহের চক্ষে দেখে?" বলিতে জ্যোতীর চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল।

বালিকার প্রাণের কথা রবীন্দ্র প্রাণে প্রাণে বুঝিল। কিন্তু সে এ ভাবের পোষকতা করিতে পারিল না। এরূপ মনোবৃত্তির যে দমন করা জ্যোতির্ম্ময়ীর পক্ষে বিশেষ আবশ্যক তাহা রবীন্দ্র বহুপূর্ব্বে বুঝিয়াছিল। আজ সুযোগ পাইয়া এই অত্যাবশ্যকীয় বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবে বলিয়া বদ্ধপরিকর হইল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে জ্যোতীর হৃদয় ভাবের গভীরতা পরীক্ষা করিবার জন্য উত্তরে বলিল—"জ্যোতি! যে জিনিসটা শুনে কারও কোন উপকার হবে না বরং অপকারের সম্ভাবনা, সে বিষয়টা না জানাই ভাল। তুমি এখন ও সরলা বালিকা! কুটিল সংসারটা এখন চেন নাই। তাই বলি এ প্রসঙ্গ ছেড়ে দেও।"

"না। তুমি এ কথাটির জবাব দিয়ে যেথা ইচ্ছা চলে যেও।" আমি আর অন্য কোন অনুরোধ করবো না।"

"উত্তর শুনলে সুখী হবে ?"

"হাঁ।"

"ভাল। আমি আজ তোমাদের নিকট হতে বিদায় নিয়ে যাচ্ছি। জানিনা কবে আবার দেখা হবে। বিদায়ের পূর্ব্বে যদি একটা সরল উত্তর পেলে তুমি সুখী হও, তবে সে উত্তর আমি দিয়ে যাচ্ছি।"

"তবে বল"।

"আছে—জ্যোতি! এত বড় দুনিয়ার মধ্যে অন্ততঃ একটি দেবী মূর্ত্তি আছে—এ অভাগার জন্য যার আঁখিতে স্নেহ ঝরে —বচনে অমৃত ক্ষরে—হৃদয়ে করুণার-উৎস শত ধারে উৎসারিত হয়। আর—আর কি বলবো। একাধারে অনেক দুর্লভ জিনিসের সমাবেশ সেখানে দেখতে পাই। একধারে এত গুণের সমাবেশ হয়েছে বলেই এখান থেকেই দূরে যেতে চাই, জ্যোতি! এর পর হয়ত পারবো না। আমি অতি হতভাগ্য—আমি অতি তুচ্ছ—নগণ্য কীটের চেয়েও হীন। এ দেবদুর্লভ অমরবাঞ্ছিত পদার্থ আমার যোগ্য নয়। যোগ্য জন যোগ্য আদর পাবে এই ত ভগবানের নিয়ম। পাছে এই নিয়ম ভঙ্গ হয়—পাছে অমরাবতীতে শুষ্ক কঙ্কালের নীরস অভিনয় হয়—পাছে দেবতার পবিত্র সিংহাসন দানবের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়—পাছে দেবতার

কেলিকুঞ্জ তাণ্ডবের রঙ্গমঞ্চে পরিণত হয়—এই ভয়েএই স্থান জন্মের মত পরিত্যাগ করিতে চাই। জ্যোতি! জ্যোতি! তোমাতে এত গুণ আছে বলেই আমি ত্যাগ শিক্ষা করবার জন্য স্বামীজির শরণাগত হ'তে চলেছি। এই জন্যই তোমার কাছ থেকে সরে যেতে চাই।"

রবীন্দ্রর মুখমণ্ডল স্বর্গীয় জ্যোতীতে উদ্-ভাসিত হইয়া উঠিল। রবীন্দ্র আর অধিক কিছু বলিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। জ্যোতির্ম্ময়ী কথাগুলি শুনিয়া নিশ্চল পাষাণের মত একটা মৃত্তিকার স্তূপের উপর বসিয়া পড়িল। তাহার শূন্য দৃষ্টি ও নীরব ভাষা হৃদয়ের অন্তস্থলের অনেক কথা রবীন্দ্রকে জানাইয়া দিল। ক্ষণেক উভয়ে নিস্তব্ধ থাকার পর রবীন্দ্র একটি গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"জ্যোতি! যা জানতে চেয়েছিলে সমস্ত প্রকাশ করে বললাম। জীবনে যাহা কিছু ঘটেছে, সমস্ত ভুলে যাও। তুমি সুখী হও, এই আমার কামনা। অন্য কামনা হৃদয়ে রাখি না।"

জ্যোতির্ম্ময়ী আর নীরব নিশ্চল থাকিতে পারিল না। তাহার গণ্ড বহিয়া অশ্রুরাশি ছুটিতে লাগিল।

তাহার চোখের জল দেখিয়া রবীন্দ্রের মনস্তাপের সীমা রহিল না। পরে বলিল—"ছি! জ্যোতি। কেঁদনা, চল। এখান থেকে চল। প্রকৃত কথা বলতে কি—নিভৃতে তোমাতে আমাতে এরূপ স্থলে অধিক্ষণ কথাবার্ত্তা কওয়া সমাজের চক্ষে দূষণীয়।"

জ্যোতির্ম্ময়ী পুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া উঠিল। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল—

"রবি দা! আর আসবে না? একেবারে চলে যাবে?"

"জ্যোতি! বিদায়ের পূর্ব্বে কেন প্রাণে ব্যথা দাও। তুমি সুখী হও। যেদিন তোমার শুভ বিভাহ হবে—বড় সাধ—সেই দিন এসে দম্পতি যুগলকে প্রাণ খুলে স্নেহাশীর্ব্বাদ করে যাব।"

জ্যোতির্ম্ময়ী কোন উত্তর করিল না। একবার রবীন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উদাস প্রাণে নকুলেশ্বরের মন্দির যাইবার পথ ধরিয়া চলিয়া গেল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

কেশববাবুর বাহির বাটির বৈঠকখানার ঘরের পার্শ্বেই একটী কাছারী ঘর আছে, সেই ঘরে তাঁহার জমিজমা ও বিষয়-সম্পত্তি সংক্রান্ত কার্য্যাদি সমস্তই হইয়া থাকে। আজ এই কাছারী ঘরে বসিয়া কেশববাবু মৌনভাবে ২।১ খানি পত্র ও একটি মামলার রায়ের নকল দেখিতেছেন। তিনি আজ ঘোর চিন্তায় অভিভূত। এ দুশ্চিন্তার যথেষ্ট কারণ আছে। তাঁহার বরাকরে সনৎপুর জমিদারী লইয়া সরকার বাহাদুরের সহিত যে প্রিভি-কাউন্‌সিলের মকর্দ্দমা চলিতেছিল, সেই মামলার রায় বাহির হইয়াছে। প্রিভি-কাউন্‌সিল্ আপিলে তাঁহার হার হইয়াছে। অধিকন্তু তিন কাছারীর খরচা বাবদ ও সরকার বাহাদুরের খেসারত বাবদ (Mesne Profit এর জন্য) প্রায় ৫৫০০০৲ টাকার ডিক্রী তাহার ঘাড়ে চাপিয়াছে। কেশব বাবু এই সংবাদ পাইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন। একে তিনি তাঁহার উকিল ৺রসময় মুখুজ্যের নিকট হইতে ২৫০০০৲ টাকা কর্জ্জ লইয়া বিলাতে আপিল করিয়াছিলেন—এই টাকা সুদে ও আসলে ২৮০০০৲ টাকার উপর হইয়া গিয়াছে। তাহার উপর আবার ৫৫০০০৲ টাকার দাবী মাথার উপর ঝুলিতে চলিল। এত নগদ টাকা কোথায়? এই ঋণ পরিশোধ করিতে হইলে তাঁহার

প্রায় সমস্তই স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিতে হয়। এত বড় নাম ডাক-ওয়ালা মানী জমিদার কেশব বাঁড়ুয্যে আজ ঋণের দায়ে কিরূপে জমিদারী বিক্রয় করিবে? এটা যে বড়ই অপমানজনক। তার চেয়ে যে মৃত্যু ভাল। কেশব বাবু ভাবিয়া আকুল। কি করিবেন? কোথা হইতে এত টাকা সংগ্রহ করিবেন? কি করিয়া এই ঋণ পরিশোধ করিবেন? অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়াও তিনি ঋণ পরিশোধের কোন সুপন্থা খুঁজিয়া পাইলেন না। এই সময় বৃদ্ধ সরকার বিনোদকে সেই ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কেশব বলিলেন—"বিনোদ, এখন উপায় কি? শেষে এই বৃদ্ধ বয়সে কি সর্ব্বস্ব খোয়াতে হবে? পথের ভিখারী হ'তে হবে, বিনোদ?"

বিনোদ এই বিপদ-সাগর উত্তীর্ণ হইবার বিশেষ কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া সহানুভূতি দেখাইবার জন্য বলিল—"তাইত মশাই, কি যে হবে তা'ত বুঝে উঠতে পারছি না। নগদ প্রায় এক লক্ষ টাকার দরকার। এত টাকা এখন কোথা থেকে পাওয়া যায়?"

"দেখ শুধু জ্যোতির জন্য আমার ভাবনা। আমার ত সমন জারী হয়েছে—এখন গেলেই হয়। কিন্তু জ্যোতিকে কি শেষে জলে ভাসিয়ে দিয়ে যাবো? হা মধুসূদন, শেষে এ কি করলে?"

"দেখুন, একটা উপায় আছে। সেটা অবলম্বন করলে বোধ হয় উপস্থিত এই ঢেউটা কাটিয়ে দেওয়া যায়।"

"কি রকম? এমন কি উপায় আছে?"

"অবশ্য আপনার তত মনে লাগবে কি না তা জানি না; কিন্তু আমার মতে এ ব্যবস্থাটা মন্দ নয়।"

উতলা হইয়া কেশব জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি ব্যবস্থা বল দেখি?"

"আপনি যখন গত বৎসর কলিকাতায় জোড়াবাগানে ছিলেন, তখন একজন ঘটক এসে 'যে প্রস্তাব করেছিল, তা কি আপনার মনে আছে?"

একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বৃদ্ধ কেশব উত্তর করিল—"খুব মনে আছে। সে জ্যোতির সঙ্গে রসময়ের দ্বিতীয় পুত্র ক্ষিতীশের বিবাহের প্রস্তাব করেছিল।"

"হাঁ। আর আপনি সে প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ ক'রে সেই ঘটককে বিদায় করে দিয়েছিলেন।"

"ক্ষিতীশের সম্বন্ধে যেরূপ জনরব শুনা যায়, তাতে সে রকমের পাষণ্ডের হাতে অমন সোণারকমল জ্যোতিকে, কি দিতে পারি? তুমিই বল দেখি?"

"দেখুন—ব্যাপারটা একটু তলিয়ে বুঝুন? রসময় বাবু বার্ষিক প্রায় ৫০,০০০৲ টাকার মুনফার জমিদারী ও বিষয় রেখে গেছেন। উইল সূত্রে ক্ষিতীশই এখন সেই সমস্ত সম্পত্তির এক মাত্র মালিক। কলিকাতার মধ্যে সে এখন একজন বড়লোক বললেও অত্যুক্তি হয় না। বড় লোকদের ছেলেদের স্বভাবে অমন দু'একটা দোষ থাকে—অত দেখতে গেলে চলে না। তার মেয়েটি খুব পছন্দ

হয়েছে। বিয়ে হলে দুদিন পরে ও দোষ সেরে যাবে। তার জন্যে ভাবতে হবে না। তা ছাড়া আমার বোধ হয়, যদি আপনি একটু আদেশ দেন তাহ'লে ক্ষিতীশ তার প্রাপ্য ২৫,০০০৲ টাকা ও সুদ পরিত্যাগ করতে পারে। আর একটু অনুরোধ করলেই মকদ্দমার ডিক্রী বাবৎ যে ৫৫,০০০৲ টাকার দায় ঘাড়ে পড়েছে সেটাও চাই কি দিয়ে দিতে পারে। তা হ'লেই দেখুন এই প্রস্তাবে রাজী হ'লে এক ঢিলে তিন পাখী মারা যায়। প্রথম রসময়ের দেনা শোধ হয়, দ্বিতীয় সরকার বাহাদুরের সহিত মামলা লড়তে গিয়ে যে দায়টি ঘাড়ে পড়েছে সে দায়টা হ'তে উদ্ধার লাভ করা যায়—এবং তৃতীয় জ্যোতির অমন একটা বড়লোকের সঙ্গে শুভ বিবাহ হ'য়ে যায়। এ ত কম কথা নয়!"

কৃপণ কেশবের এই যুক্তিটা মনোমত বলিয়া বোধ হইল। তাই একটু আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি না হয় রাজী হ'লাম। কিন্তু কে বললে যে, সে তার প্রাপ্য টাকা ছেড়ে দেবে—আর ডিক্রী বাবদ আমার ঋণ দিয়ে আমাকে উপস্থিত দায় হ'তে উদ্ধার করবে?"

"আজ্ঞে! এ বিষয়ের কতকটা ইঙ্গিত না পেলে কি আর আপনাকে বলছি?"

এই বিপদে এই কথাগুলি দৈববাণীর মত বৃদ্ধ কেশবের প্রাণে একটু আশার সঞ্চার করিল। তাই আবার ব্যগ্রতা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি রকম ইঙ্গিত পেয়েছ শুনি?"

"আজ্ঞে! সেই ঘটক মহাশয় কলিকাতায় *তাড়া খেয়েও ক্ষান্ত হন নাই। তিনি এখান পর্য্যন্ত এসেছেন। ভয়ে ও লজ্জায় আপনার কাছে আসতে সাহস পান নাই। আমার বাড়ীতেই আশ্রয় নিয়েছেন। আমি কতকটা আপনার উপস্থিত বিপদের কথা জানিয়ে বলি যে, বাবুর এখন মনের অবস্থা বড়ই খারাপ, অতএব এ সময়ে জ্যোতির বিবাহ প্রস্তাবটা না করাই ভাল।"

"তাতে সে কি বল্লে?"

"আজ্ঞে, তাইত বল্ছি। তিনি আপনার উপস্থিত দুশ্চিন্তার কারণ জানতে চান। আমি আকার ইঙ্গিতে কতকটা আভাস দিলে পর, সেই ঘটক বল্লে যদি অর্থের জন্যে কেশব বাবুর মন খারাপ হ'য়ে থাকে, তবে তাঁকে চিন্তা করতে মানা করবেন। তিনি যদি জ্যোতির্ম্ময়ীর বিবাহ প্রস্তাবে রাজী হন তাহ'লে জ্যোতির দাদামহাশয়ের বিপদ তাঁরা যেমনে হোক উদ্ধার ক'রবেন?"

"উদ্ধার করবে বিনোদ? আমার ঋণ পরিশোধ ক'রে এই কঠিন দায় হতে আমায় উদ্ধার করবে?"

"সব কথা অবশ্য স্পষ্ট ভাবে হয় নি। আপনার অনুমতি না পেলে কি ক'রে সব কথা খুলে বলি, বলুন? যদি বলেন তবে আপনার কাছে তাঁকে এনে মুখোমুখী সমস্ত কথার একটা মীমাংসা করতে পারি।"

ঘোর নৈরাশ্যের মধ্যে একটা আশার আলো কেশবের হৃদয়ের

আঁধার যেন কতকটা ঘুচাইয়া দিল। তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"বেশ কথা। আজই বৈকালে দেখাশুনার বন্দোবস্ত কর। ইতি মধ্যে আমিও সমস্ত বিষয়টা একটু ভেবে চিন্তে দেখি।"

"যে আজ্ঞা!" বলিয়া বিনোদ প্রস্থান করিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

শারদীয়া পূজা শেষ হইয়াছে। কাশীধামে দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর সন্ধ্যার সময় বহু নরনারীর সমাবেশ হইয়াছে। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে বহুসংখ্যক লোক এই পূজার অবকাশে কাশীধামে সমুপস্থিত হইয়াছেন—সন্ধ্যার সময় গঙ্গার ঘাটের উপর আবালবৃদ্ধ বনিতার একত্র সম্মিলন একটি দেখিবার ও উপভোগ করিবার জিনিস। কেহ কথকঠাকুরের কথা শুনিতেছেন—কেহ রামায়ণ গায়কের গান শুনিয়া মুগ্ধ হইতেছেন—কেহ সাধু সন্ন্যাসীর নিকট ভক্তিকথা ও সদুপদেশ শুনিয়া প্রাণ শান্ত করিতেছেন—আবার কেহ বা সংসার ত্যাগী কাশীবাসীর সহিত বসিয়া ধর্ম্ম আলোচনা করিতেছেন। চারিধারে যেন একটা ধর্ম্মভাব ও একটা পবিত্র ভগবৎ প্রেমের প্রস্রবণ ছুটিতেছে। দেখিতে দেখিতে গোধূলির ধূসরছায়া অন্ধকারে পরিণত হইল। আকাশে এক একটি করিয়া নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিল। আর কাশীর ভিন্ন ভিন্ন ঘাটের সোপানাবলীর উপর সারি সারি দীপমালা শোভা পাইতে লাগিল। কার্ত্তিক মাসে দীপদানে বহু পুণ্য সঞ্চয় হয়। তাই ভক্তপ্রাণ হিন্দু রমণীগণ দীপ দানে ব্যস্ত। ভাগীরথীবক্ষে কদলী কাণ্ড নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভেলার উপরিস্থিত দীপমালা এক একটি উজ্জ্বল হীরকের ন্যায় স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়াছে।

গঙ্গার পশ্চিমকূলে অসংখ্য সৌধ-শ্রেণী পুণ্যক্ষেত্র কাশীধামকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জমিদার ও নৃপতিবৃন্দের অক্ষয় কীর্ত্তির পরিচয় দিতেছে। এইগুলি সমস্তই দেবালয়। এই দেবালয়গুলি এক এক করিয়া বহুসংখ্যক আলোকমালায় বিভূষিত হইয়া উঠিল। আর গঙ্গাবক্ষে এই আলোকরাশি প্রতিবিম্বিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করিল। চারিদিকে আরতির আয়োজন চলিতে লাগিল। প্রাসাদতুল্য দেবালয় হইতে সানাই ও নহবতের ঝঙ্কার সুমধুর 'ইমন' ও "পূরবীর" অবতারণা করিতে লাগিল এবং এই সঙ্গীতলহরী ভাগীরথীর তরঙ্গ-লহরীর সহিত মিলিত হইয়া দূর দিগন্তে ছুটিতে লাগিল। চারিধারে "হর হর" "বোম বোম" শব্দ, ঘণ্টা ও দামামার শব্দের সহিত মিলিত হইয়া হিন্দুর প্রাণকে ভক্তিরসে মাতাইয়া তুলিল। এই সমস্ত নিরীক্ষণ করিলে অতি-বড় পাষণ্ডেরও প্রাণ ভক্তিরসে দ্রবীভূত হইয়া যায়। "অসি"-"বরুণা"-শোভিত বারাণসী যথার্থই "তীর্থমহারাশি"।

ক্রমে রাত্রি অধিক হইতে লাগিল—অন্ধকার ক্রমে ঘনাইয়া আসিল—বক্তা ও শ্রোতাদের দল একে একে সভাভঙ্গ করিয়া স্ব স্ব গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিল। এত বড় জনবহুল স্থানটি ক্রমে জনশূন্য হইয়া আসিল। সকলেই চলিয়া গেল। কিন্তু অদূরে জাহ্নবী সলিল বেষ্টিত প্রস্তর বেদীর উপর একটি জীর্ণ শীর্ণা মলিনা স্ত্রীমূর্ত্তি উপবিষ্ট ছিল। তাহার যেন বাহ্যজগতের প্রতি কোন দৃষ্টি ছিল না। বাম হস্তে কপোল বিন্যস্ত করিয়া

একাকিনী আকাশ পাতাল কত কি চিন্তা করিতেছিল। সে চিন্তার বুঝি শেষ নাই—সীমা নাই।

রমণী ভাবিতেছিল—"এখন কি করি? কোথায় যাই? যাহার আশায়—যাঁহার চরণে শরণ লইব বলিয়া এখানে আসিলাম তিনি ত এখানে নাই। তিনি এখন প্রবাসে। কবে আসিবেন তাহা কেহ বলিতে পারে না। আর কতদিন সহিব? সহিষ্ণুতার ত একটা সীমা আছে। আর ত পারি না। এ পাপের বোঝা লইয়া এ দেহভার বহন করিতে পারি না। মহাপাতকিনী—মহাপাপিনী আমি—কি করি? কোথা গেলে শান্তি পাই? ঐ পবিত্র জাহ্নবী কুল কুল স্বরে বহিয়া যাইতেছে—ঐ বিগলিত-করুণা সম পবিত্র সলিলে যদি ঝাঁপাইয়া পড়ি—তা হইলেও তাঁহার কি দয়া হইবে না? অজ্ঞান পাতকিনী সন্তানের প্রতি মায়ের করুণা যে বেশী মা! সেই আশায় বুক বেঁধে যে তোর শরণাগত হয়েছি—শান্তিবারি দিবি না মা? তবে আর কেন? যাই। এই ত উপযুক্ত সময়—আর কত ভাবব? ভেবে কি হবে? যত শীঘ্র এ অভাগিনীর অস্তিত্ব লোপ হয় ততই মঙ্গল। আমার নিশ্বাসে বিষ উদ্গীরিত হচ্ছে—আমার সংস্পর্শে জীব কলুষিত হচ্ছে। আমার মৃত্যুই শ্রেয়।" এই বলিয়া রমণী একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—আবার চিন্তা করিতে লাগিল "মরিলে ত সব ফুরাইয়া গেল। কিন্তু তাহাতে অপরাধীর দণ্ড হইল কৈ? যে বিশ্বাসঘাতক—যে মহাপাপী ধর্ম্মদ্রোহী আমায় প্রলোভিত করে এই মহাপাপময় পঙ্কিল পথে টানিয়া আনিল, তার দণ্ড হইল কৈ? আমার কৈশোর

প্রাণের সম্মুখে ভবিষ্যত সুখের কত সুন্দর ছবি দেখাইয়া যে পাষণ্ড আমাকে ধর্ম্ম কর্ম্ম কর্ত্তব্য বিসর্জ্জন দিতে প্রলোভিত করিল—যাহার কুহকে ও মোহিনী মায়ার মুগ্ধ হইয়া আমি সমস্তই জলাঞ্জলি দিয়া আজ এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলাম, তাহার অপরাধের শাস্তি হইল কৈ ? কিন্তু দণ্ড দিবার কর্ত্তা কি আমি ? কর্ম্মফল লইয়া আসিয়াছি আবার কর্ম্মফল লইয়া যাইব। যিনি ধর্ম্মের অবতার পাপীর দণ্ড বিধায়ক—পুণ্যের পুরস্কার দাতা—তিনিই এর বিচার করিবেন—আমি ক্ষুদ্র কীটানুকীট—আমি কাহার দণ্ড দিতে পারি ? পারি না সত্য, কিন্তু আমার অস্তিত্বের সঙ্গে আর একজন মহাপ্রাণ পুণ্যাত্মার স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে—আমি আজ জীবন বিসর্জ্জন দিলে তাঁহার স্বার্থ কে দেখিবে ? এক দানব দেবতাকে পদ দলিত করিয়া তাহারই অর্থে—দেশপূজ্য জনমান্য হইয়া সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, আর একজন নিরীহ দুর্ব্বল পুণ্যবান নিজ স্বার্থ হইতে বঞ্চিত হইয়া আজীবন দারিদ্র্য মস্তকে বহন করিবে—এও কি কখন হয় ? এতদিন সহ্য করেছি—দেবতার জন্য আরও কয়টা দিন না হয় সহ্য করিলাম। স্বেচ্ছা-মৃত্যু আজ স্থগিত রাখিলে সেই মহাত্মার যদি কিছু উপকার হয়, তবে নিশ্চয়ই রাখিতে হইবে। আরও দু দশ দিন বিলম্ব করিলে ত জাহ্নবী সলিল অভাগীর ভয়ে শুকাইয়া যাইবেনা ? তবে আর ভয় কি ? যে দিন ইচ্ছা হইবে সেই দিন এই পাপের বোঝা নামাইব—এই কুক্কুর-স্পৃষ্ট মৃৎভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আমি যদি তাঁহার এতটুকু

উপকার করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিতে পারি সেও ভাল। তবু একটু মনে শান্তি পাইব; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আমার কে? তাঁহাকে আমি কখন দেখিনি—চিনি না। উইল পাঠে বুঝলাম তিনি সয়তান ক্ষিতীশের অগ্রজ। স্বামীজির কথাও উইলে লেখা আছে। স্বামীজির প্রতি রসময় বাবুর বিশেষ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল বলিয়াই বোধ হয়। স্বামীজি সমস্ত রহস্যই জানেন—এই আমার বিশ্বাস। তাই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য এতটা আসিয়াছি। তিনি এখন প্রবাসে। তাহাতে ক্ষতি কি? প্রবাসে কতদিন থাকিবেন? তাঁহার হাতে উইলখানি দিলে তিনি সমস্তই বুঝিবেন? তাঁহার কাছে অকপটে সমস্ত কথা বলিব। কিছু গোপন করিব না। যে মরিতে বসিয়াছে তাহার আর লজ্জা বা ভয় কি? তাঁহার হাতে উইলখানি দিয়া মরিতে পারিলে প্রাণে কতকটা শান্তি পাইব। মনে হয় ধর্ম্মরূপী এই মহাপুরুষের দ্বারাই সেই নরপিশাচের যোগ্য দণ্ড হইবে।"

"পাষণ্ড ক্ষিতীশের জন্য হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া সমস্তই বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত ছিলাম। সে যদি এতটুকু আশ্রয় দিত—সে যদি এতটুকু ধর্ম্মপানে চাইত—সে যদি আমার প্রাণের এতটুকু কদর করিত—তাহা হইলে আমি কাহারও দিকে তাকাইতাম না। উইলচুরির বিষয় কাহাকেও জানিতে দিতাম না। তা হইলে এই উইল এতদিন অগ্নির সাহায্যে ভস্মাকারে পরিণত হইয়া হাওয়ার সঙ্গে কোথায় উড়িয়া যাইত। পৃথিবীতে তার চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকিত না।

"আচ্ছা। একবার উইলের কথা উল্লেখ করিয়া ক্ষিতীশকে ভয় দেখাইলে হইত না কি? রসময় বাবুর দ্বিতীয় উইলখানি যে আমার হস্তগত হইয়াছে ও ইহার দ্বারা যে আমি এ অপমানের প্রতিশোধ লইতে পারি এইরূপ জানাইয়া ক্ষিতীশকে ফিরাইতে পারিতাম না কি? হাঁ! কিছুদিনের জন্য তাহার সোহাগ যত্ন পাইতাম বটে। কিন্তু সেটা নিশ্চয়ই ক্ষণিক ও অল্পক্ষণস্থায়ী হইত। দুশ্চরিত্র দস্যুকে উৎকোচ দিয়া স্বকার্য্যসাধন করিতে প্রবৃত্ত করাইলে লোকের যে দশা হয় আমারও সেই দশা ঘটিত। যে হৃদয় প্রেম শূন্য, ধর্ম্মশূন্য, হিতাহিতজ্ঞান বর্জ্জিত—যে কুলকামিনীকে নিয়ে একটা ক্ষুদ্র ক্রীড়নকের মত দু'চার দিন খেলার পর আবর্জ্জনার মত পথে ছুঁড়িয়া ফেলিতে দ্বিধাবোধ করে না—তাহার কাছে কি প্রত্যাশা করা যাইত পারে? না, তাহার মত সয়তানের শরণাগত হওয়ার চেয়ে গঙ্গাগর্ভে ডুবিয়া মরা ভাল। খুব শিক্ষা হইয়াছে। এখন আর অন্য কামনা নেই। একবার স্বামী সুদানন্দঠাকুরের চরণ দর্শন একমাত্র প্রার্থনা।"

রমণী আবার একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সেই নির্জ্জন ভাগীরথীতট পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল। পাঠক! বুঝিয়াছেন এ রমণী কে? ইনি পাপ-তাপ-সন্তপ্তা প্রত্যাখ্যাতা—বিজলীসুন্দরী।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

ক্ষিতীশচন্দ্রের বন্ধু নিতাইচরণ ঘটক সাজিয়া নরগ্রাম গিয়াছিল। জ্যোতির্ম্ময়ীর সহিত ক্ষিতীশের বিবাহ সম্বন্ধে কেশব বাবুকে একরকম 'নিমরাজি' করিয়া আসিয়াছে। তাই আজ দুই বন্ধুতে বসিয়া এই ব্যাপার লইয়া আলোচনা হইতেছে।

ক্ষি—"তারপর নিতাই! কি রকম করে কায হাঁসিল করলে বল দেখি?"

নি—"আরে দাদা! শর্ম্মারাম যে কাযে হাত দিবে, সেটা সিদ্ধিলাভ করতে কি আর বেশী বিলম্ব হয়?"

ক্ষি—"বল, বল, সমস্ত খুলে বল।"

নি—"এখান থেকে প্রথম সরাসর বিনোদবাবুর বাড়ী গেলাম। তার কাছ থেকে বুড়ো কেশবের এখনকার হালচাল কতকটা শুনে বুঝতে পারলাম যে, মামলা মকর্দ্দমা প্রভৃতিতে বুড়ো এখন জড়িয়ে পড়েছে। উপস্থিত দায় হ'তে উদ্ধার পেঁতে হ'লে তাকে জমিদারীর প্রায় ৷৹ আনার উপর বিক্রী করতে হয়। গাঁয়ের একটা জমিদার—নামডাক খুব। তার উপর আবার কৃপণ। সে যে প্রাণ থাকতে বিষয় বিক্রয় করবে এটা মনে লাগল না।"

ক্ষি—"তা ত ঠিক।"

নি—"তাই, আমি তার উপস্থিত দায় উদ্ধার করে দিব এই রকম প্রলোভন দেখিয়ে আমার প্রস্তাবের অবতারণা করলাম।

তাতে বুঝলাম যে, বুড়োর এ বিবাহপ্রস্তাবে বিশেষ সম্মতি না থাকলেও অসম্মতি হবে না।"

ক্ষি—"কেন অসম্মতির কারণটা কি ?"

নি—"অসম্মতির কারণ অনেক। প্রথম কারণ এই যে, যখন কলকাতায় জোড়াবাগানে গিয়ে আমি এ কথাটি প্রথম তুলি, তখন সে তোমার সম্বন্ধে কতকটা সংবাদ নিয়েছিল ; আগুনের তেজ যেমন চাপা থাকে না, ভায়ার আমার গুণরাশি ত তেমনি চাপা ছিল না। কল্‌কাতার অনেকেই ত সেটা জানত। কাযেই সব দেখেশুনে বুড়ো না কি বলে যে—বড়লোক আছেন আপনার ঘরেই আছেন তা ব'লে মেয়েটাকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে পারব না।"

একটু মৃদু হাসিয়া ক্ষিতীশ জিজ্ঞাসা করিল—"তার পর ?"

নি—"তার পর আরও দু'একবার আনাগোনার পর সে নাকি বলে—সে বড়লোক বটে কিন্তু একেবারে বখাট ও 'বে-হেড' হয়ে গেছে। তার সঙ্গে জ্যোতির বিয়ে দিলে সে মনের দুঃখে মরে যাবে"

ক্ষি—"তারপর।"

নি—"এই ত গেল প্রথম কারণ।"

ক্ষি—"দ্বিতীয় কারণটা কি ?"

নি—"দ্বিতীয় কারণ—ক'নের নিজের আপত্তি।"

একটু বিস্মিত হইয়া ক্ষিতীশ বলিল—"ক'নের আপত্তি ?"

নি—"হাঁ। ক'নেটি অপরূপ সুন্দরী বটে। লাখে একটা

অমন মেয়ে পাওয়া যায় না—কিন্তু তার মেজাজ বড় ছোট।"

ক্ষি—"কি রকম শুনি। এটা যে নূতন সংবাদ দেখছি। এটার কথা ত আগে শুনিনি!"

নি—"ওসব এখানে জানা যায়নি বটে। কিন্তু তাদের দেশে গিয়ে সব জানতে পারলাম কি না।"

ক্ষি—"কি জানলে?"

নি—"মেয়েটি বিয়ে করতে চায় না।"

ক্ষি—"কারণ?"

নি—"তার পছন্দকরা বরটিকে সে চায়। অন্য বর তার পছন্দ হয় না।"

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া ক্ষিতীশ জিজ্ঞাসা করিল—"কে সে সৌভাগ্যবান্? কে তার পছন্দকরা বর—নিতাই?"

নি—"শুনবে, কে তোমার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী—কে তোমার আয়েষার প্রেমে ওসমান?"

ক্ষি—"হাঁ। এখনি শুনতে চাই। বল, শীঘ্র বল।"

নি—"তোমার বিমাতার পুত্র—রবীন্দ্রনাথ।"

রবীন্দ্রনাথের নাম শুনিয়া ক্ষিতীশ ক্ষুধিত শার্দ্দূলের ন্যায় লাফাইয়া উঠিল। বলিল—"কি বললে? ঘৃণিত কুক্কুর—পরান্ন পালিত ভিক্ষুক রবীন্দ্র সেই সুন্দরীর পাণিগ্রহণের প্রয়াসী। আর সেই রমণী তার গলায় মালা দিতে ইচ্ছুক?"

নি—"ইচ্ছুক কি বলছ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"

এই কথা শুনিয়া রবীন্দ্র ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। তাহার মুখমণ্ডল লাল হইয়া গেল। মনোভাব দমন করিতে না পারিয়া ক্ষিতীশ চিৎকার করিয়া উঠিল—"নিতাই! নিতাই! সেই বাতুল জ্ঞানহীন আমার পিতার জারজ সন্তান রবীন্দ্রের এতদূর স্পর্দ্ধা? পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনের সাধ? বামন হয়ে চাঁদে হাত দিবার বাসনা? হা! হা! হা! এর প্রতিকার আছে। এর প্রতিকার করতে হবে। একবার সেই ছুঁরীটাকে করতলায়ত্ত করতে পারলে হয়। তার পর রবীন্দ্রের নাম যদি তার মুখে শুনতে পাই, তবে এক পদাঘাতে তাকে আমি শিক্ষা দিয়ে দিব।" এই বলিয়া ক্ষিতীশচন্দ্র শূন্যে একটা পদাঘাত করিয়া ফেলিল। বদ্ধমুষ্টি ধারণ পূর্ব্বক বার বার নিতাইএর প্রতি কোপদৃষ্টি হানিতে লাগিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। নিতাই মত্তপ ক্ষিতীশের চরিত্র ভালরূপ জানিত। তাই বিশেষ ভীত না হইয়া বলিল—"আরে ছাই; শেষ অবধি শোন। তা নয়, মাঝখানেই mad scene এর অবতারণা করবে? mad scene নাটকের মাঝখানে হ'লে যে রসভঙ্গ হয়ে যায়—সমস্তই murder হ'য়ে যায়। ওসব শেষে দেখাতে হয়।"

ক্ষিতীশ একটু অপ্রস্তুত হইল। স্বল্পক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া উত্তর করিল—"না, না। তারপর কি হলো বলো। তার স্পর্দ্ধাটা দেখে যে গা গস্ গস্ করে ওঠে। সে এখন কোথায়? তাকে বেশ করে উত্তম মধ্যম দিয়ে শিক্ষা দিলে না কেন?"

"বেশ যুক্তি দিচ্ছ ভায়া, বিদেশে অজানা অ'চনা জায়গায় একটা ফৌজদারী বাধিয়ে শেষে নিজের প্রাণ নিয়ে টানাটানি করি আর কি? তোমার কি? তুমি এখান থেকে দিব্বি হুকুম চাগালে—"উত্তম মধ্যম দাও।" তার পর? তাল সামলায় কে? আর দাদা! গাছে উঠতে না উঠতে এক কাঁদি করলে চলবে না। আগে কায হাঁসিল কর তার পর যা ইচ্ছা ক'র-।"

ক্ষি—"থাক। তার পর কাযের কথাটি বল। সে হতভাগাটা এখন কোথায়?"

নি—"সে এখন সেখানে নাই।"

ক্ষি—"ভাল। তার পর কি হলো?"

নি—"তার পর সরকার বিনোদকে দিয়ে বুড়োকে জানালাম যে, যখন ক্ষিতীশের মায়ের মেয়েটি বড় পছন্দ হয়েছে—আর যখন দেনার ভার আমরা মাথা পেতে নিচ্ছি, তখন এ প্রস্তাব ত্যাগ করা তাঁর উচিত নয়। গিন্নি মায়ের নাম দিয়ে অবশ্য কথাগুলো বলেছি। সেইটিই দেখতে শুনতে ভাল।"

ক্ষি—"তা বেশ করেছ।"

নি—"তাকে জানালাম যে ক্ষিতীশের কাছেই ত প্রায় ২৮০০০৲ টাকার দেনা। বিবাহ প্রস্তাবে রাজী হলেই একখানি ছাড় পত্র লিখে দিয়ে ক্ষিতীশচন্দ্র তাঁর জমিদারী বন্ধক খোলসা করে দিবে। তার পর বিবাহ হলেই বরাকরের জমিদারী সংক্রান্ত সরকার বাহাদুরের ডিক্রী বাবদ যে ৫৫,০০০৲ টাকার দেনা আছে—তাও শোধ দিয়ে দিবে। আর ও জানালাম

যে, বড় লোকদের ছেলেদের কোথায় কি একটু দোষ আছে কি না আছে—অত দেখতে গেলে চলে না।”

ক্ষি—“বেশ বলেছ ভায়া। জানি কি না, যখন তুমি গেছ তখন একটা কিনারা করে আসবেই।”

নি—“এই রকম ভাবের অনেক কথাবার্ত্তার পর তবে বুড়ো কতকটা নিমরাজ হ’ল। তার পর আমায় ডেকে আদর আপ্যায়িত করে অনেক কথাবার্ত্তা হয়। শেষ কথা এই যে —অতি সত্বরই পাকাপাকি ক’রে পত্রের দ্বারা আমাদের সংবাদ পাঠাবে ও শুভদিন স্থির করে তোমাকে একবার দেখতে আসবে।”

ক্ষি—“বাহবা; সাবাস নিতাই! তুমিই আমার যথার্থ বন্ধু। দেখ ভাই, এ বিয়েতে আমার একটা জিদ পড়েছে। যেমন ক’রে হোক এটা সমাধা করতেই হবে। রবিকে একটা বিশেষ শিক্ষা দিতে হবে। এ বিয়েতে তাকে নিমন্ত্রণ করতে হবে। বুঝলে? তার সামনে যখন ঐ ক’নেকে নিয়ে চলে আসবো তখন আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।”

নি—“তা এ আর বেশী কথা কি? যে রকম চার ফেলে টোপ ছেড়েছি তাতে যত বড় রুই হ’ক না গিলতে হবেই।”

ক্ষি—“সুন্দরী জ্যোতির্ম্ময়ী এ সব শুনে কোন মতামত দিয়েছে?”

নি।—“সেটা এখনও জানতে পারি নি। আমার বোধ হয় বুড়ো বেশ করে একবার নেড়ে চেড়ে সব ঠিক ক’রে দেখে আমাদের সংবাদ দেবে।”

ক্ষি—"বেশ। যে দিন পাকা কথা পাবো সেইদিন তোমাকে এক হাজার টাকা পারিতোষিক দিব।"

নি—"দাদা পারিতোষিকের আশা রাখি না। চল এখন একবার আড্ডায় যাওয়া যাক। এমন সুখবরটা আনলাম। এখন একটু টেনে ফুর্ত্তি করিগে চল।"

ক্ষি—"চল। তুমি যা বলবে তাতে কি আমার অমত হ'তে পারে?"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

"দেখ মোক্ষদা! আমার দেহের অবস্থা যে রকম দিন দিন দাঁড়াচ্ছে, তাতে তল্প হ'তে বড় দেরী নাই। এখন জ্যোতিকে পাত্রস্থ ক'রে যেতে পারলে আমার একটা ঘোর দায়িত্ব ঘুচে যায়—আমি কতকটা শান্তিতে মরতে পারি।"

"দাদা! অমন অকল্যাণের কথা বলো না। তবে জ্যোতির বিয়ে আর রাখা যায় না—এ কথা ঠিক। যত শীঘ্রই হয় ততই মঙ্গল।"

"আমিত সেই চেষ্টাই করছি। আর ভগবান যখন একটা সুযোগ দিয়েছেন, তখন এটা ছাড়া উচিত নয়। আমাকে দু' একদিন মধ্যে পাকা কথা দিতে হবে। তাদের ইচ্ছা আগামী ফাল্গুন মাসেই শুভ কার্য্য হয়ে যায়।"

মোক্ষদা দেবী মৌন হইয়া রহিলেন। কোন উত্তর দিলেন না। এ জন্য আবার কেশব বলিলেন—"চুপ করে রইলে যে? তোমাদের মত কি?"

"কি বলবো, দাদা! তোমার মতের উপর কোন কথা বলা সাজে না। তবে কথাটা হচ্ছে এই"—বলিয়া মোক্ষদা একটা ঢোক গিলিলেন ও একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

গম্ভীর ভাবে কেশব বলিলেন—"কথাটা হচ্ছে কি বল?"

মোক্ষদা ভ্রাতার প্রশ্নের উত্তর দিতে একটু ভয় পাইলেন। কি বলিবেন তাহা স্থির করতে পারিলেন না। তাই কিছু ক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন। ইহাতে কেশব একটু অধৈর্য্য হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কথাটা কি? তোমাদের কি মত যে ক্ষিতীশের সঙ্গে বিবাহ প্রস্তাবে অমত করি?"

"না, তা বলছি না—তবে বোধ হয় জ্যোতি এ বিয়েতে সুখী হ'বে না।"

"কেন? সুখ দুঃখ কি মানুষের হাত? সেটা তার অদৃষ্টের কথা।"

"তবু বাপ মার দেখে শুনে দেওয়া উচিত ত।"

"খারাপটা কি দেখলে? বড় লোকের ছেলে—অগাধ বিষয়! তার পর আমার প্রায় লাক টাকা দেনা দিয়ে এখনকার বিষয় সমস্ত দায়-শূন্য করে দিচ্ছে। তবে এতে আর ভাবনার কথা কি আছে?"

"দাদা! টাকাতেই কি সুখ?"

"অসুখের ভাবনা কেন করছ? সুন্দর সুপুরুষ যুবক, তার উপর অর্থবান—ভাল ঘরের ছেলে—এতে ও যদি মেয়ে সুখী না হয় তবে সেটা তার অদৃষ্ট।"

"সত্য, কিন্তু সকলের চেয়ে বড়—চরিত্র। যতদুর—শুনেছি তাতে ক্ষিতীশের চরিত্র ভাল নয় বলেই মনে হয়। তার হাতে অমন সোণারপ্রতিমা দিবার আগে একবার ভাল ক'রে দেখা উচিত নয় কি?"

কতকটা তাচ্ছিল্য ভাবে কেশব উত্তর করিল—"ওঃ—বড় লোকের ছেলে—কোথায় কি করলে—কোথায় গেল—অত দেখতে গেলে চলে না।"

"কিন্তু আমাদের জ্যোতি বড় অভিমানিনী। সে যে স্বামীর অবহেলা বা অসদ্ব্যবহার সহ্য করতে পারবে এমন বোধ হয় না।"

কথাটা শুনিয়া কেশব একটু চিন্তা করতে লাগিলেন। পরে ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"জ্যোতির মনোগত ভাব কিছু বুঝেছ কি?"

"রাধা মাধব! সে এ সব বিষয়ে কি কথা বলবে? আর যদিই তার কিছু মনে হয়ে থাকে সে কি আমায় জানাবে, দাদা! তবে—আমি তার প্রকৃতি যেমন দেখছি ও জানি ও ক্ষিতীশের সম্বন্ধে যতদূর শুনেছি তাই বলছি।"

"দেখ! বড় লোকের ছেলেদের ও একটু আধটু দোষ থাকে বটে, তা বিয়ে হ'লেই সে সব দোষ সেরে যায়—ও সব অনেক দেখেছি কি না—ও জন্যে ভাবনা নাই। আর একটা কথা—আমাদের সমাজে পাত্রীর মত নিয়ে কোন কায হয় না। বাপ মা বা অভিভাবক যা ভাল বোঝে তাই তাদের করতে হয়। আজ কালই যত ইংরেজী ফ্যাসানের সংসারে মেয়ের মত ছেলের মত নিয়ে কায করে—ও সব পরিবর্ত্তন আমাদের সমাজে আসতে দেওয়া উচিত নয়। আর আমি সে রকম করতে দিব না।"

"কথটা ঠিক। কিন্তু দাদা! আমাদের সমাজে প্রায়ই ৯।১০ বৎসরে গৌরীদানের ব্যবস্থা আছে। তখন পাত্রীর মতামতের

কোন মূল্য থাকে না। কাষেই বাপ মা যাকে বর দেখে দেয়, পাত্রীকে তাকেই বিয়ে করতে হয়। কিন্তু যখন পাত্রী জ্যোতির মত বয়স্থা হয় তখন সে কতকটা ভাল মন্দ বুঝিতে পারে বৈ কি, আর তখন তার মতামত নাও বা না নাও, তার মনের গতি ও ভাবের দিকে একটু লক্ষ্য করা উচিত।"

"স্বীকার করলাম উচিত; এখন যদি তার মত নিতে যাই, আর সে যদি এ বিবাহে অমত ক'রে তাহলে এ প্রস্তাবটা ত ছেড়ে দিতে হয়। আর যদি ছেড়েই দিই, তবে বিষয় রক্ষা হয় কিসে? আর এক বৎসরের মধ্যে যে দেনার দায়ে ভিটা মাটি চাটি হ'য়ে যাবে—এ দিকে ও ত একটু লক্ষ্য করা উচিত। এ বিয়েতে যে এক ঢিলে দুপাখি মারা যাচ্ছে তা বুঝলে না?"

"তাহ'লে আর অধিক কি বলবো বল? তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর।"

"না না, এ সংসারে তুমি তাকে মায়ের মত স্নেহ ও যত্ন করছ। তোমার মতামত নিয়ে আমার কাষ করতে হবে বই কি। ত না হলে আর আজ এ প্রসঙ্গ তোমার কাছে তুলব কেন? আমি নিজেই ত একটা মীমাংসা করে পাকা কথা দিতে পারতুম।

"আমি কি বলবো দাদা! আমি ত বহুপূর্ব্বেই তোমাকে আমার মত দিয়েছি।"

"কি?"

"রবির সঙ্গে বিয়ে হ'লে যেন জ্যোতির বড় আনন্দের হ'ত।

কিন্তু তুমি ত বলেছ যে, জ্যোতির সঙ্গে রবির বিয়ে হতে পারে না।"

একটু রুক্ষভাবে ও দৃঢ়তার সহিত কেশব বলিল—"না কিছুতেই না। রবিকে আমি যথেষ্ট ভালবাসি। তার মঙ্গল ঈশ্বর সমীপে সতত প্রার্থনা করি। কিন্তু সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখতে গেলে—আমার বংশমর্য্যাদার দিকে লক্ষ্য করে কায করতে হলে, আমি বলবো—আমার জ্যোতি সহস্রবার কুমারী থাক—তবু কুলমানহীন রবির সঙ্গে জ্যোতির বিবাহ আমি দিব না।"

"তবে আর কি বলবো দাদা, তোমার যখন মত তখন ঐ খানেই স্থির কর।"

কতকটা প্রফুল্লিত হইয়া কেশব বলিলেন—"দেখ ভগ্নি! সব দিক দেখে কথা গুলার জবাব দাও। ধর রবির সঙ্গে বিবাহে আমি মত দিলাম। তোমরা বেশ সুখী হলে। কিন্তু বিষয় রক্ষা করবে কি করে? আমার ত আর বেশী দেরী নাই। ক্ষিতীশের সঙ্গে বিবাহের কথা ভেঙ্গে দিলে কালই সে বন্দকী টাকার জন্য নালিশ করবে। ওদিকে সরকার বাহাদুরের তরফ থেকে মকর্দ্দমা খরচার টাকা আদায়ের জন্য ইতি মধ্যে পরোয়ানা বাহির হয়েছে। মাসখানেকের মধ্যে এর একটা ব্যবস্থা না করলে আমার এত সাধের জমিদারী ক্রোক হবে। এ বিপদে আমিই বা কি করবো—আর আমি চক্ষু বুজলে তোমরাই বা কি করবে?"

মোক্ষদা দেবী এই সমস্ত শুনিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। কিছু উত্তর করিলেন না। এই নিরুত্তরটি কেশব সম্মতির লক্ষণ ভাবিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—"দেখ, বিবাহ হয়ে গেলে যখন জ্যোতি ঘর বসত করতে যাবে ও অতবড় ঘরের ঘরণী হয়ে শ্বশুর বাটিতে নূতন সংসার পাতবে, তখন দেখবে তার মনের ভাব অন্য রকম হয়ে গেছে। স্বামীর সঙ্গে একটু মেলা মেশা হয়ে গেলেই ছেলেবেলার সমস্ত ভুলে যাবে। এ আমি বলে রেখে দিচ্ছি দেখে নিও। আর এ ছাড়া অন্য উপায় আছে বলে বোধ হয় না। আমার যা কিছু ছিল সব ত যেতে বসেছে। এখন এই বিবাহই একমাত্র উদ্ধারের উপায়। এতে আর অমত ক'র না, বুঝলে?" মোক্ষদা তথাপি নীরব। কেশব বলিলেন—"তবে আমি তাদের চিঠি পাঠাই?"

"স্বামীজিকে এই বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর মতামত চেয়ে যে চিঠি দিয়েছিলে, তার উত্তর এসেছে কি?"

"কোন উত্তর আসে নি।"

"তবে কি তিনি চিঠি পান নি?"

"চিঠি প্রাপ্তি স্বীকার করেছেন। কিন্তু এই বিবাহ সম্বন্ধে 'না রাম না গঙ্গা'—কোন কথাই লিখেন নাই।"

"এর মানে?"

"তিনিই বোঝেন।"

"তবে কি তাঁর অমত?"

"কি করে বলবো? তবে যখন কোন উত্তর দেন নাই

তখন আর তাঁর মতের অপেক্ষা করবো না। যাক্। এখন স্নান আহ্নিকের সময় হলো। এখন উঠি। আর যাতে শুভকার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন হয় সেই বিষয়ের বন্দোবস্ত করি।"

এই বলিয়া কেশব বাবু আসন ত্যাগ করিলেন। মোক্ষদা দেবীও বেলা অধিক হইতেছে দেখিয়া সাংসারিক কর্ত্তব্য কর্ম্মে চলিয়া গেলেন।

পার্শ্বের ঘরে জ্যোতির্ম্ময়ী তখনও শুইয়াছিল। রাত্রে তাহার জ্বর হওয়ায় দেহ সুস্থ ছিল না। এ জন্য সে আর সকালে বিছানা ত্যাগ করে নাই। সে শুইয়া শুইয়া কেশব ও মোক্ষদার কথপোকথন সমস্ত শুনিতেছিল। তাহাদের কথা শেষ হইলে জ্যোতি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতে লাগিল—"দাদা মহাশয় আমাকে স্নেহ করেন—স্নেহ করবার ত কথাই। আমি ছাড়া আপন বলতে তাঁর আর কে আছে? আমারও পিতামাতা কেহই এসংসারে নাই। তিনিই আমার পিতার স্থান অধিকার করে আমার মঙ্গলামঙ্গল ভেবে কাজ করেন—কিন্তু আজ এ কি দেখছি? তাঁহার বিষয় নিয়ে তিনি খুব একটা জটিল সমস্যার মধ্যে পড়েছেন বটে কিন্তু তা ব'লে কি তিনি আমার দিকে একবারও তাকাবেন না? আমার দেহ বিক্রয় করে তিনি নিজের দায় উদ্ধার করবেন? একটা লম্পট চরিত্রহীন কুলাঙ্গারের হাতে আমাকে সমর্পণ ক'রে তিনি নিশ্চিন্ত হবেন? সত্য বটে তিনি ঋণগ্রস্ত—সত্যই তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষা করা কঠিন হয়েই উঠেছে। সত্যই, তিনি বড় বিপন্ন। কিন্তু

কার জন্য বিষয়? কার জন্য সম্মান—কা'র জন্য মর্য্যাদার কাঙ্গাল হচ্ছেন? তিনি নিজেই বলেছেন তাঁহার আর দেরী নাই। তবে এ বিড়ম্বনা কেন? রবীন্দ্র—কুল মানহীন নগণ্য পথের কাঙ্গাল। সত্যই কি রবীন্দ্র তাই? সত্যই যদি সে কাঙ্গাল হয় তাহাতেই বা ক্ষতি কি? অর্থ কে চায়? কুলশীল মানেরই বা আবশ্যকতা কি? তাহাকে পাইলে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে বৃক্ষতলে থাকাও যে সুখ। রবীন্দ্র! রবীন্দ্র! কত সুধা ঐ নামে? কি দেবোপম মূর্ত্তি! কি অমায়িক হৃদয়! জানি না কেন এত ভালবাসি? সে আমায় সুখী করিবে ব'লে দেশত্যাগী হয়েছে? সে আমাকে সুখী করবে বলে নবীন বয়সে সন্ন্যাসী সাজতে প্রস্তুত হয়েছে। এত ত্যাগ—এত পবিত্রতা কার আছে? এ রকম লোকের সমাজে আদর নাই। ভাল,রবীন্দ্র দাদা মহাশয়ের কুটুম্ব হইবার যোগ্য নয়। তাতে কি এসে যায়? রবীন্দ্র যদি সন্ন্যাসী সাজতে পারে, আমি কি চিরকুমারী থাকতে পারি না? দাদা মশাই! তোমার মানের খর্ব্ব হয়, তুমি রবীন্দ্রের সহিত বিবাহ প্রস্তাবে মত দিও না—সমাজে তোমার অপযশ হয়, তুমি যশ লইয়া থাক। তা ব'লে তুমি একটা নর পিশাচের হাতে আমাকে ফেলে দিও না। আমার চিরজীবনটা নষ্ট ক'রো না—আমার সর্ব্বনাশ সাধন ক'রো না। দাদা মশাই! যদি একদিনও এতটুকু আমায় স্নেহ ক'রে থাক—জ্যোতি ব'লে একদিনও আদর করে থাক—তোমার পায়ে পড়ি তুমি এমন কার্য্য কখনও ক'র না। বিষয়? জমিদারী! ক'ার জন্য? আমিই যদি

অসুখী হলাম—আমারই যদি অশান্তি হল, তবে কার জন্য তুমি এ রকম বাসনা করছ?" জ্যোতির গণ্ড বহিয়া অশ্রু রাশি ছুটিতে লাগিল। ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার চিন্তা করিতে লাগিল। "কিন্তু দাদাম'শায়ের মত ফিরাবে কে? কার কথায় তিনি ব্যবস্থা বদলাইবেন? আমি কি করতে পারি? কিরূপে দাদা ম'শায়ের মন ফিরাব? আজ আমি বুঝেছি—আমার কেউ নেই। মা যদি বেঁচে থাকতেন, বাবা যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে কি দাদা ম'শাই এমন করতে পারতেন। আমি নিজে কোন ইঙ্গিতে করতে পারি না কি? ছি! ছি! সে বড় লজ্জার কথা। আত্মহত্যা ক'রে মরবো—সেও ভাল তবু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারব না। তবে এখন উপায়? উপায় নারায়ণ; উপায় উপায় মধুসূদন! উপায় শঙ্করী।"

আবার জ্যোতির্ম্ময়ী কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চক্ষু ফুলিয়া গেল—উপাধান সিক্ত হইতে লাগিল। ক্ষণেক নিস্তব্ধভাবে চিন্তার পর জ্যোতির্ম্ময়ী স্থির করিল—

"যাক! আর ভাববো না। ভেবে কি করে? দাদামশায়ের যাহা ইচ্ছা তিনি করুন। শেষ ত আমার হাত। তিনি যদি আমাকে বিক্রয় ক'রে সেই বিক্রয় লব্ধ অর্থে নিজের দায় উদ্ধার করেন—তাই করুন। তিনি যাতে সন্তুষ্ট হন—তাই করুন। তার পর—তার পর উপায় কি নেই? উপায় আছে। সেই নর পিশাচের দাসী হবার আগে কেতকীর স্রোতে কি ডুবে

মরতে পারবো না? এক টাকার আফিং কি যোগাড় কি হবে না? একগাছা দড়ি কি জুটবে না?"

"জ্যোতি! জ্যোতি! বেলা হয়েছে যে?"

এই বলিয়া মোক্ষদা দেবী জ্যোতির গৃহের দরজা খুলিয়া প্রবেশ করিলেন। জ্যোতি যেন সেই মাত্র ঘুম ভাঙ্গিল এই ভান করিয়া জাগিয়া উঠিল।

"উঠি দিদিমা! বড় বেলা হয়ে গেছে বুঝি।"

"কেমন আছ দিদি?"

"কাল রাত্রের চেয়ে এখন একটু ভাল আছি।"

"তোর মুখটা অত ভারী দেখাচ্ছে কেন?"

জ্যোতির্ম্ময়ী মুখটা ফিরাইয়া লইয়া উত্তর করিল—"কি জানি—বলতে পারি না। বোধ হয় বেলা পর্য্যন্ত ঘুমুচ্ছিলাম বলে।"

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিজলী সুন্দরী দিন কতক কাশীধামে অপেক্ষা করিলে পর স্বামীজি প্রবাস হইতে ফিরিয়া আসিলেন। বিজলীর নিকট হইতে তাহার মর্ম্মস্পর্শী জীবন কাহিনী শুনিয়া তিনি যার পর নাই দুঃখিত হইলেন। বিজলী অকপট চিত্তে সরলভাবে নিজের জীবনের সমস্ত কাহিনী প্রকাশ করিয়া স্বামীজির দয়া ভিক্ষা করিল। নিজের হিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার মানসে সে যে এতদূর আসিয়াছে ইহা তাঁহার বুঝিতে বাকি রহিল না। অন্য কেহ এরূপ উদ্দেশ্য লইয়া আসিলে নিশ্চয় তিনি তাহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইতেন না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যখন বিজলী সুন্দরী রসময়ের শেষ উইল খানি চুরি করিয়া সেই উইলের দ্বারা ক্ষিতীশের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তখন স্বামীজি আর অন্য মত করিতে পারিলেন না। এই উইলখানি যে স্বামীজির লক্ষ্য। এই উইল খানির জন্য তিনি যে অস্থির হইয়া বেড়াইতেছিলেন। রসময় উইল বদলাইয়াছেন ইহা তিনি জানিতেন। কিন্তু দৈবনিগ্রহে ইহা তাঁহার বা রবীন্দ্রের হস্তগত হয় নাই। আজ যখন ঘটনাচক্রে পাপীর দণ্ড দাতা ও ন্যায়ের অবতার ভগবানের অসীম দয়ায় যে সেই চির-বাঞ্ছিত অমূল্য জিনিসটি আজ তাঁহার হস্তগত হইল, তখন স্বামীজি

ভগবানের উদ্দেশে শত শত বার প্রণাম করিলেন। আর ইহাতে অত্যাচার পীড়িত হতভাগ্য রবীন্দ্রের ভাগ্য ফিরাইবার সূচনা দে'খয়া তিনি বিজলীর সাহায্য কল্পে প্রাণপাত করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। বিজলীকে আর এই পাপ তাপ জ্বালাময় সংসারে পথের কাঙ্গালের মত ঘুরিতে হইবে না এই কথা জানাইলেন। তাহাকে ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া মঠে আশ্রয় দান করিলেন। শোকসন্তপ্ত প্রাণে বিজলী সুন্দরী কতকটা শান্তি পাইল।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ব্বাচনে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রের পদ পাইয়া বরিশালে নিযুক্ত হইল। সেই খানে দিনকতক কার্য্য করিবার পর হিন্দু মুসলমানে একটা ভয়ানক দাঙ্গা হয়। সেই দাঙ্গা হাঙ্গামা নিবৃত্তি করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ এবং সরকার বাহাদুরের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত হয়েন। দুই তিন দিন অনবরত চেষ্টাতেও তাঁহারা দাঙ্গার দলপতিদের দমন করিতে পারিলেন না। শেষে ব্যাপার বড়ই গুরুতর হইয়া উঠিল। এই সময়ে একদিন রাত্রে রবীন্দ্রনাথের নিকট সংবাদ আসিল যে, এক পক্ষের দলপতিরা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাংলোটি জ্বালাইয়া দিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রাণের হানি করিবার জন্য সমস্ত আয়োজন করিয়াছে। সেই দলের মধ্যে অনেকের নিকট বন্দুক ছোরা তরবারি প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র আছে। এই কার্য্য গভীর রাত্রেই সংঘটিত হইবে এইরূপ স্থির হইয়াছে। কর্ত্তব্য পরায়ণ রবীন্দ্রনাথ সংবাদ পাইয়া নীরব থাকিতে পারিল না। যাহাতে এই গর্হিত

কার্য্য সম্পাদিত না হয়, সে বিষয়ে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতে লাগিল। বিপক্ষদল যাইবার পূর্ব্বেই রবীন্দ্র ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাংলোয় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবে রবীন্দ্রের কর্ত্তব্য পরায়ণতা ও কর্ম্মতৎপরতা দেখিয়া যার পর নাই পরিতুষ্ট হইলেন। পরে যখন বিপক্ষদলের দলপতিরা আসিয়া দেখিল যে, সকলে সতর্ক হইয়াছে ও রবীন্দ্রনাথই তাহাদের মনোরথ ব্যর্থ করিয়াছে, তখন তাঁহার উপর তাহাদের জাতক্রোধ উপস্থিত হইল। তাহারা বিশেষ কিছু করিতে না পারিয়া পুলিশকে আক্রমণ করিল। সেই দ্বন্দ্ব থামাইতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ সেই ঘোর অন্ধকার মধ্যে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট মহাশয়ের সম্মুখে দুটি গুলি খাইয়া অচেতন হইয়া পড়িল। অবশেষে পুলিশও গুলি চালাইতে বাধ্য হইল। আক্রমণকারীদের দ্বারা এইরূপ একটা খুন হওয়ায় পুলিশ কর্ত্তৃক তাহাদের মধ্যে দুই একজন জখম হওয়ায় তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিল।

রবীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ হাঁসপাতালে আনীত হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের তত্ত্বাবধানে তাহার যথোপযুক্ত চিকিৎসা চলিতে লাগিল। তিন চারি দিন রবীন্দ্রনাথের সংজ্ঞা ছিল না। পরে যখন তাহার চৈতন্য হইল, তখন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার আত্মীয় স্বজন কে কোথায় উপস্থিত আছেন তাহা জানিতে চাহিলেন। কারণ সিভিল সার্জ্জনের মুখে তিনি শুনিয়াছিলেন যে, রোগীর অবস্থা বড় শঙ্কটাপন্ন। যেরূপ সন্ধিস্থলে আঘাত লাগিয়াছে, তাহাতে

হয়ত তাহার মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে। অন্ততঃ তিন চারি সপ্তাহ না কাটিলে রোগীর বিষয় সঠিক কিছু বলা যায় না।

আত্মীয় স্বজনের কথা শুনিয়া রবীন্দ্রের একবার জ্যোতির্ম্ময়ীকে মনে পড়িল। তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। প্রথমে সে কিছু উত্তর করিল না। কিন্তু পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়া রবীন্দ্রনাথ বলিল, যে তাহার এক মাত্র আত্মীয় স্বামীজি বর্ত্তমান আছেন—এ ছাড়া এ জগতে তাহার আর কেহই নাই। এই সংবাদ পাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তৎক্ষণাৎ বেনারস পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তার যোগে সংবাদ দিলেন। জানাইলেন যেন সংবাদ পাইবামাত্র স্বামীজি বরিশাল হাঁসপাতালে আইসেন। কারণ রবীন্দ্র তাহাকে দেখিবার জন্য কাতর। তিনি ইহাও জানাইলেন যে, রোগীর অবস্থা বড় শোচনীয়। শীঘ্র না আসিলে হয়ত আর দেখা হইবে না।

বিজলীর নিকট হইতে স্বামীজি দ্বিতীয় উইলখানি হস্তগত করিলেন বটে,কিন্তু কি ভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে আশু কার্য্য সিদ্ধ হইবে এই বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় সেখানকার পুলিশ আফিসের বড় সাহেবের আদেশে একজন দারোগা স্বামীজির মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি পুলিশ কর্ম্মচারীকে দেখিয়া প্রথমে একটু শঙ্কিত হইলেন। ভাবিলেন, বুঝি বিজলীকে আশ্রয় দিয়া তিনি আবার কোন বিপদ জালে পতিত হইয়াছেন। কিন্তু দারোগা বাবুর প্রমুখাৎ সমস্ত ঘটনা শুনিয়া তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত

পুলিশের বড় সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তথায় সমস্ত বিষয় স্বরূপ অবগত হইলেন। যাহার জন্য এত আয়োজন—যাহার ভাগ্য পরিবর্ত্তনের সূচনা পাইয়া তিনি এত আনন্দে অধীর হইয়াছেন—সেই রবীন্দ্রনাথ এখন জীবন মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া। এ সংবাদে স্বামীজি অস্থির হইয়া উঠিলেন। দুই চারিটি কথা আদান প্রদানের পর তিনি সাহেবের নিকট বিশেষ সৌজন্য ও কৃতজ্ঞতা দেখাইয়া বিদায় লইলেন এবং তাহার দুই দিন পরেই তিনি রবীন্দ্রকে দেখিবার মানসে বরিশাল অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এই সময় হঠাৎ কেশব বাবু পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। ওদিকে বরাকরে সনৎপুরের কয়লার খনিটি প্রিভি-কাউনসিলের রায় অনুসারে সরকার বাহাদুরকে খাস দখল দিবার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। কেশব সাঙ্ঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত—জ্যোতির্ম্ময়ী বালিকা—সে আইন আদালতের কি বোঝে? সনৎপুরে কেশবের ম্যানেজার প্রভুর আদেশ ব্যতীত কোন কার্য্য করিতে পারে না। ইহা ছাড়া তথাকার প্রজাগণ লোক প্রমুখাৎ শুনিয়াছিল যে, অতি সত্বরই কেশবের হাত হইতে জমিদারী গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হইবে ও তাহাদের অতি শীঘ্রই অন্য জমিদারের অধীনে বাস করিতে হইবে। কিন্তু তাহারা কেশবের আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহার এতটা বশীভূত হইয়াছিল যে, সহজে সাঁওতালগণ অন্য মালিককে জমিদার বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইল না। এমন কি তাহাদের মধ্যে অনেকেই কেশবের পক্ষে

সরকার বাহাদুরের সহিত দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধাইয়া যাহাতে সরকার বাহাদুর সহজে দখল না পান সে বিষয়ে চেষ্টা করিতে লাগিল ও সেইজন্য অন্যান্য উদাসীন প্রজাদের উত্তেজিত করিতে লাগিল। এই ঘটনার পর বরাকরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কেশবের উপর পরোয়ানা জারী করিয়া তাঁহাকে তাঁহার সমীপে হাজির হইবার জন্য আদেশ করিলেন ও তাঁহার প্রজারা শান্তিভঙ্গ করিবার জন্য যে দলবদ্ধ হইয়াছে তাহার প্রতিকার করিতেছেন না কেন ইহার কৈফিয়ৎ চাহিলেন।

বিপদের উপর বিপদে কেশববাবু প্রমাদ গণিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

বলা বাহুল্য যে বিজলীর নিকট হইতে রসময়ের দ্বিতীয় উইল-খানি হস্তগত করিয়া স্বামীজি সর্ব্বাগ্রেই বেনারসের খ্যাতনামা উকিল পাঁড়েহাবেলী নিবাসী শ্রীযুক্ত হীরালাল বসুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। হীরালাল বাবু রসময়ের সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু ছিলেন। মেনকাদেবীর সহিত শেষ সাক্ষাতের পর স্বামীজির ও হীরালাল বাবুর পরামর্শ মত রসময় প্রথম উইল পরিবর্ত্তন করিতে কৃতসংকল্প হন। তাঁহার তখন যেরূপ মনোভাব ছিল তাহাতে নিজের বিষয় দুই পুত্রকে সমান অংশে বিভাগ করিয়া দিবেন, এইরূপ বন্দোবস্ত ছিল। এইরূপ সংকল্প করিয়া তিনি খুলনায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দেশে আসিয়া লোকমুখে ও কর্ম্মচারী কালিচরণের মুখে পুত্র ক্ষিতীশচন্দ্র সম্বন্ধে যাহা শুনিলেন তাহাতে তাহার প্রতি যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে আস্থা ছিল, তাহা লোপ পাইয়া গেল। এইজন্য স্বামীজিকে একবার শেষ সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। স্বামীজি আসিলে পর তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া রসময় একবার হীরালাল বাবুকে তাঁহার বাটিতে আহ্বান করেন। হীরালাল বাবু বাল্যবন্ধুর অন্তিমের অনুরোধ রক্ষা না করিয়া পারিলেন না। তিনি খুলনায় আসিলেন। তিনি মাত্র একদিন থাকিয়া বেনারস চলিয়া যান। এই দিনেই

দ্বিতীয় উইল সম্পন্ন হয়। হীরালাল বাবু এই উইলের এক জন প্রধান সাক্ষী হইলেন। এই উইল মতে ক্ষিতীশচন্দ্র ও তাঁহার মাতা মাসিক ১০০৲ টাকা পাইবেন ও খুলনার বাটির কতক অংশে বাস করিতে পাইবেন। এ ছাড়া সমস্ত সম্পত্তিই রবীন্দ্র নাথ পাইবেন। হীরালাল বাবু যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন তাহা অবশ্য গোপন রহিল। সাংঘাতিক পীড়ার সময় বন্ধুকে দেখিতে আসিয়াছেন এইরূপ জনরব প্রচারিত হইল। রসময়ের ইচ্ছা ছিল যে,দ্বিতীয় উইলের ব্যাপার গোপন থাকে; তাঁহার মৃত্যুর পর যাহাতে উহা প্রকাশ পায় সে ব্যবস্থা স্বামীজির সহিত করিলেন। উইল খানি রেজেষ্টারী করিবার রসময়ের ইচ্ছা ছিল। তিনি ভাবিয়া ছিলেন যে একটু সুস্থ হইয়া একবার কলিকাতায় যাইবেন এবং সেই খানেই উইল খানি রেজিষ্টারী করিবেন। কিন্তু ঘটনা চক্রে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। শেষে রসময় ভাবিলেন যে, উইল খানি রেজিষ্টারী না হইলেই বা ক্ষতি কি? উইলে যে সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোক সাক্ষী শ্রেণীভুক্ত হইয়া নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মৃত্যুর পর উইল উপযুক্ত আদালতে প্রমাণ করিতে রবিকে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। এই কারণ, যখন বুঝিলেন যে, তাঁহার আসন্নকাল সমুপস্থিত ও কলিকাতায় গিয়া উইল রেজিষ্টারী করা সম্ভবপর নহে, তখন তিনি শুধু মৃত্যুর পূর্ব্বে রবীন্দ্রের দর্শন প্রার্থী হইয়া ছিলেন—রবীন্দ্রের হাতে দ্বিতীয় উইল খানি সমর্পণ করিয়া যাইতে পারিলেই তাঁহার প্রাণের বোঝা নামিয়া যায়। রবীন্দ্রের হস্তে উহা দিয়া যাইতে না পারিলে ভবিষ্যতে

যে গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা ইহা বুঝিতে তাঁহার বাকী ছিল না। কিন্তু যে বিপদ এড়াইবার জন্য তিনি এত চেষ্টা করিলেন, ঘটনা চক্রে সেই বিপদই ঘটিল। পাঠকগণের এ সমস্ত বিষয় অপরিজ্ঞাত নহে।

যাহা হউক হীরালাল বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া স্বামীজি বেনারস আদালতে দ্বিতীয় উইল খানি দাখিল করিয়া নিজেই প্রবেটের দরখাস্ত করিলেন। পাঠকের স্মরণ আছে যে এই উইলের মর্ম্ম অনুসারে তিনি আতুরাশ্রম প্রস্তুত করিবার জন্য রসময়ের ত্যক্ত ষ্টেট হইতে ২০০০০ টাকা পাইবার অধিকারী। এজন্য আইন অনুসারে উইলের প্রবেট নিজেই চালাইতে তাঁহার কোন বাধা ঘটিল না।

আদালতে উইল দাখিল করিয়া বেনারসের জজ বাহাদুরের নিকট ক্ষিতীশের নামে পরোয়ানা বাহির করাইলেন। প্রথম উইল খানি—যাহার বলে ক্ষিতীশচন্দ্র সমস্ত বিষয় অধিকার করিয়াছেন—তাহা কেন নাকোচ হইবে না ও দ্বিতীয় উইলের মতে ৺রসময়ের ত্যক্ত সম্পত্তি কেন বণ্টন হইবে না এবং ক্ষিতীশচন্দ্র জ্ঞানত ও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দ্বিতীয় উইলের অস্তিত্ব গোপন করিয়া মিথ্যা এভিডেবিট করিয়া প্রথম উইলের প্রবেট লইয়াছেন সেইজন্য তিনি কেন ফৌজদারী সোপরদ্দ হইবেন না—এই বিষয় কৈফিয়ৎ চাহিয়া জজ সাহেব পরোয়ানা জারী করিলেন। দুই দিনের মধ্যে এই পরোয়ানা জারী করিবার ব্যবস্থা করিয়া তবে স্বামীজি রবীন্দ্রকে দেখিবার জন্য বেনারস ত্যাগ করেন।

কেশব বাঁড়ুয্যে যে একখানি পত্রে জ্যোতির্ম্ময়ীর সহিত ক্ষিতীশের বিবাহের কথা লিখিয়া স্বামীজির মতামত চাহিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় পাঠকের স্মরণ আছে। স্বামীজি এ কথার কোন উত্তর দেন নাই। স্বামীজি প্রথম হইতে জ্যোতির্ম্ময়ীর ও রবীন্দ্র নাথের হৃদয়ের অন্তস্থলের কথা—তাহাদের প্রাণের ব্যথা বেশ বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু এ যাবত সে কথা ব্যক্ত করিবার ও সে ব্যথা মোচন করিবার কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। কাজেই নীরব ছিলেন। যে সময়ে তিনি কেশবের পত্র পান তাহার অনতিপূর্ব্বে বিজলীর নিকট হইতে দ্বিতীয় উইলরূপ অমোঘ অস্ত্রটি তিনি নিজ হস্তগত করিয়াছিলেন। ইহাতে দুইটি নিরীহ প্রাণীর ভবিষ্যত ভাগ্য যে নির্ভর করিতেছে এবং ইহার দ্বারা যে ঘটনা স্রোত একেবারে ভিন্ন দিকে পরিবর্ত্তিত হইবার সম্পূর্ণ সূচনা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে স্বামীজির বাকি ছিল না। কিন্তু বিশেষ গবেষণা ও পরামর্শ করিয়া কর্ম্ম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে কেশবকে কোনরূপ আভাস বা ইঙ্গিত করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। এজন্য স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই তিনি বিবাহ প্রস্তাবে কোন মতামত দেন নাই। ক্ষিতীশের ব্যবহারে তিনি তাহার উপর বড় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ক্ষিতীশের সহিত জ্যোতির বিবাহ হইলে জ্যোতিও অসুখী হইবে—রবীন্দ্রনাথকেও সংসারী করা হইবে না—ইহা তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন, সেইজন্য তিনি এ বিবাহে কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই। মঙ্গলময় ভগবানের উপর ভার দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত রহিলেন।

স্বামীজি যথাসময়ে বরিশাল হাঁসপাতালে পৌঁছিলেন। তথায় গিয়াই সহজে রবীন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ পাইলেন না। রোগীর যেরূপ সাংঘাতিক অবস্থা তাহাতে বাহিরের লোকের গৃহে প্রবেশ নিষেধ ছিল। তিন দিন তথায় অবস্থানের পর ডাক্তার সাহেবের অনুমতি অনুসারে স্বামীজি ৫ মিনিটের জন্য রোগীকে দেখিবার সুযোগ পাইলেন। রবীন্দ্র জীবিত কি মৃত তাহা তিনি প্রথমে ভাল বুঝিতে পারিলেন না। নিশ্চল স্থির সংজ্ঞাশূন্য দেহখানি বিছানায় মিশিয়া রহিয়াছে। গৃহটি একেবারে নিস্তব্ধ। দুই জন মেম নার্স রোগীর পার্শ্বে বসিয়া নীরবে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেছে। সরকার বাহাদুরের তরফ হইতে যতদূর সম্ভব উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রবীন্দ্রকে দেখিয়া স্বামীজির প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীর চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। যখন তিনি রোগীর গৃহ ত্যাগ করেন তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—'মা শঙ্করি! তবে কি আমার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হবে? এ অভাগা সন্তানকে ঋণ হ'তে মুক্ত করবি না মা?'

বাহিরে আসিয়া স্বামীজি ডাক্তার সাহেবের সহিত রোগীর সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিলেন এবং যাহাতে রবীন্দ্রকে প্রত্যহ অন্তত একটিবার দেখিতে পান এই অনুরোধ করিলেন। ডাক্তার সাহেব জানাইলেন যে, রোগীর অবস্থা ফিরিতে এখন ও ৩৪ সপ্তাহ কিম্বা আরও অধিক সময় লাগিবে। ইহার মধ্যে জীবনের সম্পূর্ণ আশঙ্কা আছে। তিনি স্বামীজিকে প্রত্যহ ৫ মিনিট

কাল রোগীর গৃহে আসিতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু নিষেধ করিয়া দিলেন যে রোগীকে কোন রূপ প্রশ্ন বা কথার দ্বারা যেন বিরক্ত করা না হয়। স্বামীজি এই বিপদে এইটুকু অনুগ্রহ একটা অমূল্য উপহার স্বরূপ মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিলেন এবং ডাক্তার সাহেবকে ভূয়ঃ ভূয়ঃ ধন্যবাদ দিয়া বাসার দিকে চলিয়া গেলেন।

বাসায় আসিয়া স্বামীজি পত্রের দ্বারা কেশবকে রবীন্দ্রের বিপদের কথা জানাইলেন। পত্র পাইয়া কেশব বাবু বড়ই চিন্তিত হইলেন। একে নিজের শরীর বড়ই অসুস্থ তাহার উপর এই সব জমীদারী সংক্রান্ত দুশ্চিন্তা। কাজেই তিনি নিজে যাইতে পারিলেন না। স্বামীজিকে প্রত্যেক দিন রবীন্দ্রের সংবাদ দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। জ্যোতির্ম্ময়ীও এই পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া যার পর নাই কাতর ও উদ্বিগ্ন হইল। তাহার নিজের বিপদের সময় রবীন্দ্র নিজের দেহপাত করিয়া, পরীক্ষার অমূল্য সময় নষ্ট করিয়া নিস্বার্থ সেবা শুশ্রূষার দ্বারা তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছিল। আর আজ সে দূর প্রবাসে—আত্মীয় স্বজনপরিশূন্য এক দাতব্য চিকিৎসালয়ে জীবন মরণের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। এ অবস্থায়—তাহার সেবা করার কথা দূরে থাক—তাহাকে একবার দেখিবার সুযোগ কি ভগবান তাহাকে দিবেন না? কে তাহার কাছে একটু বসিবে? এ বিপদে কে তাহাকে দেখিবে? কে প্রাণ ঢালিয়া তাহার শুশ্রূষা করিবে? আহা বিদেশে তাহার কত কষ্টই না হইতেছে!

তৃষ্ণায় একটু জল পাইতেছে কিনা কে জানে ? জ্যোতির্ম্ময়ীর বুকের কাছটা কেমন ছটফট করিতে লাগিল। অকূলে কোন কূল না পাইয়া শুধু নীরবে অশ্রুরাশি ঢালিয়া তাহার হৃদয়ের জ্বালা নিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

জ্যৈষ্ঠ মাস। দারুণ গ্রীষ্মের সময় ক্ষিতীশচন্দ্র সদল বলে দার্জ্জলিঙের উচ্চ শিখরে বসিয়া শীতল বায়ু সেবন করিয়া প্রাণ তৃপ্ত করিতেছে। বলাবাহুল্য, নর্ত্তকী গায়িকা বন্ধু বান্ধব লইয়া এই দলের সৃষ্টি হইয়াছে। বেনারসের জজ আদালতের পরোয়ানা যথা সময়ে ক্ষিতীশের খুলনার বাটিতে আসিয়া পৌছিয়াছিল কিন্তু তথাকার হাল আমলের ম্যানেজার অঘোর দাস মালিক না থাকায়—উহা ফেরত দেয়। যে পিয়াদার উপর উক্ত পরোয়ানা জারীর ভার ছিল, সে ইতি পূর্ব্বে ক্ষিতীশচন্দ্রের জমিদারী ভুক্ত প্রজা ছিল। তাহার কিছু বাকি খাজনা পড়ায় তাহার নামে ডিক্রী করিয়া ম্যানেজার অঘোর দাস তাহার জমি জমা নিলামে চড়াইয়া পাওনা টাকা আদায় করিয়া লয়। এজন্য পিয়াদার তাহার উপর বড় রাগ ছিল। এই সুযোগে তাহার অত্যাচারের শোধ লইবার মানসে—ক্ষিতীশ আদালতের পরোয়ানা অগ্রাহ্য করিয়া ফেরত দিল,—এই মর্ম্মে এফিডেবিট্ করিয়া উহা বেনারস কোর্টে ফেরত দেয়। অঘোর দাস জমিদার বাবুর পিয়ারের লোক। ম্যানেজার হইয়া সে ধরা খানাকে সরা জ্ঞান করিতেছে। উক্ত পদ পাইয়া সে যতদূর উচ্ছৃঙ্খল ও অত্যাচারী হইতে হয় তাহা হইয়াছে। অর্থের সঙ্গে সঙ্গে সেও উপযুক্ত

মনিবের উপযুক্ত ভৃত্য সাজিয়া সরকার বাহাদুরের আবগারী বিভাগটী একরকম একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে। যখন বেনারস কোর্টের পরোয়ানা ফেরত দেয়. তখন ম্যানেজার বাবু কতকটা বে-এক্তার ছিল। কাজেই প্রকৃতিস্থ হইলে পর পরোয়ানা সম্বন্ধে ঘটনাটি সে একেবারে বিস্মৃত হইল। ক্ষিতীশচন্দ্রও এ সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারিল না। স্বামীজির বেনারস আদালতের কার্য্য কলাপ তাহার একরূপ অজ্ঞাতই রহিল।

দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে ক্ষিতীশচন্দ্র কেশবকে জ্যোতির্ম্ময়ীর সহিত বিবাহ কার্য্যটি যাহাতে শীঘ্র সম্পন্ন হয় সে বিষয় লিখিয়া পাঠায়। প্রথমে কেশব বাবু নিজের শারীরিক অসুস্থতার দোহাই দিয়া দিনকতক সময় চাহিলেন, কিন্তু ক্ষিতীশচন্দ্র তাহার এ প্রার্থনা মঞ্জুর করিল না। তথা হইতে ২।৪ খানি চিটি পত্র আদান প্রদানের পর ক্ষিতীশ একেবারে অধীর হইয়া পড়িল। শেষে ধমক দিয়া একখানি চিঠি দিল। তাহার মর্ম্ম এই যে বাজে ছুতা দেখাইয়া কেশববাবু স্নধু সময় লইতেছেন—তাহার বিবাহ দিবার মত নাই—বোধ হয় অন্য পাত্রের সন্ধানে ফিরিতেছেন। অতএব যদি আর ২।৪ সপ্তাহের মধ্যে বিবাহের সম্বন্ধ পাকাপাকি না করেন তাহা হইলে সে তাহার অঙ্গীকার মত কোন কার্য্যই করিবে না, অধিকন্তু তাহার প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্য উপযুক্ত আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিবে ও তাহার জমিদারী বিক্রয় করাইয়া পাওনা আদায় করিয়া লইবে।

এই সংবাদে কেশবের মনের যে কি ভাব হইল তাহা সামান্য

চিন্তায় বেশ বুঝিতে পারা যায়। এদিকে বরাকরের জমিদারী লইয়া এক বিপদ—ঐ জমিদারী লইয়া মামলা খরচের ও সরকার বাহাদুরের ডিক্রীর টাকার জন্য আর এক বিপদ—ক্ষিতীশের তাগদা আর এক বিপদ এবং নিজের সাংঘাতিক পীড়া—বিপদের উপর বিপদ। তিনি কি করিবেন? কি উপায়ে এই বিপদ জাল হইতে উদ্ধার পাইবেন? কোনটা সামলাইবেন? এদিকে শমন শাসাইতেছে—ওদিকে রাজসরকার তলপ করিতেছেন—অপর দিকে ক্ষিতীশচন্দ্র চোখ রাঙ্গাতেছেন। এখন কোনটা আগে রাখা উচিত? এক একবার ভাবিতেন যে, যদি এবৃদ্ধ বয়সে শমনের তলবটা আগে রাখিতে পারা যায় তাহা হইলে সব বিপদের অবসান হয়। কিন্তু পোড়া শমন ডাক দিয়া ও যে উদাসীন হইয়া বসিয়া আছে। নিরুপায়! অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন যে, সর্ব্বাগ্রে ক্ষিতীশের মনোরঞ্জন করাই উচিত। তাহার অর্থের অভাব নাই। এই সময় অর্থবান ক্ষিতীশ যদি সহায় হয় তাহা হইলে অনেকটা সুবিধা হইতে পারে। এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া ক্ষিতীশের পত্রের উত্তর দিলেন। জানাইলেন যে জ্যৈষ্ঠ মাসের পরে যে দিন সে স্থির করিবে সেই দিনই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে তিনি সম্মত আছেন।

জ্যোতির্ম্ময়ী সমস্ত সংবাদই রাখিতেছিল। ক্ষিতীশচন্দ্রের ধমকে দাদামশায় বিচলিত হইয়াছেন ও সেই জন্য এত শীঘ্র বিবাহ রূপ গলগ্রহটি তাহার গলায় ঝুলাইয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন শুনিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী প্রথমে বড়ই চিন্তিত হইল। স্বার্থপর নীচ

কামুক কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত ক্ষিতীশ নিজের ভোগ বিলাসের জন্য তাহাকে সত্বর অধিকার করিতে চায়। ঘৃণায় রোষে ক্ষোভে জ্যোতির্ম্ময়ী মরমে মরিয়া গেল। মনে মনে রবীন্দ্রের কথা ভাবিতে লাগিল। কি দেবোপম প্রকৃতি—কি স্বার্থশূন্য প্রাণ। গত শারদীয়া পূজায় অবসানে সেই ভগ্নপ্রাচীরস্তূপ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রবীন্দ্র যে সমস্ত কথা বলিয়াছিল সেই সমস্ত কথা তাহার স্মরণ পথে উদিত হইতে লাগিল। 'পাছে অমরাবতীতে শুষ্ক কঙ্কালের নীরস অভিনয় হয়—পাছে দেবতার পবিত্র সিংহাসন দানবের লীলা ক্ষেত্রে পরিণত হয়—পাছে দেবতার কেলিকুঞ্জ তাণ্ডবের রঙ্গমঞ্চে পরিণত হয় এই ভয়ে এ স্থান জন্মের মত পরিত্যাগ করিতে চাই।' ও! কি উচ্চ হৃদয়ের কথা—কি স্বার্থ শূন্য প্রাণ! রবীন্দ্র! রবীন্দ্র! তুমি যদি দেবতা না হও তবে এ কুটিল জগতে আর দেবতা দর্শন কোথা পা'ব? তুমি আমার জন্য পবিত্র স্মৃতিমাখা শৈশবের ক্রীড়া ভূমি চিরদিনের মত ত্যাগ করে গেছ। তোমার কাছে আমি কত ক্ষুদ্র—কত হীন। জ্যোতির্ম্ময়ীর গণ্ড বহিয়া অজস্রধারে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। আর মনে মনে বলিতে লাগিল।

"ওগো! তুমি কেন চলে গেলে—তুমি ফিরে এস। এ অভাগীকে এ বিপদ [illegible] হ'তে উদ্ধার কর। সমাজ নিষ্ঠুর! আপন আত্মীয়-স্বজন স্বার্থপর। মাতৃস্নেহ হতে বঞ্চিতা এ দুঃখিনীর হৃদয়ের গুরুভার কে মোচন করবে? আমার পবিত্র মন্দিরে যে দেবতা প্রতিষ্ঠা ক'রে এতদিন পূজা ক'রে এসেছি, সেই সিংহাসনে তুমি এস। পুনরায় সে হৃদয় অধিকার ক'রে আমায় পবিত্র কর। এস,

আমার দেবতা—তোমায় পূজা ক'রে আমি ধন্য হই। আমি অর্থ চাই না—বিভব বিলাস চাই না। দীন দুঃখিনী ভিখারিণী সেজে দেবতার দাসী হ'য়ে থাকতে চাই—তাতে আমার অতুল সুখ—অতুল আনন্দ—এ সুযোগ আমায় দাও গো। আর সময় নাই—অবসর বড় কম। ওগো—তুমি ধার্ম্মিক—তুমি প্রেমিক। তুমি কি শেষে আমাকে আত্মঘাতিনী করাবে—অধর্ম্ম সঞ্চয় করতে শিখাবে? কোথা যাবো—কি হবে? কে আমার ব্যাথা বুঝবে? কারে জানালে প্রতিকার পাবো? রূপোন্মত্ত নরপিশাচ ক্ষিতীশ আর কিছুদিন সবুর করতে পারে না। এই দানবের হাতে সামান্য স্বার্থ রক্ষার জন্য দাদামশাই তাঁহার আদরের স্নেহের পুত্তলি জ্যোতির্ম্ময়ীকে অম্লান বদনে নিক্ষেপ করবেন? না করলে সব যাবে—সমস্ত বিষয় বিভব লোপ হবে। হলেই বা? তাতে ক্ষতি কি? ঘটনা স্রোতের ঘূর্ণীপাকে—কালচক্রের পেষণে নিত্য নিত্য কত জীবের উত্থান পতন ও লোপ হচ্ছে তার কি ইয়ত্ত্বা আছে? অনন্ত লীলাময়ের অপার লীলার মধ্যে পলে পলে কত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি লয় হচ্ছে—তার কি সংখ্যা আছে? কীটানুকীট আমরা—আমাদের সামান্য একটু স্বার্থ নষ্ট হবে ব'লে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হ'য়ে মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে স্বার্থটুকু বজায় রাখবার চেষ্টা করতে হয়? হায়রে স্বার্থ! হায়রে মানব! দাদামশাই দাদা মশাই! উঃ উঃ—"

ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী আবার চিন্তা করিতে

লাগিল—"কি করি? রবীর কাছে ছুটে যাব? গিয়ে তার পায়ে ধরে কাঁদব! সে কি রক্ষা করবে না? তাও কি হয়? আমি অবলা হিন্দু রমণী। আমার স্বাধীনতা কোথায়? হিন্দু রমণী শৈশবে পিতার অধীন—যৌবনে স্বামীর অধীন—বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীন। অধীনতায় যার জন্ম কর্ম্ম ও অবসান—সে কি করতে পারে? না—কিছুই করতে পারে না। আমিও কিছুই করতে পারি না। সব সহ্য করতে হবে। অম্লান বদনে অকাতরে সমাজের নিষ্ঠুরতা—সমাজের শাসন—আত্মীয় স্বজনের স্বার্থপরতা—সব সহ্য করতে হবে। পার ভাল—না পার কেত-কীর জলের বা রজ্জুর আশ্রয় গ্রহণ কর। ভাল সেই ভাল। দেখি, আমার অদৃষ্টে কি আছে।" জ্যোতির্ম্ময়ী আর ভাবিতে পারিল না। একটি গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বরাকরে সনৎপুরের জমিদারী লইয়া কেশবের ভবিষ্যত আকাশ ক্রমে ঘনীভূত হইয়া আসিল। আদালতের আদেশ অনুসারে বহুপূর্ব্বে সরকার বাহাদুরকে উহার দখল দেওয়া কেশবের উচিত ছিল। কিন্তু দুই তিনটি কারণে উহা এতাবৎ কার্য্যে পরিণত হয় নাই। প্রধান কারণ এই যে, ঐ জমিদারীর মধ্যে গুটিকতক সাঁওতাল সর্দ্দার বিনা খাজনায় বিস্তর জমি দখল করিয়া ফসল উৎপন্ন করিত। ইহারা প্রায় কর দিত না। পরিবর্ত্তে কয়লার খনি হইতে কয়লা তুলিবার জন্য যত লোক আবশ্যক হইত তাহারই যোগান দিত—অর্থাৎ কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা কর দিত—কিন্তু কখন নগদ কিছু দিত না। এই সর্দ্দারগণ এইরূপ ভাবে বাস করিয়া বিশেষ সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা প্রকৃতই আপনাদিগকে এক একজন স্বাধীন জমিদার বলিয়া মনে করিত। কিছুকাল পূর্ব্বে কেশব একবার তাহাদিগকে বাৎসরিক নগদ টাকা খাজনা হিসাবে দিতে হইবে বলিয়া আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু সে আদেশ মত কোন কার্য্যই হয় নাই। তাহারা একজোটে উদ্ধতভাবে এই আদেশের প্রতিবাদ করিয়াছিল এবং জোর জবরদস্তি করিলে তাহারা দাঙ্গা হাঙ্গামা করিবে ও কেশবের কাছারীবাটি লুটপাট করিয়া আগুন জ্বালাইয়া দিবে

বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিল। সেই হইতে কেশব আর কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। এই রূপে কৃতকার্য্য হইয়া সাঁওতাল সর্দ্দারগণ বড়ই দুর্দ্ধর্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এক্ষণে যখন তাহারা শুনিল যে, সরকার বাহাদুরের হাতে কেশবকে জমিদারীর খাস দখল দিতে হইবে, তখন তাহারা সে কথা বিশ্বাস করিল না। তাহারা ভাবিল যে, এটী কেশবের চালাকী। কেশব নিজেই সরকার বাহাদুরের শরণাগত হইয়া শুধু খাজনা আদায় করিবার একটী কৌশল খাটাইয়াছে। অতএব সকলে মিলিয়া দল-বদ্ধ হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে এসব গোলযোগ মিটিয়া যাইবে। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া সরকারের সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইল ও প্রাণ দিয়া নিজেদের সত্ব সংরক্ষণ করিবার জন্য উদ্যত হইল।

কেশব প্রথমে সরকার বাহাদুরের নিকট কিছু সময় চাহিয়াছিলেন। সরকার বাহাদুরের নিকট দুই তিন বার সময়ও পাইয়াছিলেন। কিন্তু যখন কিছুতেই প্রজাদের বশে আনিতে পারিলেন না, তখন একেবারে হতাশ হইলন।—কি করিবেন কিছু খুঁজিয়া পাইলেন না। ঠিক এই সময়ে তথাকার ম্যানেজার হঠাৎ মারা গেলেন। কেশব পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী হইলেন। এই সব কারণে কোন সুবন্দোবস্ত করিতে না পারায় বরাকরের বিষয় লইয়া একটী বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। সরকার বাহাদুরের কোন হুকুমই মান্য হইল না। এমন কি তথাকার সংবাদও নিয়মিতভাবে আসিল না। এই সব কারণে সরকার বাহাদুর কেশবের প্রতি

ক্রমে বড়ই অসন্তুষ্ট হইলেন। প্রথম প্রথম নোটিস জারী হইল। তাহাতে ফল হইল না। শেষে যখন সরকারের নিকট সংবাদ আসিল যে, কেশবের প্রজারা কিছুতেই দখল দিবে না, তখন পরোয়ানা ও পরিশেষে কেশবের নামে ওয়ারেণ্ট জারী হইল। উপস্থিত বরাকরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট হাজির হইবার জন্য কেশবের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইল। আর সেই ওয়ারেণ্ট বর্দ্ধমান জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা জারী করিয়া আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইবার আদেশ হইল। আজ নরগ্রামে পুলিশ কর্ম্মচারী এই ওয়ারেণ্ট বলে কেশবকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে। গ্রামে একটা মস্ত হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ ভগ্নস্বাস্থ্য কেশব নিরুপায় হইয়া ক্ষিতীশকে সংবাদ পাঠাইলেন ও স্বামীজির নিকট এ বিপদের সংবাদ সমস্ত জানাইলেন। স্বামীজি তখনও বরিশালে রবীন্দ্রের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বসিয়াছিলেন এবং রবীন্দ্রকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল না দেখিয়া যাইবেন না বলিয়া তথায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। কেশব উপস্থিত জামিন দিয়া ওয়ারেণ্টের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইলেন, কিন্তু এক সপ্তাহ মধ্যে বরাকরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট হাজির হইতে হইবে বলিয়া পরদিন প্রাতে পৌত্রী, ভগ্নি ও বিনোদকে লইয়া বরাকরের জমিদারী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কেশব যথাসময়ে সপরিবারে নিজ জমিদারীতে পৌছিলেন। উপযুক্ত উকিল নিযুক্ত করিয়া তাঁহার উপস্থিত বিবাদ ও অবস্থার

কথা ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরকে জানাইলেন। তাঁহার তথাকার ম্যানেজারের হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে ও তাঁহার নিজের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হেতু উত্থান শক্তি রহিত হইয়া যাওয়াতে যে আদালতের আদেশ নিয়মিত ভাবে পালিত হয় নাই এই মর্ম্মে কৈফিয়ৎ প্রদান করিলেন; এবং পরিশেষে আরও কিছুদিন সময় প্রার্থনা করিয়া জানাইলেন যে, এই সময় মধ্যে তিনি প্রজাদিগকে বুঝাইয়া যাহাতে কোনরূপ শান্তিভঙ্গ না হয় সে বিষয়ের ব্যবস্থা করিবেন। যাহাতে সরকার বাহাদুর নির্ব্বিবাদে জমিদারীর দখল পান সেই মর্ম্মে আইন সঙ্গত রীতিমত মোচলেখা সঙ্গে সঙ্গে লিখিত পঠিত করিয়া দিলেন। কেশব আরও তিন মাস সময় পাইলেন। উপস্থিত দায় কাটিল বটে কিন্তু কিরূপে যে এই সময়ের মধ্যে উদ্ধত সাঁওতাল সর্দ্দারগণকে বশে আনিবেন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকে জানাইলেন যে, এবার যদি উক্ত সময়ের মধ্যে দখল না পাওয়া যায় তবে তাঁহাকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

ক্ষিতীশচন্দ্র এ বিপদের কথা শুনিয়া বিশেষ কোনরূপ মনোযোগ করিল না। শুধু উত্তরে জানাইল যে, সর্ত্তানুসারে যতদিন না জ্যোতির্ম্ময়ীর সহিত বিবাহ হইতেছে ততদিন সে কোন উপকার করিবে না। এ সমস্ত তাঁহার বাজে কথা ও মিথ্যা ওজর—শুধু বিবাহের দিন স্থগিত করাই এ ওজরের উদ্দেশ্য।

স্বামীজি কেশবের পত্র পাইয়া বিশেষ দুঃখিত ও বিচলিত হইলেন। রবীন্দ্র নাথ সরকারী হাঁসপাতালের চিকিৎসায় ও সেবা শুশ্রূষার গুণে আরোগ্য লাভ করিতেছিল। রবীন্দ্র স্বামীজির

মুখে জ্যোতির্ম্ময়ী ও দাদামহাশয়ের উপস্থিত বিপদের কথা শুনিয়া বিশেষ বিচলিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কি উপায়ে তাঁহাদিগকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারে তাহার মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল। দুই তিনদিন ভাবিয়াও বিশেষ কিছু স্থির করিতে পারিল না। সে নিজে দরিদ্র ও নিঃস্ব। এ বিপদে প্রকৃত সাহায্য করিতে হইলে অর্থের আবশ্যক—সেও সামান্য নহে। সহায় সম্পত্তিহীন রবীন্দ্র কি করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর এ সময় উপকার করিতে পারে? অথচ জ্যোতি—তাহার আরাধ্য জ্যোতি—তাহার হৃদয় সর্ব্বস্ব জ্যোতিকে বিপন্না ভাবিয়া রবীন্দ্র প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইল। স্বামীজির সহিত প্রকাশ্যভাবে এ সম্বন্ধে দু একটি কথা হইল। কিন্তু কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে স্বামীজি কেশবকে উত্তরে লিখিলেন যে আদালতের মর্য্যাদা যেমন করে হোক রক্ষা করিতে হইবে এবং যাহাতে আদালতের আদেশ সুচারুরূপে প্রতিপালিত হয় তাহাই তাঁহাকে করিতে হইবে। ইহাতে যদি তাঁহার সমস্ত বিষয় বিভব নষ্ট হয় তাহা হইলেও ক্ষতি নাই। রাজাদেশ দেবতার আদেশ স্বরূপ প্রতিপালন করাই প্রজামাত্রেরই কর্ত্তব্য— বিশেষ হিন্দুর কাছে রাজা ও দেবতা দুই সমান। এ ছাড়া অধিক বলিবার তাঁহার কিছু ছিল না।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কেশব মনে মনে স্থির করিলেন যে, উপস্থিত যে সময় পাইলেন ইহার মধ্যেই ক্ষিতীশের সহিত জ্যোতির বিবাহটি সম্পন্ন করিয়া সরকার বাহাদুরের ঋণটা পরিশোধ করিবেন ও তাঁহার উদ্ধত সাঁওতাল প্রজারা তাঁহার আদেশ মত কার্য্য করুক বা না করুক তিনি উক্ত সময় মধ্যে নিজের কাছারী প্রভৃতি যাহা কিছু আছে তাহা উঠাইয়া লইয়া সনৎপুর জমিদারীটি সরকার বাহাদুরের হাতে দিয়া দিবেন। তাহা হইলে উপস্থিত গোলযোগ কতকটা মিটিয়া যাইবে। তাহার পর তিনি আর বিষয় সম্পত্তি নিজ হাতে কিছু রাখিবেন না। সমস্ত নাতনীর বা তৎপক্ষে ক্ষিতীশের হস্তে সমর্পণ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল ৺কাশীধামে কাটাইবেন। এই বয়সে ও এইরূপ স্বাস্থ্যে আর ঐহিক বিষয় লইয়া ঘাঁটা ঘাটি করিতে তাঁহার আর প্রবৃত্তি রহিল না। এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তিনি বরং অধিক আগ্রহের সহিত ক্ষিতীশকে বিবাহের আয়োজন ও দিনস্থির করিতে অনুরোধ করিলেন।

বিপদ কখন একা আসে না। পুত্রের উচ্ছৃঙ্খলতা ও চরিত্রহীনতার বিষয় দেখিয়া শুনিয়া ক্ষিতীশের মাতা মরমে মরিতে ছিলেন। পুত্র মাতাকে একটা সামান্য দাসীর মত দেখিত। মাতা পুত্রে প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হইত না। পুত্র যদৃচ্ছভাবে

দিন কাটাইতেছে দেখিয়া যদি মাতা কখন কোন কথা বলিতেন বা তাহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেন তাহা হইলে তাহার আর অপমানের সীমা থাকিত না। এজন্য তিনি প্রায়ই খুলনার বাটিতে একা থাকিতে ভাল বাসিতেন। কৌশল করিয়া অনেক বুদ্ধি খাটাইয়া নিজের পুত্রের হস্তে স্বামীর অতুল বিভব সমর্পণ করিয়াছিলেন। প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, পুত্রের বিবাহ দিয়া ও এই সম্পত্তি লইয়া বেশ সুখের সংসার পাতিবেন। ক্রমে তাঁহার ভ্রম তিনি নিজেই বুঝিতে পারিলেন। বুঝিলেন যে এই সমস্ত বিষয় বিভব পুত্রের হস্তে না পড়িলেই ভাল হইত। স্বামীর পরিত্যক্ত অর্থে বলবান হইয়া ক্ষিতীশ স্বেচ্ছাচারী ও চরিত্র হীন হইয়া কাহাকেও দৃকপাৎ করে না। তাহার উপর স্বার্থপর নীচ চাটুকার বন্ধু বান্ধবের সংস্রবে যে সে অবনতির নিম্নস্তরে নামিয়া যাইতেছে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। অচিরে সৌদামিনী দেবীর মনোভঙ্গ ও তৎসঙ্গে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে লাগিল। পুত্র মাতার প্রতি একেবারে উদাসীন। কচিৎ কখন এক আধবার দেশে আসিত—তাও দুই চারি ঘণ্টার জন্য—শুধু অর্থাগমের সুব্যবস্থার উদ্দেশ্যে। মাতার চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা হইল না—সে বিষয়ে বড় একটা কেহ লক্ষ্য করিল না। যখন কেশবের শেষ পত্র আসিল তখন ক্ষিতীশের মাতা মৃত্যুশয্যায়। বাধ্য হইয়া ক্ষিতীশকে দিন কতকের জন্য খুলনার বাটিতে আসিতে হইল এবং বিবাহের দিন স্থির করিতে কাজেই বিলম্ব হইল। এইরূপে আরও কিছু দিন কাটিয়া গেল।

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ বেশ আরোগ্য লাভ করিল। সে উপস্থিত তিন মাসের ছুটি লইয়া নিজ স্বাস্থ্যোন্নতি কল্পে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য রাঁচি যাত্রা করিল। স্বামীজিও কাশীধামে চলিয়া গেলেন। কেশব মধ্যে মধ্যে রবীন্দ্রকে পত্রাদি দিতেন। তাহার গত বিপদের কথা শুনিয়া তিনি বড়ই দুঃখিত ও চিন্তিত হইয়াছিলেন এবং আইন আদালতের গোলযোগে না পড়িলে তিনি নাতনী সমভিব্যহারে তাহাকে দেখিতে যাইতেন—তাহাও জানাইলেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার সমস্ত বিপদের কথা যে শুনিয়াছেন ও এই বিপদে যে কোন বিশেষ রূপ উপকার করিতে পারিতেছেন না এবং তজ্জন্য যে প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইতেছেন—এই মর্ম্মে পত্রাদি দিলেন। এই ভাবে দিনকতক কাটিয়া গেল। রবীন্দ্রের অবসর প্রায় শেষ হইয়া আসিল। এমন সময় হঠাৎ রাঁচিতে একদিন সরকারী খামের উপর '—'বিশেষ জরুরী' শব্দ লেখা একখানি খাম ডাক মারফতে তাহার হস্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। খাম খুলিয়া যাহা পাঠ করিল তাহাতে সে একে বারে অবাক হইয়া গেল। দেখিল খামের মধ্যে অনেক গুলি কাগজ পত্র রহিয়াছে। এই সমস্ত কাগজ পাঠে রবীন্দ্র অবগত হইল যে, সে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিয়া সেই গভীর অন্ধকার রাত্রে যে বীরত্ব দেখাইয়াছিল তাহা নিষ্ফল হয় নাই। নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া যে কর্ত্তব্য পরায়ণতা দেখাইয়াছিল ও উর্দ্ধতনে রাজকর্ম্মচারীদের প্রাণরক্ষা করিয়াছিল সেই সংবাদ লাট বাহাদুরের নিকট

বিস্তারিত ভাবে পৌঁছায়। তিনি ইহাতে অতিশয় সন্তুষ্ট হন—সেই জন্য তাহার বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ বরাকরের সনৎপুর জমীদারীটি—যাহা প্রিভি কাউন্সিলের রায় অনুসারে গবমেণ্টের সম্পত্তি বলিয়া স্থির হইয়াছে—ও ঐ জমিদারী সহ ডিক্রীর যাবতীয় প্রাপ্য সমস্তই রবীন্দ্রনাথকে নিব্যূঢ় সূত্রে সরকার বাহাদুর দান করিতেছেন—ইহাই হইল পত্রের স্থূলমর্ম্ম। ইহা ব্যতীত রবীন্দ্র নাথকে ১মশ্রেণীর ডেপুটির পদে উন্নিত করা হইয়াছে—ইহাও পত্রে উল্লেখ ছিল। রবীন্দ্রনাথ যাহাতে অতি শীঘ্র কলিকাতার সেক্রীটারিয়েট্ আফিসে গিয়া তথাকার বড় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে উপযুক্ত দলীল পত্রাদি লয়েন তাহার জন্যও তাহাকে উক্ত পত্রে অনুরোধ করা হইয়াছিল।

পত্র পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথ আনন্দাশ্রু না ফেলিয়া থাকিতে পারিল না। কাগজ পত্র পাঠে সে জানিতে পারিল যে সনৎপুর জমিদারীটির খাস দখল পাইবার আর এক সপ্তাহ বাকি আছে ও কেশবের উপর যে ডিক্রীর টাকা বাকি আছে তাহা আদায়ের জন্য কেশবের সমস্ত জমিদারী ক্রোক দেওয়া হইয়াছে এবং উহা নিলামে বিক্রয় হইলে রবীন্দ্র নাথ বারাকরের সরকারী উকীলের নিকট হইতে ডিক্রী বাবৎ যাহা কিছু প্রাপ্য তাহা পরে বুঝিয়া পাইবেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কেশব কাছারী তুলিয়া লইয়া চলিয়া যাইবে এ সংবাদ প্রচারিত হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়া আবার এক নূতন বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার সাঁওতাল প্রজারা তাঁহাকে এ অবস্থায় ছাড়িয়া দিতে চাহিল না। তাহারা বলিল যে,যতদিন সরকার বাহাদুরের সহিত একটা নিষ্পত্তি না হয়, ততদিন তাহারা তাহাদের জমিদারকে ছাড়িবে না। যদি মরিতে হয় তবে সকলেই একসঙ্গে মরিবে। তাহারা আরও ভয় দেখাইল যে, যদি কেশব তাহাদের অকূলে ভাসাইয়া চলিয়া যান তাহা হইলেও তাঁহার নিস্তার নাই। তাহারা টাঙ্গীর দ্বারা জমিদার বংশ নির্ম্মূল করিয়া দিবে—তাহার পর নিজেদের অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা হইবে। তাহাদের যদি জমীজমাই গেল তবে আর বাঁচিয়া সুখ কি? জমিজমার সঙ্গে তাহারাও না হয় যাইবে—তাহারা সকলে মরিবার জন্য পণ করিল। দেখিতে দেখিতে আরও এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। আগামী কল্য কেশবকে সমস্ত সনৎপুরটী ছাড়িয়া দিয়া সরকার বাহাদুরকে খাস দখল দিবার দিন। দিতে না পারিলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের শেষ আদেশ অনুসারে তাঁহাকে শ্রীঘরে যাইতে হইবে। আর দখল দিতে সম্মত হইলে সাঁওতালের টাঙ্গীর আঘাতে সবংশে নিধন

হইতে হইবে। এ বিপদে নিরুপায় হইয়া কেশব গৃহের এক পার্শ্বে বসিয়া ইষ্টমন্ত্র ও দুর্গা নাম জপ করিতে লাগিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী নিরাশ হইয়া আত্মহত্যা করিবে বলিয়া স্থির করিল।

রবীন্দ্র নাথ সরকারী পত্র পাইয়াই সেই দিনই রাঁচি পরিত্যাগ করিল ও পরদিন কলিকাতায় আসিয়া সেক্রেটারিয়েট আফিসের বড় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিল। সেইখান হইতে উপযুক্ত দলীল সনন্দ ও কাগজ পত্রাদি লইয়া কলিকাতায় তাহার এক এটর্নী বন্ধুর সহিত কত কি পরামর্শ ও যুক্তি করিল। ইহাতে প্রায় দুই তিন দিন কাটিয়া গেল। তাহার পর কলিকাতার কার্য্য শেষ করিয়াই বরাকরের সরকারী উকিলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে কলিকাতা পরিত্যাগ করিল। বরাকরের সরকারী উকিল বাবু অতুলকৃষ্ণ বসু একজন বিখ্যাত ব্যবহারজীব ও অতি সজ্জন। কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া তাহার পরদিন সন্ধ্যার পর অতুল বাবুর বাসায় সাক্ষাৎ করিবার মনস্থ করিল। অতুল বাবুর পসার বিস্তর—তাঁহাকে নির্জ্জনে পাওয়া বড়ই কঠিন। নিজের ব্যবসা ছাড়া দেশের অনেক কাজ তাঁহাকে দেখিতে হয়।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে অতুল বাবুর আফিস ঘরে রবীন্দ্র নাথ তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিবার মানসে অপেক্ষা করিতেছিল। আগামী কল্য কেশবকে জমিদারীর দখল দিতে হইবে, না দিতে পারিলে তাহার সমূহ বিপদ—এদিকে সময়ও বড় কম—এ বিষয় ভাবিতে ভাবিতে রবীন্দ্র বড়ই উৎকণ্ঠিত ভাবে সময় কাটাইতে লাগিল।

অতুল বাবুর কাছারীর কার্য্য শেষ করিয়া বাড়ি ফিড়িতে প্রায় সন্ধ্যা হইল। তাহার পর মুখ হাত পা ধুইয়া ও একটু বিশ্রামের পর জলযোগ শেষ করিয়া রবীন্দ্রের সহিত সাক্ষাত করিতে প্রায় রাত্রি ৮টা বাজিয়া গেল।

অতুল বাবু আফিস ঘরে আসিয়া নিজ চেয়ারে বসিলে পর রবীন্দ্র নাথ আত্মপরিচয় দিল। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর উভয়ের মধ্যে বেশ আলাপ হইয়া গেল। রবীন্দ্রের বীরত্ব কাহিনী লইয়া কতকটা সময় কাটিয়া গেল। গবর্ণমেণ্টের নিকট তিনি যে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন ইহাতে সমগ্র বঙ্গবাসীর মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে এইরূপ অনেক কথা হইল। তাহার পর আসল কথা উত্থাপিত হইল। অতুলবাবু বলিলেন—"আগামী কল্য কেশব বাবুকে সনৎপুর জমিদারীটি ছাড়িয়া দিতে হইবে। কিন্তু যেরূপ সংবাদ শুনিতেছি—তাহাতে বোধ হয় একটা ভীষণ রকমের দাঙ্গাহাঙ্গামা ও খুন খারাপী হইবার সম্ভাবনা, কারণ তাঁহার সাঁওতাল প্রজারা বড়ই বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে।"

র—"সাঁওতাল প্রজারা যদি দখল দিতে আপত্তি ক'রে তাহা হইলে কেশব বাবুর কি ঘটিতে পারে ?"

অ—"দেখুন ! কাল আমরা বেলা ১২টার সময় সরকার তরফ থেকে দখল নিতে যাব। যদি কোনরূপ আপত্তি বা গোলযোগ বাধে তবে পুলিস সাহায্যে আমাদের বল পূর্ব্বক দখল নিতে হবে। যখন সরকার পক্ষ ঐ জমিদারী আপনাকে দান করেছেন তখন অবশ্য দখল আপনাকে দিয়ে দিতে হবে বৈ কি—নচেৎ

মানের আর মূল্য রইল কি? এ অবস্থায় আর এক দিনের সময় কেশবকে দেওয়া হবে না—ইহাস্থির। যদি কেশব দখল দিতে অক্ষম হয়, বা তাহার লোক কিম্বা প্রজারা বাধা দেয়, তাহা হইলে দাঙ্গাহাঙ্গামারই সম্ভবনা এবং সেজন্য পুলিসও আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে আছে। কিন্তু কেশব যেরূপ মোচলেকা দিয়ে গতবার সময় নিয়েছে তাতে এইরূপ বাধা বিঘ্ন ঘটলে তার মিয়াদ হবার সম্ভাবনা—সম্ভাবনাই বা বলি কেন—মিয়াদ নিশ্চয়ই।"

রবীন্দ্র শুধু "হাঁ" করিয়া নীরবে কি ভাবিতে লাগিল।

রবীন্দ্রকে নিস্তব্ধ দেখিয়া অতুল বাবু আবার বলিতে লাগিলেন—"আপনার ভাবনা কি? কাল আপনাকে দখল দেবই। তবে ডিক্রীর টাকা পেতে দু'তিন সপ্তাহ দেরী হতে পারে। এর বেশী কিছুতেই নয়।" কেশবের প্রায় সমস্ত জমিদারী ক্রোক দেওয়া হয়েছে। আর দু'তিন দিন মধ্যে ঐ সমস্ত লাটে চড়বে আর কি।

র—"হাঁ! এসংবাদ আমি পূর্ব্বেই পেয়েছি। এখন আপনি যদি আমার একটা উপকার করেন তবে আমি বড়ই বাধিত হই।"

অ—"কি বলুন।"

র—"দখল লওয়া ও জমিদারী নিলাম বিক্রয় করা আপনাকে রদ করতে হবে।"

অ—"একি বলছেন? এ একেবারেই অসম্ভব।"

র—"কিসে অসম্ভব—উকিল বাবু? যাতে সম্ভব হয় সেই কথা বলবার জন্যই এতদূর এসেছি। কিন্তু তার পূর্ব্বে

আপনাকে একটি উপকার করতে হবে। আমি এখন যা করতে চাই তা যেন সম্পূর্ণ গোপন থাকে। পরে প্রকাশ করিতে পারেন; কিন্তু উপস্থিত ২।৪ মাস যেন কোন কথা প্রকাশ না পায়—এই আমার একান্ত অনুরোধ।"

অতুলবাবু প্রথমে রবীন্দ্রের কথা ভাল বুঝিতে পারিলেন না। সেই কারণ কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। শুধু এই বলিলেন—"আপনার কি উপকার করতে হবে আমাকে স্পষ্ট করে বলুন দেখি। যদি সম্ভবপর হয় ও আমার স্বার্থের ক্ষতি না হয় তা হলে প্রাণদিয়ে আপনার কথা পালন করব।"

"সে কি কথা? আপনার স্বার্থের হানিজনক বা অন্যের স্বার্থের হানিজনক কাজ আমি করব না।" এই বলিয়া একখানি ষ্টাম্পের উপর লিখিত দলিল বাহির করিয়া উহা অতুলবাবুকে পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। পাঠ করিয়া করিয়া অতুলবাবু বলিলেন—

"এটা একটা দানপত্র দেখছি ত। আপনি সনৎপুর জমিদারীটা ও ডিগ্রির সমস্ত টাকা কেশববাবুর পৌত্রী জ্যোতির্ম্ময়ীকে নিব্যূঢ় স্বত্বে দান করিতে চান?"

"হাঁ! এই আমার ইচ্ছা। আমি সরকার বাহাদুরের অনুগ্রহে যখন এই সমস্ত সম্পত্তির মালিক হয়েছি তখন অবশ্য আমার দান বিক্রয়ের ক্ষমতা আছে।"

"নিশ্চয়ই আছে।"

"আমি আমার বন্ধু এটর্নীর নিকট হতে দলীল রীতিমত

ষ্ট্যাম্পের উপর লিখিয়ে নিয়ে এসেছি। এখন আপনার সাক্ষাতে ইহা সহি করতে চাই। আপনি আমার উকিল হইয়া যথা রীতি সাক্ষী রেখে ইহা রীতিমত লেখা পড়া রেজেষ্টারী করিয়ে দিন। আপনার পারিশ্রমিক স্বরূপ এই ১০০ টাকা গ্রহণ করুন।"

অতুলবাবু এই সব কথা শুনিয়া একেবারে অবাক। ভাবিতে লাগিলেন যে, এ লোকটা বাতুল নাকি? এত বড় একটা জমিদারী ও ৫৫,০০০৲ হাজার টাকার ডিগ্রী অম্লান বদনে ছেড়ে দিচ্ছে। পরক্ষণেই বলিলেন—"যদি কিছু মনে না করেন তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—কি কারণে ও কি সম্পর্কে এত বড় বিষয়টা জ্যোতির্ম্ময়ীকে দান করছেন?"

"এর উত্তর দিতে পারলাম না, সে জন্য ক্ষমা করবেন। বারান্তরে সবিশেষ জানাব। তবে এই মাত্র বলতে পারি যে ঐ সম্পত্তি আমি নিজে ভোগ করে যত না সুখী হব, জ্যোতির্ম্ময়ী ভোগ করলে তদধিক সুখী হব। যাহাহউক পরে সমস্তই জানতে পারবেন। থাক্, কথায় কথায় রাত্রি অনেকটা হয়ে গেছে? আপনাকে আর আটক রাখব না—আমি আজ রাত্রের ট্রেণেই কলিকাতায় যেতে চাই। যাবার আগে আপনাকে শেষ অনুরোধ করছি—সময় বড় কম। আর কালই যাতে সরকারী তরফের দখল লওয়া রদ হয় ও জ্যোতির্ম্ময়ী যাতে নির্ব্বিবাদে তার পিতামহের সম্পত্তি ভোগ করতে পারে— তার ব্যবস্থা করিবেন। আর কেশবের

জমিদারীর উপর যে ক্রোক হয়েছে তাহা কালই উঠিয়ে নেবেন। আমি ডিগ্রির টাকা সম্পূর্ণ কেশবের নিকট হতে বুঝে পেয়েছি এই মর্ম্মে রীতিমত লেখাপড়া করে দিচ্ছি। অতএব কেশবের জমিদারী তাকে ছেড়ে দিয়ে এই ব্যাপার এইখানে নিষ্পত্তি করে দিন। কিন্তু আমার বিশেষ অনুরোধ—উপস্থিত এ সমস্ত কথা যেন প্রকাশ না পায়।"

"সম্পূর্ণ গোপন রাখা অসম্ভব। সরকারী পক্ষকে ত সমস্ত জানাতে হইবে?"

"তা হোক। তবে কেশবের পক্ষের লোককে বা উকিলকে কিছু জানতে দিবেন না।"

"কিন্তু কতদিন এই গোপন রাখতে বলেন। এই দান পত্র ও অন্যান্য দলীল পাত্রাদি এক দিন ত জ্যোতির্ম্ময়ীকে দিতে হবে—নচেৎ দান সিদ্ধ হবে কি প্রকারে?"

"সে যখন আমার স্থলে মালিক হচ্ছে, তখন অবশ্য সমস্ত দলীল কাগজ পত্র ত তাকে দিতেই হবে। আমার ইচ্ছা তার বিয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত একথা গোপন রাখব।

"আইন অনুসারে এই দান পত্র আজ হতে ৪মাস মধ্যে আপনাকে রেজেষ্টারী করে দিতে হবে। বড় জোর এই ৪মাস কাল তাঁদের নিকট হতে গোপন রাখা যেতে পারে।"

"উপস্থিত তাহা হইলেই আমি সন্তুষ্ট।"

"আচ্ছা। আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম।"

"তবে আজই এখনি দানপত্র দস্তখত করিয়ে উহা

আপনার নিকটই রাখুন। আজ হতে চতুর্থ মাসের মধ্যে আপনার সুবিধামত দিনধার্য্য করে আমাকে সংবাদ দিলে আমি আপনার নিকট এসে রেজেষ্টারী করে দিব।"

"বেশ কথা।"

ইহার পর অতুলবাবু তাঁহার কেরানী বাবুকে ডাক দিলেন। উকিল বাবু ও তাঁহার কেরানী বাবুর সমক্ষে রবীন্দ্র নাথ দানপত্র সহি করিয়া দিলেন। ইঁহারা দুই জনে দলীলের সাক্ষী হইলেন—দলীল খানি উকিল বাবু তাঁহার ড্রয়ারের মধ্যে চাবি দিয়া রাখিলেন। কেরানী বাবু চলিয়া গেল। অতুল বাবু রবীন্দ্রের নিকট তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় ও ভিতরকার কি গুপ্ত রহস্য আছে জানিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া সেই রাত্রেই বিদায় গ্রহণ করিলেন। এই সমস্ত কার্য্য শেষ হইতে রাত্রি অধিক হইয়া গেল। অতুল বাবু রবীন্দ্রনাথের নিস্বার্থ দানের বিষয় যত ভাবিতে লাগিলেন ততই রবীন্দ্রের উপর তাঁহার ভক্তি ও শ্রদ্ধা বাড়ীতে লাগিল। সে রাত্রে তাঁহার ভাল নিদ্রা হইল না। বলা বাহুল্য রবীন্দ্র সে রাত্রে জ্যোতির্ম্ময়ী বা কেশবের সহিত দেখা করিল না এবং সে যে ঐ দিন তাহাদের এত নিকটে উকিল বাবুর বাসায় আসিয়াছিল তাহাও তাহাদের জানিতে দিল না।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে বরাকরের পুলিশ দারোগা কেশবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানাইয়া দিলেন যে, সেই দিনই ১২ টার সময় সরকারী তরফের লোকজন আসিয়া মনৎপুর দখল করিবে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদেশ মত যেন তাঁহার প্রজারা কোন গোলযোগ না বাধায়।

প্রধান সর্দ্দার নিকটেই ছিল। সে জানাইল যে কেশব বাবু কিছু করিতে পারিবেন না। কেশব বাবু দখল ছাড়িতে পারেন, কিন্তু তাহারা কেন ছাড়িবে। তাহারা নিজেরাই নিজেদের অংশের মালিক। সরকার বাহাদুরের সহিত কেশবের মকর্দ্দমা হইয়াছে। তাহাদের সঙ্গে ত কোন মামলা হয় নাই; তাহাদের উপর কোন হুকুমও প্রচারিত হয় নাই। অতএব তাহারা কেশবের মকর্দ্দমার দায়ে দায়ী নহে। দারোগা বাবু বুঝিলেন যে এটা কেশবের চালাকী। ইহাদের দ্বারা একটি গণ্ডগোল পাকাইয়া দখল দেওয়া রদ করাই কেশবের উদ্দেশ্য। কতক্ষণ বাক্‌বিতণ্ডার পর তিনি জানাইয়া গেলেন যে, যদি সহজে তাহারা না ছাড়ে তবে বল পূর্ব্বক সরকার বাহাদুর ১২ টার সময় দখল লইবেন। সর্দ্দারও উত্তরে জানাইল যে তাহাদের "জান কবুল তবু বাপ দাদার ছিটাক জমি ছোরবে না।"

দারোগা বাবু বুঝিলেন গতিক বড় ভাল নয়। সেই জন্য তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছে সমস্ত জানাইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর যতদূর সম্ভব পুলিশ সাহায্য সংগ্রহের হুকুম দিলেন।

কেশব জ্যোতির্ম্ময়ীকে জানাইলেন, যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে তাঁহার নিজের বিপদ অবশ্যম্ভাবী। অতএব সেই দিনই ১২ টার পূর্ব্বে তিনি তাহাকে বিনোদের সঙ্গে বর্দ্ধমান পাঠাইতে ইচ্ছুক। এই প্রস্তাবে কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ী সম্মত হইল না। জ্যোতি বলিল, যদি ভগবান নিতান্তই তাঁহাকে বিপদ সাগরে নিক্ষেপ করেন তাহা হইলে সেও সেই বিপদের কতকটা ভাগ নিজের উপর লইবে। বৃদ্ধ দাদা-মহাশয়কে একা ফেলিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে কোথাও যাইতে পারিবে না। ইহাতে যাহা অদৃষ্টে থাকে থাকুক। এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া সকলে বেলা ১২ টার অপেক্ষা করিতে লাগিল। সর্দ্দারগণ সকলেই বেলা ১২ টার পূর্ব্বেই তীর ধনুক হাতিয়ার টাঙ্গী সড়কি ও লাটি প্রভৃতি অস্ত্রসস্ত্রে সুসজ্জিত হইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে বেলা ১২ টা বাজিয়া গেল। কোনই গোল যোগ উপস্থিত হইল না। এমন কি একটি চৌকিদার অবধি সে পথে আসিল না। যে দখল লইয়া সকলেই একটা ভীষণ রক্ত পাতের সম্ভাবনা বলিয়া মনে করিয়াছিল, তাহার কোন লক্ষণই নাই দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইল। দেখিতে দেখিতে বেলা ১টা বাজিল, তবু কেহই আসিল না। ৪টা বাজিল তবুও

কাহার সাক্ষাৎ নাই। এবার সাঁওতাল সর্দ্দারগণ বুঝিল যে তাহাদের ভয়ে কেশব ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। এবং সেই জন্যই সে পুলিশকে আসিতে নিষেধ করিয়াছে। প্রধান সর্দ্দার তখন সগর্ব্বে আস্ফালন করিতে লাগিল। অধীনস্থ লোক-দের সে জানাইল যে, তাহারই মতলবে সকলে কার্য্য করিয়াছে বলিয়া তাহারা কৃতকার্য্য হইয়াছে। যদি সে দাঙ্গাহাঙ্গামার ভয় না দেখাইত ও রক্তপাতের জন্য যদি সাজ সজ্জা না করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা তাহাদের বাপ দাদার সম্পত্তি হইতে বিতাড়িত হইত। যাহা হউক তাহারা সন্ধ্যা অবধি অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিল যে কোনও উপদ্রব ঘটিল না, তখন তাহারা সকলে এক জোটে কাছারী বাড়িতে উপস্থিত হইয়া কেশবের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিল। কি যে হইল ও কেনই বা আজ সরকার পক্ষ হইতে দখল লইবার কোন ব্যবস্থা করা হইল না ইহা কেশব একেবারেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, সর্দ্দারদের আহ্বানে কেশব তাহাদের সহিত ভয়ে ভয়ে সাক্ষাৎ করিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী সঙ্গে ছিল। কেশবকে নিকটে পাইয়া তাহারা তাঁহার পায়ের তলায় লাঠী সরকী রাখিয়া সকলে দণ্ডবৎ পূর্ব্বক জানাইল যে, তাহারা তাঁহার দীন প্রজা—তাহাদের তাড়াইয়া কি ফল হইবে। কেশব বিনীত ভাবে বলিল যে, প্রকৃত সে তাহাদের তাড়াইতে চায় না। রাজসরকারের আদেশ মত সে দখল দিতে বাধ্য হইয়াছে। প্রথমে তাঁহার কথায় তাহারা বিশ্বাস করিল না। জ্যোতির্ম্ময়ীকে সর্দ্দারগণ বড় ভাল বাসিত।

আর ঐ সর্দ্দারদের মধ্যে যে প্রধান—আকলু সর্দ্দার—সে জ্যোতি-র্ম্ময়ীকে "মাই" বলিয়া ডাকিত। জ্যোতি আকলুকে ডাকিয়া বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিল যে, তাহার দাদা মহাশয়ের কোন দোষ নাই—তিনি বাধ্য হইয়া এত বড় জমিদারী ও তাহাদের মত ভক্ত প্রজা ছাড়িতেছেন ও নিজে মোচলেখা লিখিয়া দিয়াছেন। এ সব না করিলে এত দিন পুলিশ তাহার "বুড়া দাদাকে কয়েদ" করিত। জ্যোতি আর ও জানাইল যে, দাদামহাশয়কে "কয়েদ" করিলে বুড়া জানে মারা যাইবে—বুড়া মারা গেলে সে নিজেও বাঁচিবে না। বলিতে বলিতে জ্যোতির চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। আকলু সর্দ্দার এইবার সমস্ত বুঝিল এবং তাহার চোখে জল দেখিয়া একটু দুঃখিত হইল—সে প্রতিজ্ঞা করিল যে, তাহারা আর কখন কেশবের অবাধ্য হইবে না। কেশবকে বিপদে নিক্ষেপ করা অপেক্ষা তাহারা ভিখারীর মত পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইবে—সেও ভাল। তবু তাহাদের 'জান' থাকিতে "মাইয়ার" কোন বিপদ ঘটিতে দিবে না। এইরূপ কথা বার্ত্তা হইতেছে এমন সময় পুলিশ দারোগা আসিয়া সংবাদ দিল যে, কেশব বাবুকে আর দখল দিতে হইবে না। কেশব, কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে সঠিক কিছু উত্তর দিতে পারিল না। শুধু এই মাত্র জানাইল যে, উর্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারী যেটুকু সংবাদ দিতে আদেশ করিয়াছে সে সেইটুকু আদেশ পালন করিতে আসিয়াছে—বিস্তারিত কিছু বলিতে পারে না।

যাহা হউক, এই বিপদে একটু শান্তির বাতাস পাইয়া কেশবের যেন প্রাণ ফিরিয়া আসিল। মিষ্ট কথায় আপ্যায়িত করিয়া তিনি

দারোগা সাহেবকে বিদায় দিলেন। সাঁওতাল সর্দ্দারগণ এ সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া গেল। অচিরে তাহাদের দলবল বড় বড় জয় ঢাক ও সাঁওতালি মাদোল ঘাড়ে করিয়া আনিয়া কেশবকে ক্রোড়ে লইয়া তালে তালে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। কেশব একে বৃদ্ধ—তাহার উপর রুগ্ন তিনি এই সব সহিতে পারিবেন কেন? কাজেই তাহাকে ছাড়িয়া পুরুষগণ বিনোদকে ধরিল ও সাঁওতাল রমণীগণ জ্যোতির্ম্ময়ীকে বনফুলের মালা পরাইয়া কোলে তুলিয়া তাহাদের "মাইয়াকে" লইয়া নাচিতে লাগিল। ক্রমে যখন সন্ধ্যার কালছায়া কাছারি বাড়ির প্রাঙ্গনটিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, তখন দলে দলে সাঁওতাল বালক বালিকাগণ এক একটা মশাল হস্তে করিয়া আনিতে লাগিল ও প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিক আলোকমালায় ভূষিত করিয়া দিল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নৃত্য-বাদ্য ও আনন্দধ্বনিতে কাছারী বাড়ী সরগরম হইয়া রহিল। কেশবের আদেশে এই সমস্ত প্রজাদের সেই রাত্রের আহারের ব্যবস্থা করা হইল। জ্যোতির্ম্ময়ী স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া সকলকে আহার করাইল। সেই সমস্ত শেষ হইতে রাত্রি প্রায় ১টা বাজিয়া গেল। ইহাদের মধ্যে কেহ নিজ নিজ গৃহাভি-মুখে চলিয়া গেল, কেহবা সেই রাত্রে কাছারী বাটিতে যাপন করিবার বন্দোবস্ত করিয়া লইল।

কেশব সরকার বাহাদুরের এ নিশ্চেষ্টতার প্রকৃত রহস্য জানিবার জন্য বড়ই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন। একারণ যাহাতে আগামী কল্য বিনোদ তাহার উকিলের সহিত সাক্ষা

করিয়া প্রকৃত ব্যাপার জানিয়া আসে সেইরূপ আদেশ করিলেন। তাহার পর সকলেই নিজ নিজ শয়ন কক্ষে গিয়া শুইয়া পড়িলেন।

অধিক রাত্রে শয়ন করিয়াছে বলিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর উঠিতে বিলম্ব হইল। প্রভাত সমীরণে গা ঢালিয়া যখন জ্যোতির্ম্ময়ী সুখে নিদ্রা যাইতেছে তখন সে স্বপ্ন দেখিল যেন রবীন্দ্র তাহার কাছে আসিয়া বলিতেছে, "জ্যোতি! আর দেখা করিব না মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু তোমার বিপদে কি আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব।" উত্তরে জ্যোতি বলিল "রবি দা! এরূপ ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশ আজ কার ফুৎকারে ঐ রকম পরিচ্ছন্ন হইল?" রবি যেন উত্তরে বলিল— "আজ নয়—আর একদিন তোমাকে সমস্ত জানাব।" এই বলিয়া রবিন্দ্র যেন চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। জ্যোতি তাহার পায়ে ধরিয়া অনুরোধ করিতে যাইবে এমন সময় তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া দেখিল—অনেকক্ষণ প্রভাত হইয়া গিয়াছে।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্র অতুলবাবুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া ১০॥টার ট্রেণ ধরিতে পারিল না। তাহার পর যে ট্রেণ কলিকাতায় আইসে তাহার সময় রাত্রি ৩টা। এত রাত্রে কোথাও না গিয়া রবীন্দ্র ষ্টেশনেই কিছু জলযোগ করিয়া লইল এবং সেকেণ্ডক্লাশ যাত্রীদের জন্য যে বিশ্রামভবন থাকে সেইখানেই এই কয়ঘণ্টা কাটাইবে—স্থির করিল। একজন ষ্টেশনের খালাসীকে কিছু বকসিসের প্রলোভন দেখাইয়া বলিয়া দিল যে, সে ৩টার ট্রেণে কলিকাতায় যাইবে অতএব ঐ ট্রেণ আসিবার কিছু পূর্ব্বে সে যেন তাহাকে জাগাইয়া দেয়। এই বলিয়া রবীন্দ্র আসবাব পত্র নিকটে রাখিয়া একখানি লম্বা বেত মোড়া বেঞ্চের উপর শুইয়া পড়িল।

যখন রাত্রি ৩টার ট্রেণ আসিল তখন সেই খালাসী তাহাকে জাগাইয়া দিয়া তাহার মালপত্র ট্রেণে উঠাইয়া দিল। সমস্ত জিনিসপত্র উঠান হইল কিন্তু তাড়াতাড়িতে ভুলক্রমে তাহার album পুস্তকখানি ওয়েটিং রুমে পড়িয়া রহিল। এই album পুস্তক মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত রচিত যাবতীয় চিত্র অঙ্কিত ছিল। তা ছাড়া কোন বাক্স বা ব্যাগ সঙ্গে না থাকায় দরকারী পত্রাদি, জ্যোতির্ম্ময়ীকে যে দানপত্র লিখিয়া দিয়াছিল তাহার মোসাবিদা প্রভৃতি অনেকগুলি বিশেষ আবশ্যকীয় কাগজ

পত্র উহার মধ্যে রক্ষিত ছিল। ইহাতে জ্যোতির্ম্ময়ীর চিত্র—জ্বলন্ত অগ্নিরাশির মধ্যে প্রবেশ করিয়া জ্যোতির উদ্ধার সাধনের চিত্র,—তাহার মাতার মৃত্যুশয্যার চিত্র—রসময়ের মৃত্যুশয্যার চিত্র ছিল—আরও নিজের ও জ্যোতির জীবনের ঘটনা লইয়া যে সকল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিল সে গুলিও উহার মধ্যে ছিল। অপর কাহারও নিকট এ পুস্তকের কোন মূল্য থাকুক বা না থাকুক, রবীন্দ্রের নিকট ইহার যথেষ্ট মূল্য ছিল। এমন কি অমূল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এরূপ অমূল্য গ্রন্থখানি রবীন্দ্র যে ষ্টেশনের একটা ঘরে ফেলিয়া গিয়াছে ইহা সে পূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই।

রবীন্দ্র যে ট্রেণে কলিকাতায় যাইতেছিল সেই ট্রেণেই স্বামীজি কেশবের বিপদের কথা শুনিয়া বরাকরে আসিতেছিলেন। তিনি বরাকর ষ্টেশনে পৌছিয়াই দেখিলেন যে, তখনও রাত্রি প্রভাত হইতে অনেক বিলম্ব আছে। এই অন্ধকার রাত্রে অজানা অচেনা দেশে কেশবের কাছারী খুঁজিয়া যাওয়া অপেক্ষা ষ্টেশনে এই কয় ঘণ্টা কাল কাটান যুক্তিযুক্ত ভাবিয়া স্বামীজি ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করাই স্থির করিলেন। ঘটনাচক্রে যে ঘরে রবীন্দ্রনাথ শুইয়াছিল সেই ঘরেই স্বামীজি স্থান লইলেন। বিশ্রাম গৃহে প্রবেশ করিয়াই স্বামীজি যাহা দেখিলেন তাহাতেই তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। তিনি দেখিলেন সোনার জলে সুন্দর অক্ষরে নাম লেখা মরোক্কোচামড়া মণ্ডিত একখানি album পুস্তক সম্মুখের টেবিলের নীম্নে ভূমিতলে পড়িয়া রহি-

য়াছে। অতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া উহা তুলিয়া লইলেন, ও তাহার মধ্যে কি লেখা আছে তাহা নিবিষ্ট চিত্তে দেখিতে লাগিলেন। ইহার অধিকারী যে কে তাহা জানিতে তাঁহার বেশী বিলম্ব হইল না। তিনি যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ কার্য্য সিদ্ধির একটা প্রধান সূচনা দেখিতে পাইয়া ভগবানকে মনে মনে সহস্র ধন্যবাদ দিলেন। তিনি কাহাকে কোন কথা না বলিয়া ঐ album পুস্তকখানি নিজের ট্রাঙ্কের মধ্যে যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিলেন। পরে ভোর হইলে পর একখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া কেশবের কাছারী অভিমুখে রওনা হইলেন।

রবীন্দ্রনাথ হাবড়া পৌছিয়াই তাঁহার মাল পত্র মিল করিতে গিয়া দেখে যে তাহার অমূল্য album পুস্তকখানি পাওয়া যাইতেছে না। অনেক অনুসন্ধান করিল কিন্তু কিছুতেই তাহার কোন সন্ধান পাইল না। তাহার পর সে ষ্টেশনের কর্ম্মচারিগণকে সংবাদ দিল। বরাকরের ষ্টেশন মাষ্টারকেও এ বিষয় জ্ঞাপন করিল কিন্তু কিছুতেই কোন কায হইল না। ইঁহারা সকলে যথারীতি দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক যথাসময়ে জানাইলেন যে ঐ পুস্তকের কোন খোঁজ খবর পাওয়া যাইতেছে না। তৎপরে উপায়ান্তর নাই দেখিয়া তিনি সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন এবং ঐ পুস্তকখানি পুনঃ প্রাপ্ত হইলে সন্ধানকারীকে একশত মুদ্রা পুরস্কার দিবেন এবং তাহাদের নিকট চিরজীবন কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবেন এইরূপ ঘোষণা করিলেন। তবুও কোন উত্তর মিলিল না তবে দিনকতক পরে একখানি নাম ধাম শূন্য উড়ো চিঠি তিনি

পাইলেন। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল যে তাঁহার চিত্র পুস্তকখানি খোওয়া যায় নাই—উহা তাঁহারই কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর তত্ত্বাবধানে অতি যত্নের সহিত রক্ষিত আছে। অতএব রবীন্দ্রের চিন্তার কোন কারণ নাই। উপযুক্ত সময়ে এই সংবাদ-দাতা মালিককে উহা ফেরৎ দিয়া বিজ্ঞাপনের লিখিত পুরস্কার গ্রহণ করিবেন—কারণ, যে মুহূর্ত্তে ঐ পুস্তক তিনি ফেরৎ দিবেন সেই মুহূর্ত্তেই তিনি অর্থ চাহিবেন—এক পলও অপেক্ষা করিবেন না। পত্রের উপর কোন পোষ্ট অফিসের মোহর ছিল না। রেলওয়ে মেল সার্ভিসে সংবাদ দাতা পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, কাজেই পোষ্ট অফিসের কোনরূপ সন্ধান পাওয়া একেবারে অসম্ভব বলিয়া রবীন্দ্রনাথের বোধ হইল। সে ভাবিল কোন দুষ্ট লোক তাহাকে উপহাস করিবার জন্য এইরূপ পত্র দিয়াছে। উপায়ান্তর নাই দেখিয়া সে নীরব রহিল। আর কোন উচ্চবাচ্য করিল না।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রনাথ পুরুলীয়ায় বদলী হইয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর ডেপুটির পদ পাইয়া নবোৎসাহে ও নবোদ্যমে রাজকার্য্য করিতেছেন। এমন সময়ে একদিন কেশবের পত্র পাইল। তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে আগামী ১০ই অগ্রহায়ণ জ্যোতির্ম্ময়ীর বিবাহ। তাঁহারই বৈমাত্র ভ্রাতা ক্ষিতীশের সহিত বিবাহ হইতেছে। বর্দ্ধমানে সকলের আসিবার সুবিধা হইবে বলিয়া কেশবের বর্দ্ধমান মধ্যে রাণীগঞ্জের সুবৃহৎ ভবনে শুভ বিবাহ কার্য্য সমাধা হইবে এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন।" অতএব রবীন্দ্র যেন ১০ই তারিখে সন্ধ্যার পূর্ব্বে এই বিবাহে যোগদান করে। রবীন্দ্র যথাসময়ে পত্র পাইল এবং দুই দিনের অবকাশ লইয়া জ্যোতির শুভ বিবাহে যোগদান করিবার মানসে বর্দ্ধমান যাত্রা করিল।

স্বামীজি যে এ বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন একথা বলা বাহুল্য। কেশব অপেক্ষাকৃত সুস্থ আছেন। বরাকরের জল হাওয়ায় তাঁহার শরীর অনেকটা ভাল হইয়াছে।

স্বামীজি বিবাহের দিনে সন্ধ্যার সময় বর্দ্ধমানে কেশবের বাটিতে আসিয়া হাজির হইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথও ঠিক রাত্রি ৮টার সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লগ্ন রাত্র ১০ টায়। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ট্রেণে বরের আসিবার কথা।

এই কারণ কেশবের আত্মীয় স্বজন অনেকেই বরকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য বর্দ্ধমান ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। বিনোদ বরকে সঙ্গে আনিবার জন্য পূর্ব্বদিন হইতে খুলনায় গিয়া অবস্থিতি করিতেছিল। যথা সময়ে ৭ টায় ট্রেণ বর্দ্ধমান ষ্টেশনে পৌঁছিল কিন্তু বর বা বরপক্ষীয় কেহই আসিল না। ইহার কারণ কেহ বুঝিল না। পরে ৯।৷৹ টার সময় যে ট্রেণ বর্দ্ধমান পৌছায় তাহাতে সরকার বিনোদ আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বরাবর কেশবের নিকট আসিয়া সংবাদ দিল যে, বর কি একটী উইল লইয়া জুয়াচুরি করিয়াছে, এ জন্য বেনারস আদালতের আদেশ অনুসারে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এ কারণ যত বিভ্রাট ঘটিয়াছে। কেশব এই কথা শুনিয়াই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন—এ যে জাতি যাইবার উপক্রম হইয়াছে। ক'নের গাত্র হরিদ্রা হইয়া গিয়াছে—আজ রাত্রে তাহাকে পাত্রস্থ করিতে না পারিলে জাতি সম্ভ্রম সমস্তই যাইবে যে!

স্বামীজি মনে মনে হাসিতে ছিলেন। কেশব স্বামীজিকে নিভৃতে ডাকিয়া যুক্তি ও পরামর্শ করিতে লাগিলেন। বলিলেন—

"স্বামীজি! এখন কি উপায়?"

"এর জন্য আর ভাবনা কি? রবিকে চেলি পরিয়ে পিঁড়িতে বসিয়ে দিন। শুভকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হ'য়ে যাক্।"

একথা শুনিয়া কেশব কতকটা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"সে কি? তাও কি কখন হয়?"

"কেন হয় না—কেশব বাবু ?"

"আপনি কি তবে রবির সম্পূর্ণ ইতিহাস জানেন না ?"

একটু হাসিয়া স্বামীজি বলিলেন—"আমি তার ইতিহাস জানি না তবে কে জানে ? সে ইতিহাসের আদি অন্ত সবই আমি জানি।"

"তবে ?"

"তবে কি ? ভাবনার কোন কারণ নাই।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার ট্রাঙ্ক খুলিয়া দু'চার খানি কাগজ বাহির করিয়া পড়িলেন। কাগজ গুলি পাঠে বুঝা গেল যে, স্বামীজি বেনারস আদালত হইতে রসময়ের দ্বিতীয় উইলের প্রবেট পাইয়াছেন। এবং তাহারই বলে আজ রবীন্দ্রনাথ তাহার পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী। প্রথম উইল রদ হইয়াছে। প্রকৃত ঘটনা গোপন করিয়া ক্ষিতীশ যাহা কিছু করিয়াছিল তাহা সমস্তই আদালতে প্রমাণিত হইয়াছে ও সমস্তই আদালত আদেশে বাতিল হইয়াছে। অধিকন্তু মিথ্যা এফিডেবিট করায় ক্ষিতীশকে ফৌজদারী আইনের দণ্ডবিধির আমলে আনিবার জন্য যে সমন হয় তাহাতে সে উপস্থিত না হওয়ায় ওয়ারেণ্ট বলে সে ধৃত হইয়াছে—ইহাও স্বামীজি জানাইলেন।

কেশববাবু বিস্মিত হইয়া উত্তর করিলেন, "তা এসব কথা ত আপনি কিছু জানান নাই।

"কার্য্য সিদ্ধি না করে একথাটি প্রচার যুক্তি সঙ্গত বলে মনে করি নাই।"

"বড় সুখী হলাম।" এই বলিয়া কেশব জ্যোতি ও সুহাসিনীকে ডাক দিলেন। উভয়েই আসিয়া উপস্থিত হইল।

স্বামীজি তখন একখানি ablum (ফটো ছবির বহি) খুলিয়া উহাদের সম্মুখে ধরিলেন। যে পত্রখানি খুলিলেন উহাতে কলিকাতার যোড়াবাগানের অগ্নিকাণ্ডের চিত্র অঙ্কিত ছিল। চতুর্দ্দিকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিরাশি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। আর রবীন্দ্র আসন্ন মৃত্যু মুখ হইতে বিপন্না জ্যোতির্ম্ময়ীকে নিজ পৃষ্ঠে বন্ধন করিয়া জানালার মধ্য দিয়া অবতরণ করিতেছে—ইহা সেই চিত্র। দেখিবামাত্র সকলে এতদিন পরে জ্যোতির উদ্ধারকারী সন্ন্যাসী যে কে তাহা চিনিতে পারিলেন। হর্ষে বিস্ময়ে ও সরমে জ্যোতির মুখ লাল হইয়া উঠিল। চিত্রের নিম্নে এই কয়টি কথা লেখা ছিল—"জ্যোতী! সম্পদে বিপদে আমি তোমারই—রবি।" তাহার পর সরকার বাহাদুর হইতে রবীন্দ্র সনৎপুর জমিদারী ও ডিক্রীর টাকা দান স্বরূপ যাহা পাইয়াছিল তাহার সনন্দ ও দলীলাদি সমস্তই ঐ পুস্তক মধ্যে ছিল—তাহাও সকলের সমক্ষে স্বামীজি পাঠ করিলেন। আর যে দলীলের দ্বারা রবীন্দ্র এই সম্পত্তি জ্যোতিকে দান করিয়াছেন তাহারও নকল এই কাগজ পত্র গুলির সহিত রহিয়াছে। এইখানি ও স্বামীজি পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইলেন। কেশব আনন্দে অভিভূত হইয়া গেলেন। তাঁহার মুখ দিয়া বাক্য স্ফুর্ত্তি হইল না। জ্যোতির চক্ষু দিয়া অবিরত অশ্রু ঝরিতে লাগিল। সে মনে মনে বলিল—নারায়ণ! কৃপাময়! এ যা দেখছি ও শুনছি এ সব কি সত্য। না স্বপ্ন?

"লগ্নের সময় উত্তীর্ণ হয়"—এই বলিয়া পুরোহিত ঠাকুর বাহির মহল ছাড়িয়া অন্দরে কেশবের নিকট আসিয়া এক হুঙ্কার ছাড়িলেন। কেশব তখন যে কি করিবেন তাহার মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ঘটনার পর ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে বৃদ্ধ কেশব একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্বামীজি তাহা বুঝিলেন। তিনি পুরোহিত ঠাকুরকে লগ্নের মধ্যে যাহাতে শুভ বিবাহ হয় তাহার আয়োজন করিতে বলিলেন এবং নিজে কুমারী জ্যোতির্ম্ময়ীর জন্য সুপাত্রের সন্ধানে বাহির মহলে আসিলেন।

বাহিরের জনতার মধ্যে প্রবেশ করে কাহার সাধ্য। অভ্যাগত অতিথি ও কুটুম্ব দাসদাসী প্রভৃতির ভিড় ঠেলিয়া স্বামীজি কোন রকমে রবীন্দ্রের নিকট আসিলেন। রবীন্দ্র তখন পাছে বিবাহ পণ্ড হয়—পাছে কেশবের ও জ্যোতির সম্মান ক্ষুণ্ণ হয় এই জন্য চিন্তিত ছিলেন ও কি উপায়ে সম্মান রক্ষা করিবে তাই ভাবিতে ছিল। হঠাৎ স্বামীজির ডাক শুনিয়া তাহার চটক ভাঙ্গিল।

স্বামীজি বলিলেন, "রবি! একবার ভিতরে চল, কেশব বাবু ডাকছেন।"

বিনা উত্তরে রবীন্দ্রনাথ অন্দর মহলে আসিল। যাইবামাত্র স্বামীজি কাহারও অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া বরের চেলীখানি লইয়া রবীন্দ্রকে উহা পরিধান করিবার জন্য আজ্ঞা করিলেন। তাহার পর কেশবকে বলিলেন—"এত তাড়াতাড়ি এর চেয়ে

আর ভাল পাত্র পাওয়া গেল না।” পরে সুহাসিনীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—“কিগো! তোমাদের বর পছন্দ হবে ত?” কথা শুনিয়া জ্যোতি ঊর্দ্ধশ্বাসে সম্মুখের ঘরে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। রবীন্দ্র স্বামীজির আদেশ শুনিয়া অবাক। সে বিস্মিত ভাবে স্বামীজির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “সেকি? আমি কেন চেলী পরাবো? আমি ত নিমন্ত্রিত অতিথি!”

স্বা—“কে বলছে যে তুমি রেও-ভাট, বিবাহ বাসরে বরই ত প্রধান অতিথি।”

র—“তা হতে পারে। তা বলে আমি বর সাজবো কেন? আমার ব্রত কি তা ত আপনি জানেন।

স্বা—“আমি সব জানি। তোমার নাড়ী নক্ষত্র সব জানি। এমন লগ্ন উত্তীর্ণ হয়—শাঁ করে চেলীটা পরে ফেল।” এই বলিয়া স্বামীজি স্বহস্তে রবীন্দ্রের জামার বোতাম খুলিতে লাগিলেন। রবীন্দ্র স্বামীজির কার্য্যে বাধা দিতে পারিল না—মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্বামীজির হস্তে আত্মসমর্পণ করিল। সুধু একবার মৃদু স্বরে বলিল—“এখানে আজ বড় জুলুম দেখছি।”

সুহাসিনী পার্শ্ব হইতে আসিয়া বলিল—“হাঁ ভাই, ভারী জুলুম; কি অত্যাচার এদের—কোন মায়া দয়া নেই। তুমি এবার এজলাসে বসে একটা কড়া হুকুম চালিয়ে এ অত্যাচারের প্রতিবিধান কোরো। এখন লক্ষীটির মত চেলীখানী পরে পিঁড়িতে এসে বস দেখি।”

স্বামীজিকে উদ্দেশ করিয়া পুনরায় রবীন্দ্র বলিল—"আপনি ত জানেন আমার জীবনের ব্রত কি? আমাকে এ দাম্পত্য পূর্ণ বাঁধনে বাঁধবার সাধ করলেন কেন?"

"বুঝতে পারি নি ভাই। যাক, তর্ক বিতর্ক শেষে হবে। এখন যা আদেশ করি তাই পালন কর। দীক্ষা নেবার আগে আদেশ পালন ক'রে গুরুভক্তি দেখাও।"

চেলী পরাণ শেষ হইল। বর পিঁড়িতে উপবেশন করিলেন। ক'নে যথা স্থানে আসন গ্রহণ করিল। পুরোহিত বিবাহের মন্ত্র পড়াইতে লাগিলেন। সুহাসিনী জোরে শাঁকে ফুঁ লাগাইল—কুলনারীগণ মাঙ্গলিক হুলুধ্বনি দ্বারা দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। ক্ষিতীশের স্থলে রবীন্দ্রের সহিত জ্যোতির শুভপরিণয় সম্পন্ন হইয়া গেল। দান সামগ্রীর সহিত স্বামীজি রবীন্দ্রের হারানিধি চিত্রপুস্তক খানি রাখিয়া দিলেন। পরে বলিলেন—"রবি! প্রতিশ্রুত ১০০৲ টাকা চাই। তোমার পুস্তক খানি এই দানের সামগ্রীর সহিত তোমাকে ফিরিয়ে দেওয়া গেল। এখন টাকা বার কর। আর আজীবন ঋণী হয়ে থাকব বলে ছিলে না? তোমাকে ঋণী করে রাখব না। আমার এই ছোট "ভগ্নীটি"কে সুখী কোরো, তা হলেই তুমি ঋণমুক্ত হবে। রবীন্দ্রের চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। স্বামীজি পুনরায় বলিতে লাগিলেন "এ চিত্র পুস্তকখানি তোমারই বটে ত? দেখ, ভাল করে দেখে নাও।"

রবীন্দ্র সলজ্জ ভাবে দেখিল, সত্যই তাহার সেই হারান এলবাম।

মরম পীড়িত হইয়া সে চক্ষু ফিরাইয়া লইল। কোন কথা কহিতে পারিল না।

বাসরে বর ও ক'নে যথাসময়ে উপনীত হইল। তখন সুহাসিনী জ্যোতির কানে কানে জিজ্ঞাসা করিল—"কিলো! বর পছন্দ হয়েছে?"

জ্যো—"যা! তুই এখান থেকে বেরো।"

সু—"এখন ত তাড়িয়ে দিবি। এই না হলে কি কলির ধর্ম্ম! তবে আমি আর আজ বেরুচ্ছি না—ফুলশয্যের রাত্রে রবির কাছে রেখে তবে বেরিয়ে যাব। যাক্—চল গলায় দড়ি দিবি না—কেতকীর জলে ডুবে মরবি না?"

জ্যোতি নীরব।

সুহাসিনী ছাড়িবার পাত্রী নহে। তাই পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"ব'ল না? চুপ করে রইলি যে?

জ্যো—"শুধু শুধু ডুবে মরতে যাবো কেন?"

সু—"এখন ডুবে মরবি কেন? এখন রবিদার প্রেমে কেবল হাবুডুবু খাবি। দেখিস ভাই তলিয়ে যাস্‌নি?"

জ্যো—"মুখে আগুন তোমার।"

দ্বিতীয় উইলের বলে রবীন্দ্র নাথ পৈতৃক সম্পত্তির মালিক হইল। রবীন্দ্রের বিবাহের পরই সৌদামিনী দেবী মারা যান। ক্ষিতীশ আদালতের বিচারে ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। বিচারের দিন আদালতে চন্দ্রমল পাকুড়িয়া ও বিজলী সুন্দরী উপস্থিত ছিল। যখন ক্ষিতীশের প্রতি দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত

হইল তখন চন্দ্রমল মাত্র এই কথা জানাইল যে ক্ষিতীশচন্দ্র অত্যন্ত আইন ভক্ত প্রজা। আইনের অমর্য্যাদা সে কখন দেখিতে পারে না। অতএব আদালতের সুবিচারে তাহার প্রতি যে দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইল তাহা অম্লাবদনে ভোগ করিতে সে যেন কোনরূপ দুঃখ প্রকাশ বা দ্বিধাবোধ না করেন। আর বিজলী একটা অট্টহাসি হাঁসিয়া বলিয়াছিল—"কেমন? পিপীলিকারও দংশন শক্তি আছে কি না এখন পরিচয় পেলে ত? যাও এখন সুখে এক বৎসর শ্রীঘর বেড়াইয়া এস। আজ আমার মনের কালী ঘুচে গেল।"

স্বামীজি উইলের সর্ত্তানুসারে ২৫০০০৲ টাকা লইয়া মঠের কার্য্যে ব্যয় করিলেন। বিজলী সুন্দরীকে সেই মঠের সমস্ত ভার সমর্পণ করিলেন। প্রত্যহ যাহাতে কতকগুলি দীন দরিদ্র ও আতুরের উপযুক্ত সেবা হয় তাহার ব্যবস্থা করিলেন। স্বামীজির নিকট দিক্ষীত হইয়া এইরূপ সাধু সংকল্পে মন নিয়োজিত করিয়া এবং প্রত্যহ মনিকর্ণিকায় পূত সলিলে স্নাত হইয়া বিশ্বনাথ পূজা ও অতিথি সৎকারে বিজলী সুন্দরী অতি আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিল।

পাঠক বুঝিয়াছেন, এই স্বামীজি কে? স্বামীজি আর কেহই নন—পূর্ব্ব-কথিত রসময়ের পুরোহিত পুত্র দিগম্বর। সাধ্বী মেনকা দেবী তাহাকে যে অবস্থায় গভীর রজনীতে আশ্রয় দান করিয়া যে বিপদে পড়িয়াছিলেন এবং সে বিপদে তাঁহার যে ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটিয়া ছিল তাহার প্রতিকারের কোন উপায়

না পাইয়া তিনি অতিশয় অনুতপ্ত ও সংক্ষুব্ধ চিত্তে সংসার ত্যাগ করেন। ইহা পাঠকের মনে আছে। মেনকা দেবী ও তাঁহার পুত্র রবীন্দ্রের ভাগ্য ফিরাইয়া তাঁহার আত্মকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিবার সংকল্পে ব্রতী থাকিয়া যাহা করিয়াছেন তাহা পাঠক অবগত আছেন। এই বার তাঁহারা সংসার হইতে প্রকৃত বিদায় লইবার সময় উপস্থিত। তাই কেশব জ্যোতি ও রবীন্দ্রের সম্মুখে আত্মপরিচয় দিয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া গেলেন। শুধু যাইবার পূর্ব্বে রবিকে বলিলেন—

"রবি! তোমাকে সংসারী করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। এই অভাগার কৃতকর্ম্মের জন্য তুমি তোমার পৈতৃক বিষয় হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলে বলিয়া আমার আর অনুতাপের সীমা ছিল না। যাহা হউক ভগবৎ কৃপায় আজ সকল হাঙ্গামা সুশৃঙ্খলে মিটিয়া গেল। তবে বড়ই দুঃখ রহিল, মা মেনকা দেবী কিছু দেখিতে পাইলেন না। তিনি না দেখুন তাঁহার আত্মা যে তৃপ্ত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শেষ কথা ভাই! তুমি আমার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে বৈরাগ্য অবলম্বন করবে বলেছিলে। বৈরাগ্য তোমার বয়সে ও তোমার মত লোকের সাজে না। যে দেবীকে জীবনের পথে সঙ্গিনীরূপে পেয়েছ তাকে নিয়ে সংসার ধর্ম্ম পালন কর। সংসার ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; সন্ন্যাসী যাহা করে তাহা অধিকাংশ, নিজের জন্য সংসারী যাহা করে—তাহার অধিকাংশ পরের জন্যই করিয়া থাকে। সংসার ধর্ম্ম না থাকিলে

সন্ন্যাস ধর্ম্ম পর্যান্ত থাকিতে পারে না। তাহাদিগকে উদরান্নের জন্য সমস্ত জলাঞ্জলি দিতে হয়। তাই বলি সংসার ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সহধর্ম্মিনীকে সঙ্গে নিয়ে সেই ধর্ম্ম পালন করে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় কর। এই "মন্ত্রদীক্ষা" দিয়া আমি চলিলাম। আশীর্ব্বাদ করি তোমরা সুখে থেকো, আর বরং যতদূর সাধ্য দীন দরিদ্রের দুঃখ মোচন কর।"

স্বামীজি নিরুদ্দেশ হইয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। কেহ আর তাঁহার সন্ধান পাইল না।

সমাপ্ত

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক।

উদ্‌যাপন

(উপন্যাস)

প্রেম পাগলিনী রমণীর জীবনের উদ্‌যাপন। ইহার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে নিঃস্বার্থ প্রেমের জ্বলন্ত চিত্র দেখিতে পাইবেন। এরূপ সরস বই কমই বাহির হইয়াছে।

স্বর্ণাঙ্কিত বিলাতী বাঁধাই মূল্য—১॥০

পুণ্যপ্রতিমা

(উপন্যাস)

লেখকের অমর তুলিকায় পবিত্র চিত্র অতি সুন্দর ভাবে ফুটিয়াছে। মা ভগিনীদের হাতে দিবার মত বই। মূল্য—॥০

কর্ণাটকুমার

(নাটক)

নিছক ছন্দে ও সরস ভাষায় লিখিত। স্ত্রী চরিত্র কম বলিয়া০ অবৈতনিক নাট্যসমাজ কর্ত্তৃক বহুবার অভিনীত হইয়াছে। মূল্য—১৲

(সামাজিক উপন্যাস যন্ত্রস্থ)